গণআদালত থেকে গণজাগরণ মঞ্চ

শাহরিয়ার কবির

৪ জুলাই ২০১৩, লন্ডনে বাংলাদেশ বিষয়ক সম্মেলনে শাহরিয়ার কবিরের সঙ্গে এডভোকেট সুলতানা কামাল, ড. পিটার কাস্টার্স ও ডেভিড রাসেল

২০১৩ সালকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষ-বিপক্ষের শক্তিপ্রদর্শনের ঘটনাবহুল বছর হিসেবে। '৭১-এর গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গত ২২ বছর ধরে যে আন্দোলন চলছে, তার ধারাবাহিকতায় ২০১৩-এর জানুয়ারি থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে এক এক করে রায় দেয়া আরম্ভ হয়েছে।

১৯৯২ সালে শহীদজননী জাহানারা ইমামের ডাকে গণআদালতে শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার প্রত্যক্ষ করার জন্য যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়েছিল— ২০১৩-এর ফেব্রুয়ারিতে তরুণ অনলাইন এ্যাক্টিভিস্টদের ডাকে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার এই গণঅভ্যুত্থানে ভীত হয়ে জামায়াত শরণাপন্ন হয়েছে কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের সংগঠন 'হেফাজতে ইসলাম'-এর উপর।

২০১৩ সালে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত মহাসমাবেশ যেমন জাতি প্রত্যক্ষ করেছে— ৬ এপ্রিল ও ৫ মে শাপলা চত্বরে হেফাজত-জামায়াতের সংগঠিত মহাসমাবেশ এবং মহাতাণ্ডবও দেশবাসী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ করেছে।

শাহরিয়ার কবিরের বর্তমান গ্রন্থে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির এই দ্বৈরথ এবং নাগরিক সমাজের করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই লেখাগুলো ঢাকার 'জনকণ্ঠ' ও 'কালের কণ্ঠ' এবং কলকাতার 'দৈনিক স্টেটসম্যান' ও 'বর্তমান'-এ প্রকাশিত হয়েছে।

২০১৩ সালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল 'গণজাগরণ মঞ্চ' ও 'হেফাজতে ইসলাম' এর অভ্যুদয়। একটি আলোর পথের যাত্রী অপরটি অন্ধকারের প্রত্যাশী। 'গণআদালত থেকে গণজাগরণ মঞ্চ' পাঠকদের আলো আর অন্ধকারের পার্থক্য উপলব্ধি করতে এবং করণীয় নির্ধারণে সাহায্য করবে।

গণআদালত থেকে গণজাগরণ মঞ্চ ● শাহরিয়ার কবির

চারুলিপি

গণআদালত থেকে গণজাগরণ মঞ্চ

শাহরিয়ার কবির

চারুলিপি

স্বত্ব
অর্পণ শাহরিয়ার

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২০/ফেব্রুয়ারি ২০১৪

চারুলিপি প্রকাশন ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে হুমায়ুন কবীর কর্তৃক প্রকাশিত
এবং পাণিনি প্রিন্টার্স, ১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।
কম্পোজ : ডানা প্রিন্টার্স গ-১৬, মহাখালি, ঢাকা ১২১২।

প্রচ্ছদ
শেখ আলী শাহনেওয়াজ

দাম : ৩০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978 984 598 117 0

FROM PEOPLES COURT TO PLATFORM FOR PEOPLES UPRISING
[a collection of articles] by Shahriar Kabir.
Published by Humayun Kabir
Charulipi Prokashon 38/4, Banglabazar, Dhaka 1100
First Edition : February 2014 Price : 300.00 Only. $ 10.00
E-mail : charulipi_prokashon@yahoo.com
Phone : +88 02 9550707 Cell : 01715983899

U.K. Distributor : **Sangeeta Limited**, 22 Brick Lane, London
U.S.A Distributor : **Muktadhara, 37-69**, 2nd floor, 74 St. Jackson Heights N.Y. 11372
Canada Distributor : **ATN Mega Store**, 2970 Danforth Ave, Toronto
Anyamela, 300 Danforth Ave (1st floor, Suite 202), Toronto

অনলাইনে বই কিনতে : রকমারি.com ফোন : ০১৫১৯৫২১৯৭১ অথবা লগইন করুন www.rokomari.com
পড়ুয়া www.porua.com.bd

উৎসর্গ

ডাঃ নুজহাত চৌধুরী শম্পা ও
ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ সহ
একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির
তরুণ নেতা ও কর্মীদের

লেখকের অন্যান্য বই

পুবের সূর্য ❍ হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা ❍ নুলিয়াছড়ির সোনার পাহাড় ❍ একাত্তরের যীশু
আবুদের এ্যাডভেঞ্চার ❍ কমরেড মাও সেতুঙ ❍ জনৈক প্রতারকের কাহিনী
কিশোর গল্পসমগ্র ❍ ওদের জানিয়ে দাও ❍ সীমান্তে সংঘাত ❍ নিশির ডাক
আনোয়ার হোজার স্মৃতি ঃ রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে ❍ হানাবাড়ির রহস্য ❍ মওলানা ভাসানী
মিছিলের একজন ❍ নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা ❍ পাথারিয়ার খনি রহস্য ❍ মহা বিপদসংকেত
বার্চবনে ঝড় ❍ ক্রান্তিকালের মানুষ ❍ বিরুদ্ধ স্রোতের যাত্রী ❍ রাজপ্রাসাদে ষড়যন্ত্র
কয়েকটি রাজনৈতিক প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার ❍ কার্পেথিয়ানের কালো গোলাপ
বহুরূপী ❍ অন্যরকম আটদিন ❍ চীনা ভূতের গল্প ❍ অন্তরঙ্গ হুমায়ূন আহমেদ
অনীকের জন্য ভালবাসা ❍ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার চালচিত্র ❍ গণআদালতের পটভূমি
একাত্তরের পথের ধারে ❍ লুসাই পাহাড়ের শয়তান ❍ বাভারিয়ার রহস্যময় দুর্গ
সাধু গ্রেগরির দিনগুলি ❍ আলোর পাখিরা ❍ বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়
হাত বাড়ালেই বন্ধু ❍ জাহানারা ইমামের শেষ দিনগুলি ❍ ঘাতকের সন্ধানে ❍ মরু শয়তান
রত্নেশ্বরীর কালো ছায়া ❍ ভয়ঙ্করের মুখোমুখি ❍ শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
শান্তির পথে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ❍ বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা
মুক্তিযুদ্ধের বৃত্তবন্দী ইতিহাস ❍ রবিনের বিজয় ❍ কাশ্মীরের আকাশে মৌলবাদের কালো মেঘ
কিশোরসমগ্র ১ স অপহরণ ❍ একাত্তরের গণহত্যা নির্যাতন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার
কিশোরসমগ্র ২ ❍ দক্ষিণ এশিয়ায় মৌলবাদ ঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ ❍ নির্বাচিত রচনাবলী ১
পাকিস্তান থেকে ফিরে ❍ বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন এবং আমার রাষ্ট্রদ্রোহিতা
কিশোরসমগ্র ৩ ❍ বাংলাদেশে মানবাধিকার ও সাম্প্রদায়িকতা ❍ কিশোরসমগ্র ৪
অবরুদ্ধ স্বদেশ থেকে প্যারোলে ইউরোপে ❍ মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা : বিপর্যস্ত বাংলাদেশ
কাজানের কড়চা ❍ বাংলাদেশে আমরা এবং ওরা ❍ বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদ
হরতনের রানীর দেশে ❍ জঙ্গী মৌলবাদ ও বিপন্ন মানবাধিকার
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জামায়াতের অপরাজনীতি ❍ মৌলবাদ ও যুদ্ধাপরাধ
দূরের মানুষ কাছের মানুষ ❍ সভ্যতার মানচিত্রে যুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধ প যুদ্ধাপরাধীদের বিচার
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঃ বিভ্রান্তি ও চক্রান্ত ❍ গণআদালত ও জাহানারা ইমাম
আর কতদিন ❍ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং নাগরিক সমাজের আন্দোলন
ভূতসমগ্র ❍ বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক ঃ বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা
যুদ্ধাপরাধের বিচার ঃ নুরেমবার্গ থেকে ঢাকা ❍ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ঃ বাইশ বছরের আন্দোলন

সূচিপত্র

লেখকের কথা

২০১৩ সাল ছিল মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘটনাবহুল ও সংঘাতপূর্ণ বছর। '৭১-এর গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গত ২২ বছর ধরে আমরা যে আন্দোলন করছি, সে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আরও আন্দোলন হয়েছে। এই আন্দোলন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে গণদাবিতে পরিণত করেছে। যার ফলে শেখ হাসিনার মহাজোট ২০০৮ সালের নির্বাচনে অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করে ক্ষমতায় এসেছে এবং ২০১০ সালে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল' গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আরম্ভ করেছে। ২০১৩-এর জানুয়ারি থেকে এই ট্রাইবুনালে এক এক করে রায় দেয়া আরম্ভ হয়েছে। এ বছর ট্রাইবুনালে দশ জনের বিচার সম্পন্ন হয়েছে, যাদের ভেতর সাত জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং তিনজনকে যাবজ্জীবন বা আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। শহীদজননী জাহানারা ইমামের আন্দোলন বিজয়ের প্রথম ধাপ অতিক্রম করেছে।

'৭১-এর গণহত্যাকারীদের ভেতর সবার আগে বিচার সম্পন্ন হয়েছে জামায়াতে ইসলামীর আবুল কালাম আজাদ ওরফে বাচ্চু রাজাকারের। গত ২১ জানুয়ারি (২০১৩) তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলেও ৫ ফেব্রুয়ারি জামায়াত নেতা কাদের মোল্লার রায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। একথা আমরা বহুবার বলেছি, গণহত্যাকারীদের সর্বনিম্ন শাস্তি হওয়া উচিত মৃত্যুদণ্ড, যার ব্যত্যয় ঘটেছিল কাদের মোল্লার ক্ষেত্রে। যৌক্তিক কারণেই মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তি, যারা শহীদজননী জাহানারা ইমামের আন্দোলনের পক্ষে, বিশেষভাবে তরুণ সমাজ এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছে। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে রাজধানী ঢাকার শাহবাগ চত্বরে ছাত্র-জনতার দীর্ঘতম মহাসমাবেশে।

বর্তমান বিশ্বে যে তরুণদের আমরা বলি ফেসবুক প্রজন্ম, যারা ২০১১ সালে আরব বসন্তের সূচনা করেছিল, বাংলাদেশের সেই অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টরা কাদের মোল্লার রায়ের প্রতিবাদে ৫ ফেব্রুয়ারি বিকেলেই রাস্তায় নেমেছিল। ওরা প্রথমে ছিল কয়েকজন, তারপর কয়েক শ, এরপর হাজারের কোঠা অতিক্রম করে লাখে পৌঁছেছিল। ৫ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একটানা সতের দিন সতের রাত সর্বস্তরের মানুষের এই মহাসমাবেশের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। এরপরও এক/দুই দিন বিরতি দিয়ে সমাবেশ হয়েছে। তরুণদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রবীণরাও শ্লোগান দিয়ে, গান গেয়ে, বক্তৃতা শুনে, বক্তৃতা দিয়ে যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের পাশাপাশি তাদের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন।

সূচনাপর্বে শাহবাগে ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত এই সমাবেশের প্রতি শেখ হাসিনার মহাজোট সরকারের সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। ছাত্রলীগ ও যুবলীগের বিপুল

অংশগ্রহণ ছিল এতে। বামপন্থী ছাত্র সংগঠনসমূহের কর্মী ও সমর্থকদের প্রবল উপস্থিতি প্রথম থেকেই দৃশ্যমান ছিল। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা এসে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন। জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাঁর মন পড়ে আছে শাহবাগে। শাহবাগে ইমরান সরকারদের মহাসমাবেশের অভিঘাত ছড়িয়ে পড়েছিল তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত সকল জনপদে এবং বহির্বিশ্বের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে।

১৯৯২ সালে শহীদজননী জাহানারা ইমামের ডাকে গণআদালতে শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযমের বিচার প্রত্যক্ষ করার জন্য যেমন লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়েছিল, ২০১৩-এর ফেব্রুয়ারিতে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের দাবিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার এই গণঅভ্যুত্থানে ভীত হয়ে জামায়াত শরণাপন্ন হয়েছিল কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের সংগঠন 'হেফাজতে ইসলাম'-এর উপর, যার প্রধান এক সময়ের জামায়াতবিরোধী আল্লামা আহমেদ শফী। জামায়াত জানে যারা আপাত জামায়াতবিরোধী, অথচ নীতিগতভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী তাদের কীভাবে পক্ষে আনতে হয়।

জামায়াতের কোনও সমালোচনা যদি কেউ করে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে 'ইসলামবিরোধী', 'নাস্তিক' ইত্যাদি বলা হয়। গণজাগরণ মঞ্চের সূচনাপর্বেই জামায়াত অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে নিজেরা না বলে হেফাজতকে দিয়ে শাহবাগের তরুণদের 'ইসলামবিরোধী' ফতোয়া দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। ব্লগার রাজিব হায়দারকে ওরা ফেব্রুয়ারিতেই হত্যা করেছিল। তারপর আরও চারজনকে হত্যা করেছে। প্রথমে জামায়াতিদের পত্রিকায় জাতির উদ্দেশে হেফাজতপ্রধান আহমদ শফীর একটি খোলা চিঠি ছাপা হয়, যেখানে শাহবাগের তরুণ নেতাদের পাশাপাশি বিচারপতি মোহম্মদ গোলাম রাব্বানী, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ও আমাকে গণজাগরণ মঞ্চের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য 'নাস্তিক', 'মুরতাদ', 'মুশরিক' ইত্যাদি বলা হয়েছে, যার সরল অর্থ হচ্ছে এরা ইসলামের শত্রু, অতএব এদের হত্যা করতে হবে। ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত জামায়াত যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এ ধরনের ফতোয়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল। '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদেরও জামায়াত 'দুষ্কৃতকারী', 'ইসলামের দুষমন', 'ভারতের এজেন্ট' ইত্যাদি বলেছিল।

গণজাগরণ মঞ্চের বিরুদ্ধে খোলা চিঠি লিখে রাজনীতির মঞ্চের পাদপ্রদীপের নিচে এসে দাঁড়িয়েছেন চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আহমদ শফী। নবতিপর এই বৃদ্ধকে সামনে রেখে হেফাজতের আফগানফেরত জেহাদীরা প্রথমে লংমার্চ এবং পরে ঢাকা অবরোধের নামে মহাসমাবেশ করে কী মহাতাণ্ডব করেছে, কীভাবে জামায়াত-বিএনপি-জাতীয় পার্টি হেফাজতকে মদদ দিয়েছে, কীভাবে মহাজোটের মন্ত্রী বার বার হাটহাজারী গিয়ে মৌলবাদী শফীকে হুজুর হুজুর করেছেন এগুলো সবই আমরা দেখেছি ঘটনাবহুল গত এক বছরে।

২০১৩ সালকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষ-বিপক্ষের শক্তিপ্রদর্শনের বছর হিসেবে। শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত মহাসমাবেশ যেমন দেখেছি— ৬ এপ্রিল ও ৫ মে শাপলা চত্বরে হেফাজত-জামায়াতের সংগঠিত মহাসমাবেশ এবং মহাতাণ্ডবও দেখেছি। আমরা দেখেছি মৌলবাদের হিংস্রতা, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ভয়াবহ বিস্তার এবং সরকারের দোদুল্যমানতা। ৫-৬ মে হেফাজতের মহাতাণ্ডবের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন জামায়াত হেফাজতকে আর ছাড় দেয়া যাবে না। অথচ এর এক মাস পর পাঁচটি মেয়র নির্বাচনে আমরা দেখলাম আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীরা বলছেন তাদের প্রতি হেফাজতের আশীর্বাদ রয়েছে। অপরদিকে হেফাজত সরাসরি জামায়াত-বিএনপি জোটের প্রার্থীদের সমর্থন দিয়েছে, যার অবধারিত পরিণতি ছিল পাঁচটি মেয়র নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রত্যাশিত শোচনীয় পরাজয়।

৫ ও ৬ মে রাজধানী ঢাকসহ সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে জামায়াত-হেফাজতের সন্ত্রাসীদের সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা ৫০-এর নিচে হলেও হেফাজত-জামায়াত-বিএনপি এবং তাদের তল্পিবাহকরা দেশে-বিদেশে প্রচার করেছে বাংলাদেশে 'নাস্তিকদের পৃষ্ঠপোষক সরকার' রাতের অন্ধকারে হাজার হাজার আলেমকে হত্যা করেছে। খবরের কাগজে বেরিয়েছে কীভাবে মাদ্রাসার গরিব নিরীহ ছাত্রদের ভয়-ভীতি-প্রলোভন দেখিয়ে জামায়াত-হেফাজতের নেতারা তাদের লংমার্চ এবং ঢাকা অবরোধ প্রভৃতি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেছে, যাদের কয়েকজন লাশ হয়ে কিংবা গুরুতর আহত হয়ে বাড়ি ফিরেছে। জামায়াত-হেফাজতের মহাতাণ্ডবে শত শত কোরাণ শরিফ পোড়ানো সহ যাবতীয় ধ্বংস ও লুণ্ঠনের বিবরণও খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে।

হেফাজতের ভয়বহ উত্থানকে জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি বিবেচনা করে আমরা সরকারকে বলেছিলাম এই সংগঠনটির কর্মকাণ্ডের উপর একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্য। সরকার না করলেও এ কাজটি করেছে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। ১ জুন (২০১৩) বিচারপতি সৈয়দ আমীরুল ইসলামের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে গণতদন্ত কমিশন, যার প্রতিবেদন (২ খন্ড, পৃঃ ১২৫০) প্রকাশিত হয়েছে গত ৮ নবেম্বর। কমিশনের তদন্তে বেরিয়ে এসেছে হেফাজতের নেতাদের মুক্তযুদ্ধকালীন বাংলাদেশবিরোধী কর্মকাণ্ড, পরবর্তীকালে আলকায়েদা ও আন্তর্জাতিক জঙ্গী কানেকশন, জামায়াত ও বিএনপি কানেকশন, বিভিন্ন মাদ্রাসায় তাদের বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতা ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ। জঙ্গী মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস প্রতিহত করার জন্য কমিশনের প্রতিবেদনে ১৯টি সুপারিশ করা হয়েছে। প্রথম দুটি সুপারিশে বলা হয়েছে—

১) জামায়াত-হেফাজতের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা এবং তাদের আন্তর্জাতিক মদদদাতা যেহেতু এক ও অভিন্ন সেহেতু হেফাজতকে যেমন জামায়াতের খপ্পর থেকে বের করে আনা যাবে না, একইভাবে বিএনপিও জামায়াতের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হতে পারবে না। ৫ মের মহাতাণ্ডবের পর প্রধানমন্ত্রী

বলেছিলেন, জামায়াত ও হেফাজতকে আর ছাড় দেয়া যাবে না। এর আগেও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জামায়াত কোনও রাজনৈতিক দল নয়, একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। হেফাজত ও জামায়াতের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী কার্যক্রম পর্যালোচনা করে গণকমিশন মনে করে হেফাজতে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি নিষিদ্ধ না করলে বাংলাদেশ থেকে (ক) জঙ্গী মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস কখনও নির্মূল করা সম্ভব হবে না। (খ) যুদ্ধাপরাধীদের চলমান বিচারও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করা যাবে না। (গ) সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর হামলা নির্যাতন, হত্যা, ধ্বংস ও লুণ্ঠন বন্ধ করা যাবে না। (ঘ) ধর্ম, জাতিসত্তা, লিঙ্গ, ভাষা ও বিত্ত নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করা যাবে না। (ঙ) বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতিসঙ্ঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় প্রদত্ত মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। (চ) আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখা যাবে না। (ছ) পুলিশ, বিজিবি ও সামরিক বাহিনীর উপর ধারাবাহিক হামলা, হত্যা ও নাশকতা রোধ করা যাবে না। এবং (জ) ইসলামকে শান্তি, সম্প্রীতি ও সাম্যের ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। হেফাজত-জামায়াতিদের এসব সন্ত্রাস, হত্যা ও ধ্বংসের কারণে শান্তির ধর্ম ইসলাম পরিচিত হচ্ছে সন্ত্রাসীদের ধর্মে।

২) উচ্চতর আদালতের রায়ে নির্বাচন কমিশনে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল হয়ে গেছে। যার ফলে দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন করতে পারবে না। এই রায়ের বিরুদ্ধে জামায়াত সুপ্রিম কোর্টে আপিল করলেও রায় অনুকূলে না গেলে জামায়াত আগামী নির্বাচনে দল হিসেবে নির্বাচন করতে পারবে না। এ কারণে ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে জামায়াতের কোনও আগ্রহ নেই, বরং নির্বাচন যাতে না হয় তার জন্য তারা সন্ত্রাস, হত্যা, ধ্বংস ও লুণ্ঠনসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এসব অপরাধ সংঘটনে হেফাজতে ইসলাম সহ সমমনা সকল মৌলবাদী জঙ্গী সংগঠন জামায়াতের পাশে অতীতে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। জামায়াতের সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী কার্যক্রম পর্যালোচনা করে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে জামায়াতকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে সরকার আমাদের সুপারিশ গ্রহণ করেনি। বরং হেফাজতের চাপের কারণে আওয়ামী লীগ গণজাগরণ মঞ্চকে পরিতাগ করেছে। আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকদের ভেতর অনেকে মনে করেন জামায়াতকে বিএনপির জোট থেকে বের করে আনা যাবে এবং হেফাজতকেও জামায়াতের খপ্পর থেকে বের করে আনা যাবে। হেফাজতের দাবির কারণে শিক্ষানীতি ও নারীউন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন স্থগিত রয়েছে, কওমি মাদ্রাসায় সরকারি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগও হিমঘরে ঠাঁই পেয়েছে।

অধ্যাপক আবুল বারকাতের গবেষণা থেকে আমরা জেনেছি বাংলাদেশে বর্তমানে চল্লিশ হাজারের বেশি কওমি মাদ্রাসা রয়েছে, যেখানে সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ বা

নজরদারি নেই। কওমি মাদ্রাসাগুলো যে জঙ্গী রিক্রুটের প্রধান ক্ষেত্র এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বিভিন্ন সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। নির্মূল কমিটির শ্বেতপত্রেও মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের জবানবন্দি ছাপা হয়েছে। বর্তমানে কওমি মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা অর্ধকোটিরও বেশি। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী যুগোপযোগী না হওয়ায় ছাত্ররা পাশ করে বেরিয়ে বাইরে কোথাও কাজ পায় না। একমাত্র কাজ মাদ্রাসায় পড়ানো বা মসজিদে ইমামতি করা, যা সবার ভাগ্যে জোটে না। ফলে জঙ্গীদের খাতায় নাম লেখানো ছাড়া তাদের কোনও গত্যন্তর থাকে না। এসব বিষয় নিয়ে গত বছরও বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছি।

বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত লেখায় বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির দ্বৈরথ এবং সরকার ও নাগরিক সমাজের করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই লেখাগুলো ঢাকার 'জনকণ্ঠ' ও 'কালের কণ্ঠ', এবং ' কলকাতার 'দৈনিক স্টেটসম্যান' ও 'বর্তমান'-এ প্রকাশিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের লেখাগুলোয় ঘুরে ফিরে গণজাগরণ মঞ্চের কথা এসেছে। যখন দেশের বাইরে গিয়েছি তখনও সবাই জানতে চেয়েছে— কীভাবে গণজাগরণ হল, কারা এর কাণ্ডারি, কোথায় যেতে চায় তারা। ২০১৩-এর জুনে আমি কায়রো গিয়েছি। জুলাইয়ে গিয়েছি ইস্তাম্বুল। কায়রোর তরুণরা ২০১১ সালের জানুয়ারিতে তাহরির স্কয়ারের অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল, যদিও অভ্যুত্থানের তিন দিন পর এটি হাইজ্যাক করেছিল মৌলবাদী 'মুসলিম ব্রাদারহুড'। ২০১৩-এর জুনে ইস্তাম্বুলের তরুণরা তাকসিম স্কয়ারে আরেক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে কায়রোর তাহরির ও ঢাকার শাহবাগের আদলে। তাকসিম ও তাহরিরের তরুণরা জানতে চেয়েছে শাহবাগ সম্পর্কে। তুরস্ক যাওয়ার আগে লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম। সেখানেও অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল গণজাগরণ মঞ্চ।

জঙ্গী মৌলবাদীদের স্বরূপ উন্মোচন এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক সমাজ নির্মাণের চেতনা সৃষ্টির জন্য লেখালেখির পাশাপাশি ২০১৩ সালে 'চূড়ান্ত জিহাদ' ও 'বাংলাদেশ কোন পথে' নামে দুটি প্রামাণ্যচিত্রও নির্মাণ করেছি। শেষোক্ত প্রামাণ্যচিত্রে 'সম্মিলিত ইসলামী জোট'-এর চেয়ারম্যান হাফেজ মওলানা জিয়াউল হাসান গণজাগরণ মঞ্চের প্রতি হেফাজত নেতাদের বিষোদগারের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশের সংবিধানে নাস্তিকতা নিষিদ্ধ নয়।... '৭১-এ ইসলামের নামে হেফাজত-জামায়াতের আস্তিকরা গণহত্যা ও নারীধর্ষণ সহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে। নাস্তিকরা গণহত্যা করেনি, নারীধর্ষণও করেনি। কে নাস্তিক কে আস্তিক তার বিচার করবেন আল্লাহ।

বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় মৌলবাদের সাম্প্রতিক উত্থানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ অবশ্যই আছে। সৌদি আরবের রাজতন্ত্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য ও আফগাননীতি সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী মৌলবাদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী এবং জঙ্গী মৌলবাদীরা প্রধানতঃ সৌদি আরব, মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তানের বিপুল আর্থিক সমর্থনে

পুষ্ট হয়েছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কখনও মৌলবাদী নয়। মৌলবাদী হওয়ার উপাদান তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে নেই। বিভিন্ন সময়ে বড় রাজনৈতিক দল, প্রশাসন এবং বাইরের সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে বাংলাদেশের মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি যে টিকে থাকতে পারবে না আমাদের হাজার বছরের সেক্যুলার মানবিকতার ইতিহাস তার প্রমাণ।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে অবলম্বন করে মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ যে আলোর পথে যাত্রা আরম্ভ করেছিল বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর যে পথ রুদ্ধ না হলেও দুর্গম হয়েছে, চলার পথে অনেক বাতি নিভে গেছে। এ বাতি নতুনভাবে জ্বালাবার দায়িত্ব নিতে হবে তরুণ প্রজন্মকে। মনে রাখতে হবে ধর্ম মানুষের কল্যাণের জন্য। অকল্যাণ, অসহিষ্ণুতা, হিংসা, হানাহানি, মদমত্ততা কখনও ধর্ম হতে পারে না।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নয় মাসের যুদ্ধের ফসল নয়, বাঙালির পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত। ইতিহাস বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত ঋদ্ধ দেশ ও জাতি গড়ে তোলা যাবে না। ইতিহাস সহ জ্ঞানের সমুদয় ভাণ্ডার ধর্মনিরপেক্ষ। যে ইসলামের নামে বিশ্বব্যাপী এত সন্ত্রাস, হানাহানি, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ সেই ধর্মের মূল দর্শন হচ্ছে শান্তি, সাম্য ও আত্মসমর্পণ। ইসলামের মহানবী যে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীন পর্যন্ত যেতে বলেছেন সে জ্ঞান মানুষের কল্যাণের জন্য, যে মানুষকে সুফীরা বলেছেন, 'আশরাফুল মাখলুকাত', স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব। বাংলার লালন যেমন বলেছেন, 'মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি/ মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপারে তুই সব হারাবি'। এসব বিষয় নিয়ে আগেও লিখেছি, তবে সবচেয়ে বেশি লিখতে হয়েছে গত বছর। কারণ দেশী ও বিদেশী গণমাধ্যমে গণজাগরণের তরুণদের উত্থান এবং এর বিপরীতে হেফাজতের অতিবৃদ্ধ শফীদের উত্থান সমানভাবে আগ্রহের বিষয় ছিল।

আশা করি 'গণআদালত থেকে গণজাগরণ মঞ্চ' তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার সংগ্রামে তাদের শক্তি জোগাবে। আমি বিশ্বাস করি, শহীদজননী জাহানারা ইমামের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় যারা বেড়ে উঠেছে সেই তরুণরাই তিরিশ লক্ষ শহীদের স্বপ্নপূরণের মহাযজ্ঞে পৌরহিত্য করবে।

শা. ক.
বইমেলা ২০১৪

শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে আমাদের স্বপ্নের সম্ভার

আমি ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন দেখিনি, ভাষা সৈনিকদের কাছে শুনেছি, ইতিহাস পড়ে জেনেছি। আমি '৬৯-এর ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান শুধু দেখিনি, পাকিস্তানের লৌহমানব ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সামরিক জান্তার কারফিউ ভেঙে মিছিলও করেছি। সেই মিছিলের শ্লোগান ছিল 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'তুমি কে আমি কে, বাঙ্গালি, বাঙ্গালি', 'পিণ্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা' আর 'জয় বাংলা'। এককেটি মিছিলে তরুণ ছাত্র আসাদ, কিশোর ছাত্র মতিউর গুলী খেয়ে লাস হয়ে যাচ্ছে। আসাদের রক্তমাখা শার্ট পতাকা বানিয়ে সহযোদ্ধা তরু দীপ্ত পায়ে মিছিলের সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই থেকে মিছিলে আছি, মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, দেশে ফিরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আবার মিছিল করেছি। স্বাধীন বাংলাদেশে রাজপথের প্রথম মিছিলটি সংগঠিত করেছিলাম আমরা— মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারের সদস্যরা। ১৯৭২-এর ১৭ মার্চ শহীদজননী জাহানারা ইমাম সহ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারের সদস্যরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হয়ে মিছিল করে বঙ্গভবনে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে স্মারকপত্র দিয়েছিলাম।

এরপর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে সূচিত হয়েছে এক অভূতপূর্ব নাগরিক আন্দোলন। ১৯৯২-এর ২৬ মার্চ গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার হয়। সেদিন ১৪৪ ধারা এবং রাস্তার সকল কাঁটাতারের বেরিকেড ভেঙে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ সমবেত হয়েছিল। গণআদালতের সেই জনসমুদ্রে শতকরা ৯০ ভাগ ছিল তরুণ।

'৫২-এর ভাষা আন্দোলনের ২১ বছর পর মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে ১৯৭১-এ। এই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ৯০ ভাগ ছিল তরুণ। মুক্তিযুদ্ধের ২১ বছর পর জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, তারও ৯০ ভাগ অংশগ্রহণকারী তরুণ। গণআদালতের ২১ বছর পর শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে যুদ্ধাপরাধীদের জন্য মৃত্যুদণ্ড এবং জামায়াত-শিবির চক্রের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে ছাত্র-জনতার চলমান মহাসমাবেশ মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তারও নায়ক তরুণরা।

৫ ফেব্রুয়ারি (২০১৩) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে গণহত্যাকারী জামায়াতনেতা কাদের মোল্লার বিচারের রায়ে প্রত্যাশিত মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘোষিত হয়, তখন মুক্তিযোদ্ধারা, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পরিবারের সদস্যরা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাঙালি অত্যন্ত হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সারা দেশের মানুষের এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে পরদিন শাহবাগ চত্বরে। প্রথমে

ছিল কয়েকশ তরুণ ব্লগারের মানববন্ধন। এই মানববন্ধন অচিরেই মানবসমুদ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। দলীয় পরিচয়হীন তরুণদের উদ্যোগে সংঘটিত স্বতঃস্ফূর্ত এই জনজোয়ারের উত্তাল তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে যেদিন কাদের মোল্লার মামলার রায় প্রদান করা হয় সেদিন আমি ভারতে। কলকাতা ও মুর্শিদাবাদে পূর্বনির্ধারিত দশটি অনুষ্ঠান ও আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমি ৩ ফেব্রুয়ারি দেশ ছেড়েছি। পশ্চিমবঙ্গে এখন বাংলাদেশের দুটি টিভি চ্যানেল দেখা যায়, ইন্টারনেটে সব কটি প্রধান দৈনিক পড়া যায়। রায় ঘোষণার এক ঘণ্টার ভেতরই একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুলের টেলিফোন পেলাম। ঢাকার নেতারা আমার মন্তব্য জানতে চাইছেন। ঢাকার সবাই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। আমিও আমার ক্ষোভ ব্যক্ত করেছি। বলেছি কেন্দ্রীয় কমিটির জরুরি বৈঠক ডাকতে। আমার অবর্তমানে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরদিন ডেইলি স্টারে দেখলাম মামুনের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া। একদিন পর মুনতাসীর মামুন ও শহীদজায়া শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী সহ নির্মূল কমিটির শীর্ষ নেতারা শাহবাগ গিয়ে তরুণদের মহাজাগরণের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপন করেছেন।

টেলিভিশনে শাহবাগের বিরামহীন জনস্রোত ও মহাসমাবেশ দেখে মনে পড়ছিল ২১ বছর আগে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের দৃশ্য। গণআদালতের মহাসমাবেশ স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। বিএনপি সরকারের যাবতীয় বাধা, হুমকি অগ্রাহ্য করে গণআদালত সফল করার জন্য সেদিন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী, ছাত্র-যুব-নারী মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন তাদের সাংগঠনিক শক্তি উজাড় করে দিয়েছিল। সেনাবাহিনী হেলিকপ্টারে আকাশ থেকে যে ছবি তুলেছিল সেখানে দেখা গেছে মৎসভবন থেকে আরম্ভ করে গোটা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, শাহবাগ থেকে আরম্ভ করে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত শুধু মানুষ আর মানুষ। তবে এই জনসমুদ্রের প্রস্তুতি দু মাসের হলেও মেয়াদকাল ছিল চার ঘণ্টারও কম।

৬ ফেব্রুয়ারি শাহবাগ চত্বরে যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে যে জনসমুদ্র তৈরি হয়েছে এটি কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের উদ্যোগে হয়নি। এর কোনও পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। যে তরুণ ব্লগাররা এর সূচনা করেছেন তারা জাতীয়ভাবে পরিচিত কোনও মুখ নয়। তারা বেড়ে উঠেছেন জাহানারা ইমামের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায়। তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়েছেন, '৭১-এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের কথা জেনেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত হয়েছেন এবং সময়ের ডাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাহসী সন্তানরা রাস্তায় এসে অবস্থান নিয়েছেন।

৬ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছয়দিনে কম করে হলেও ১০ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছে শাহবাগে। প্রতিদিন নতুনরা এসে পূর্বে অবস্থানকারীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছেন। জনসমুদ্রের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়েছে দেশের প্রধান প্রধান জনপদে এবং দেশের বাইরে বাঙালি অধ্যুষিত বিভিন্ন মহানগরে। লন্ডনে জামায়াতের গুণ্ডাদের হামলা

মোকাবেলা করে সমাবেশ হয়েছে, নিউইয়র্কে প্রবল তুষারপাত উপেক্ষা করে সমাবেশ হয়েছে। সারা বিশ্বের বাঙালিরা একাত্মতা ঘোষণা করেছেন শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরের তরুণদের মহাজাগরণের দাবির সঙ্গে। এই গণজাগরণের দ্বিতীয় কোনও নজির নেই। যে বাঙালি মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য রাজপথে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে পারে, যে বাঙালি স্বাধীনতার জন্য ৩০ লক্ষ জীবন বলী দিতে পারে, সে বাঙালিই পারে এ ধরনের শান্তিপূর্ণভাবে স্বতঃস্ফূর্ত জনসমুদ্র সৃষ্টি করতে এবং তা দিনের পর দিন অব্যাহত রাখতে।

১০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে দেশে ফিরে বিমানবন্দর থেকে সোজা শাহবাগ গিয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনাদীপ্ত তারুণ্যের এই অভূতপূর্ব মহাজাগরণ প্রত্যক্ষ করার জন্য। তখন বিকেল পাঁচটা। গাড়ি থামাতে হয়েছে রূপসী বাংলা হোটেলের সামনে। একা পায়ে হেঁটে বেস্টনির ভেতর ঢুকতেই দেখি সব বয়সী মানুষ রাস্তায় বসে আছে। কোথাও গান হচ্ছে মাইক ছাড়া, বুকে পিঠে পোস্টার ঝুলিয়ে শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীরা ঘুরছে। ফেরিওয়ালারাও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের শ্লোগানওয়ালা মাথায় বাঁধার ব্যান্ড বিক্রি হচ্ছে, কেউ তুলি দিয়ে গালে শ্লোগান লিখছে।

আমাকে দেখে ছাত্রদের একটি দল 'জয় বাংলা' বলে ঘিরে ধরল। কেউ আলিঙ্গন করছে, কেউ পায়ে হাত দিয়ে সালাম করছে— আমি অভিভূত। নির্মূল কমিটির বহু তরুণ কর্মীকে আমি চিনি না। জানি না ওরা নির্মূল কমিটির, নাকি কোনও ছাত্র সংগঠনের— আমাকে ধরে নিয়ে গেল মহাসমাবেশের প্রাণকেন্দ্রে। মাইকে তখন স্বাধীন বাংলা বেতারের বন্ধু রথীন্দ্রনাথ রায় গান গাইছেন 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে রক্তলাল রক্তলাল রক্তলাল, জোয়ার এসেছে মহাসমুদ্রে...'

রথীনকে ক্লান্ত মনে হল। অনেকক্ষণ গাইতে গাইতে গলা বসে গেছে, তাতে কোনও ক্ষতি নেই— হাজারও তরুণ কোরাসে গান ধরেছে, রথীনের গলা তরুণদের সম্মিলিত কণ্ঠে ডুবে গেছে। দূরে আমার কৈশোরকালের বন্ধু নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'আমি প্রথম দিন থেকে আছি। একটু আগে মামুন বলল, তুমি এসে গেছ।'

আমার চারপাশে যে তরুণরা ছিল, গত কদিন টেলিভিশনে ওদের দেখেছি। চেহারায় ক্লান্তি অথচ সূর্যের মতো উদ্দীপ্ত, ওরা জাহানারা ইমামের আন্দোলনের সন্তান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকবর্তিকা।

রথীনের গান শেষ হওয়ার পর কেউ মাইকে আমার নাম ঘোষণা করল অনেক বিশেষণ যুক্ত করে। চারপাশে শ্লোগানের পর শ্লোগান, যে শ্লোগান শুনেছি, '৬৯-এ, '৭১-এ, জাহানারা ইমামের মিছিলে, ২১ বছরের আন্দোলনে। আমি আমার অনির্বচনীয় অনুভূতির কথা বলছিলাম, বার বার শ্লোগানে আমার কণ্ঠ হারিয়ে যাচ্ছিল। চারপাশ থেকে সবাই হাত তুলে বিজয়চিহ্ন দেখাচ্ছিল।

একজন আমাকে ধরে একটা কাঠের বাক্সের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল। আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম। একজন পাশ থেকে বলল, আপনি রায় সম্পর্কে বলুন।

আমি বললাম, 'এ রায় আমরা মানি না।' জনসমুদ্র গর্জে উঠল— 'মানি না, মানি না', বলে।

আমি বললাম, যে বিশেষ আইনে একাত্তরের ঘাতকদের বিচার হচ্ছে কাদের মোল্লার মামলায় ট্রাইবুনাল তার মর্ম বুঝতে পারেননি। তারা খুনের বিচার করেছেন, গণহত্যার বিচার করেননি। তারা ফৌজদারি আইনের অভ্যাস অনুযায়ী সাক্ষী খুঁজেছেন। '৭১-এ কোন বিচ্ছিন্ন খুনের ঘটনা ঘটেনি। '৭১-এ বাংলাদেশে ঘটেছে স্মরণকালের ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের ঘটনা। '৭১-এর প্রতিটি হত্যা ৩০ লক্ষ মানুষের গণহত্যার অংশ, যার জন্য দায়ী জামায়াতের সকল নেতা, রাজাকার, আলবদর, আলশামসরা। জামায়াতনেতা কাদের মোল্লা '৭১-এ আলবদরের নেতা ছিলেন। ট্রাইবুনাল আলবদরের নেতার বিচার করেনি। আমরা আলবদরের নেতা হিসেবে গণহত্যার জন্য কাদের মোল্লার বিচার চাই। গণহত্যাকারীদের সর্বনিম্ন শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। গোলাম আযম থেকে আরম্ভ করে যে কোন গণহত্যাকারী মৃত্যুদণ্ডের কম শাস্তি পেতে পারে না। আমাকে বলতে হচ্ছিল থেমে থেমে। প্রতিটি বাক্য উচ্চারণের পর শ্লোগান ও হাততালি। আমি বললাম, একুশ বছর ধরে আমরা জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা বলছি। যে মন্ত্রীরা বলেন আমরা ব্যক্তির বিচার করছি, সংগঠনের বিচার করব না— তারা এসে দেখুন প্রজন্ম চত্বরের লাখো মানুষের দাবি— '৭১-এর গণহত্যার জন্য জামায়াতের বিচার করতে হবে। গণহত্যাকারীদের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। জামায়াতের সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সরকারের মালিকানায় নিতে হবে। '৭১-এর ঘাতক দালালদের রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। বাংলাদেশের মাটির থেকে ওদের চিরতরে নির্মূল করতে হবে।'

তরুণদের বললাম, তোমরা জাহানারা ইমামের সন্তান, তিরিশ লক্ষ শহীদের সন্তান, '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান। একুশ বছর আমরা তোমাদের অপেক্ষায় ছিলাম। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আন্দোলনে তোমরাই নেতৃত্ব দেবে।'

মৃত্যুর আগে জাহানারা ইমাম এই আন্দোলনের দায়িত্ব ভার কোনও ব্যক্তি বা সংগঠনের উপর নয়, জনগণের উপর অর্পণ করেছেন। তার অন্তিম উচ্চারণ ছিল—

> সহযোদ্ধা দেশবাসীগণ,
>
> আপনারা গত তিন বছর ধরে একাত্তরের ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমসহ স্বাধীনতাবিরোধী সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। এই লড়াইয়ে আপনারা দেশবাসী অভূতপূর্ব ঐক্যবদ্ধতা ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আন্দোলনের শুরুতে আমি আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের অঙ্গীকার ছিল লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ রাজপথ ছেড়ে যাবো না। মরণব্যাধি ক্যান্সার আমাকে শেষ মরণ কামড় দিয়েছে। আমি আমার অঙ্গীকার রেখেছি। রাজপথ ছেড়ে যাইনি। মৃত্যুর পথে বাধা দেবার ক্ষমতা কারো নেই। তাই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি এবং অঙ্গীকার

> পালনের কথা আরেকবার আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। আপনারা আপনাদের অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূরণ করবেন। আন্দোলনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ে থাকবেন। আমি না থাকলেও আপনারা আমার সন্তান-সন্ততিরা— আপনাদের উত্তরসূরিরা সোনার বাংলায় থাকবেন।
> এই আন্দোলনকে এখনো অনেক দুস্তর পথ পাড়ি দিতে হবে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্র ও যুব শক্তি, নারী সমাজসহ দেশের সর্বস্তরের মানুষ এই লড়াইয়ে আছে। তবু আমি জানি জনগণের মতো বিশ্বস্ত আর কেউ নয়। জনগণই সকল শক্তির উৎস। তাই একাত্তরের ঘাতক ও যুদ্ধাপরাধী বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল সমন্বয় আন্দোলনের দায়িত্বভার আমি আপনাদের বাংলাদেশের জনগণের হাতে অর্পণ করলাম। জয় আমাদের হবেই।

২০১৩ সালে যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় ঘোষণা আরম্ভ হয়েছে— রাজধানীর শাহবাগ থেকে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট সহ সারা দেশে ছাত্র-জনতার মহাজাগরণের ভেতর আমাদের স্বপ্নের মুকুল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সৌরভ ছড়াচ্ছে। জাহানারা ইমামের মতো আমিও বিশ্বাস করি আমাদের আরও অনেক দুস্তর পথ পাড়ি দিতে হবে। রবার্ট ফ্রস্টের সেই কালজয়ী কবিতার মতো— '... miles to go before I sleep/and miles to go before I sleep.'

২১ বছরে বহু বাধা, ষড়যন্ত্র, অন্তর্ঘাত, হামলা মোকাবেলা করতে হয়েছে। আমাদের সন্তানরা আমাদের চেয়ে সাহসী। পথ যত দুর্গম হোক, যত বাধা আসুক জাহানারা ইমামের সন্তানরা জয়ী হবে। আমরা জয়ী হব। ১৯৫২-এর ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ বছর পর পর বাংলাদেশের তরুণরা বাঙালির ইতিহাসের এক একটি সোনালি অধ্যায় রচনা করছে। সত্য ও ন্যায়ের পথে তারুণ্যের এই জয়যাত্রা কোনও অপশক্তি প্রতিহত করতে পারবে না।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের আন্দোলনের একুশ বছর

শাহবাগের মহাজাগরণ তেইশ দিন অতিক্রম করেছে। শুধু শাহবাগ নয়— চট্টগ্রাম থেকে দিনাজপুর, সিলেট থেকে খুলনা-যশোরের ছাত্র-জনতার জাগরণের মঞ্চ কোনও রাজনৈতিক দল বা প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সমাবেশ চলমান রেখেছে। জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশকে বিদেশী সাংবাদিকদের কেউ তুলনা করেছেন মিশরের তাহরির স্কয়ারের আন্দোলনের সঙ্গে, কেউ করেছেন দিল্লীর আন্না হাজারের উত্থানের সঙ্গে, কেউ করেছেন নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিট দখলের আন্দোলনের সঙ্গে।

গত দুই বছরে আমেরিকা, মিশর ও ভারতের এই তিনটি গণঅভ্যুত্থান নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী ঘটনা। ঢাকার শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরের মতো এসব মহাসমাবেশ চলমান ছিল বিরতিহীন। কিন্তু বাংলাদেশের শাহবাগ চত্বর কয়েকটি কারণে সাম্প্রতিক ইতিহাসের এসব অভ্যুত্থানের চেয়ে স্বতন্ত্র ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ তাহরির স্কয়ারের মতো শাহবাগের জাগরণ মঞ্চের নায়ক 'ফেসবুক প্রজন্ম' হলেও তাহরির স্কয়ারের নেপথ্যে ছিল মৌলবাদী 'মুসলিম ব্রাদারহুড' এবং সেনাবাহিনীর বড় অংশ, যারা প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পতন চেয়েছে। একই ভাবে ভারতের রাজধানীতে আন্না হাজারের গণজাগরণ মঞ্চের সূচনা নাগরিক আন্দোলনের নেতাদের উদ্যোগে হলেও এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল হিন্দু মৌলবাদীদের বিভিন্ন সংগঠন এবং এরও চরিত্র ছিল সরকারবিরোধী। নিউইয়র্কে ওয়াল স্ট্রিট দখলের গণজাগরণের নেপথ্যে কাজ করেছে বিভিন্ন এনজিও।

ঢাকার শাহবাগ চত্বরের আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে দলনিরপেক্ষ তরুণ ব্লগারদের দ্বারা, যারা নিজেদের দাবি করেছেন শহীদজননী জাহানারা ইমামের সন্তান এবং তাঁর আন্দোলনের উত্তর-প্রজন্ম। এই তরুণরা বছরের পর বছর '৭১-এর ঘাতক, যুদ্ধাপরাধী ও গণহত্যাকারী জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সহযোগী অপরাপর মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে 'সাইবার যুদ্ধে' নেতৃত্ব দিয়েছেন, দেশে ও বিদেশে বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছেন। তাদের যুদ্ধ '৭১-এর গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও চরম দণ্ড দ্রুত কার্যকর এবং জামায়াত শিবির চক্রের মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক-ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের জন্য। একুশ বছর আগে শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে সূচিত নাগরিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ এ দুটি দাবির ভিত্তিতে, যার প্রধান শক্তি ছিল মুক্তিযুদ্ধোত্তর তরুণ প্রজন্ম।

১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করে, শাস্তিপ্রাপ্তদের মুক্তিপ্রদান করে, নিষিদ্ধঘোষিত জামায়াতে ইসলামী এবং ধর্মব্যবসায়ীদের অপরাপর দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়ে, সংবিধান থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র মুছে ফেলে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধপূর্ব যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে

চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির 'পাকিস্তানিকরণ' এবং তথাকথিত 'ইসলামীকরণ' প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যে প্রজন্ম বেড়ে উঠেছিল তারা জানত না '৭১-এর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা, তারা জানত না কারা ছিল মুক্তিযুদ্ধের শত্রু-মিত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কী। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক দোসর জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দল ইসলাম ও পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার দোহাই দিয়ে বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের একুশ বছর পর শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে সূচিত '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজের এই পাকিস্তানিকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। আন্দোলনের ভেতর দিয়ে যে প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে তাদের দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবোধ শাহবাগ চত্বরের মহাজাগরণের মূল শক্তি।

শাহবাগ চত্বরের মহাজাগরণ তাহরির স্কয়ার বা আরব বসন্তের মতো সরকারপতনের আন্দোলন নয়। কায়রো ও দিল্লীর গণজাগরণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল মুসলিম ও হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন। শাহবাগের মহাজাগরণের প্রধান প্রতিপক্ষ হচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদ। যে কারণে অতীতের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পাকিস্তানি শাসক এবং তাদের এদেশীয় তল্পিবাহক মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক জামায়াতে ইসলামী গং যেভাবে 'পাকিস্তানবিরোধী' ও 'ইসলামবিরোধী', 'ভারতের চক্রান্ত' বলেছে, যেভাবে তারা '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী বাঙালিদের 'দুষ্কৃতকারী', 'ইসলামের দুষমন' ও 'ভারতের এজেন্ট' বলেছে একই ভাষায় তারা শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরের নায়কদের ইসলামবিরোধী 'নাস্তিক', 'মুরতাদ' বলে বিষোদগার করছে তাদের প্রচারমাধ্যমে। শাহবাগ গণজাগরণের অন্যতম নায়ক ব্লগার রাজিব হায়দারকে জামায়াতের ঘাতকরা নৃশংসভাবে হত্যা করেও রেহাই দেয়নি— চরিত্রহনন সহ তাকে 'মুরতাদ' আখ্যা দিয়ে তার সহযোগীদের হত্যার হুমকি দিচ্ছে।

জামায়াতের মুখপত্র 'সংগ্রাম' পত্রিকায় আধাপৃষ্ঠা জুড়ে হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল খোলা চিঠি লিখে শাহবাগ আন্দোলনের কয়েকজন তরুণ নেতাকে 'নাস্তিক', 'কাফের', 'মুরতাদ' ইত্যাদি বলে ফতোয়া দিয়েছেন। একুশ বছর আগে তারা শহীদজননী জাহানারা ইমাম, কবি সুফিয়া কামাল মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্ণেল (অবঃ) কাজী নূরউজ্জমান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কথাশিল্পী শওকত ওসমান, অধ্যাপক আহমদ শরীফ ও সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ সহ নির্মূল কমিটির শীর্ষ নেতাদের একই ভাষায় চরিত্রহনন করেছে এবং মুরতাদ ঘোষণা করে হত্যার জন্য দলের কর্মীদের প্ররোচিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বাংলাদেশের সংবিধানের বিরুদ্ধে জামায়াতের এই জেহাদে শামিল হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি থেকে আরম্ভ করে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা এবং ধর্মব্যবসায়ী ভণ্ডপীররা। উদ্দেশ্য একটাই— যে কোনও মূল্যে যুদ্ধাপরাধীদের চলমান বিচার প্রক্রিয়া প্রতিহত ও বানচাল করা।

শাহবাগ চত্বরে মহাজাগরণ থেকে ঘোষিত ছয় দফা সরকারপতনের কর্মসূচী না হলেও এটি সরকারের কিছু দায়িত্বহীনতা এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে

বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি ও চাপ। '৭১-এর গণহত্যার জন্য ব্যক্তির পাশাপাশি সংগঠনের বিচারের জন্য নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে যতবার দাবি জানানো হয়েছে ততবার আইনমন্ত্রী বলেছেন, তারা শুধু ব্যক্তির বিচার করবেন সংগঠনের বিচার করবেন না। ব্যক্তির পাশাপাশি সংগঠনের বিচার না করলে এ বিচার তিরিশ লক্ষ শহীদ পরিবারের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এ কথা বহুবার বলা সত্ত্বেও সরকারের নীতিনির্ধারকদের টনক নড়েনি। জাতীয় সংসদে যেদিন প্রধানমন্ত্রী আবেগপূর্ণ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শাহবাগের মহাজাগরণের সঙ্গে সংহতি জ্ঞাপন করলেন তারপরই আইনমন্ত্রী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে ব্যক্তির পাশাপাশি সংগঠনর বিচারের বিল সংসদে উত্থাপন করলেন। শাহবাগের মহাজাগরণ চলমানকালেই বিলটি সংসদে সর্বসম্মতভাবে পাশ হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরও হয়ে গেছে। তবে জামায়াতের রাজনীতি তথা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে সরকারের মন্ত্রীরা একেজন একেকরকম কথা বলছেন। সর্বশেষ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি (২০১৩) তথ্যমন্ত্রী বলেছেন ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

এর একদিন আগে ১৮ ফেব্রুয়ারি শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরে বক্তৃতার এক পর্যায়ে আমি বলেছিলাম, '৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন ছাড়া ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বা ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা যাবে না। সেদিন কয়েকজন তরুণ ব্লগার ক্ষোভের সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন শাহবাগ চত্বর থেকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার শ্লোগান বন্ধ হয়ে গেছে। আমি তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি, তোমাদের সব দাবি এক সমাবেশে সরকার মেনে নেবে এটা কেন ভাবছ? শাহবাগের মহাজাগরণ না হলে সরকার অপরাধী সংগঠন হিসেবে জামায়াতের বিচারেরও উদ্যোগ নিত না। তোমাদের আন্দোলনের চেতনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এটাও কম অর্জন নয়। ধর্মের নামে রাজনীতি বন্ধ করতে হলে বঙ্গবন্ধুর মতো বলিষ্ঠ, দূরদর্শী, প্রজ্ঞাবান নেতা দরকার। এ সরকার শুধু যদি জামায়াত নিষিদ্ধ করে সেটাও আমাদের আন্দোলনের একটা বড় বিজয় হবে।

বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের আন্দোলন শরু হয়েছে '৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে। এর একুশ বছর পর বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং শোষণমুক্ত মানবিক সমাজ গঠন। মুক্তিযুদ্ধের একুশ বছর পর জাহানারা ইমামের গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচার হয়েছে। গণআদালতের একুশ বছর পর শাহবাগ চত্বরে ইমরান, পিয়াল, বাঁধন, মারুফ, আসিফ, আরিফ, নিলয়, লাকি ও রাকিবদের মহাজাগরণ হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক সমাজ নির্মাণের আন্দোলন চলমান থাকবে।

শাহবাগ চত্বরের মহাজাগরণ আরম্ভের দু সপ্তাহ আগে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জনকণ্ঠে প্রকাশিত আমার এক নিবন্ধে লিখেছিলাম—' গত ৬ জানুয়ারি (২০১৩) মহাজোট সরকারের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'প্রথম আলো'য় বিভিন্ন বিষয়ে যে জনমত জরিপের ফল প্রকাশিত হয়েছে তার ভেতর দুটি হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে। 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বর্তমান সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারছে কি?' এ প্রশ্নের

জবাবে ২০০৯ সালে উত্তরদাতাদের ৮৬% 'হ্যাঁ' বলেছেন, ২০১২ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪%-এ। ট্রাইবুনালের লোকবল, রসদ ও নিরাপত্তার ঘাটতি যদি অব্যাহত থাকে, জামায়াতের বহুমাত্রিক চক্রান্ত সম্পর্কে সরকার যদি আগের আগের মতো উদাসীন থাকে— ২০১৩ সালের শেষে সরকারের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা এ ক্ষেত্রে কোথায় এসে দাঁড়াবে ভেবে শঙ্কাবোধ করছি।

'প্রথম আলো'র জরিপে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের পক্ষে ৫৮% উত্তরদাতা 'হ্যাঁ' বলেছেন, ৪১% বলেছেন 'না'। যদি নির্দিষ্টভাবে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের কথা বলা হত আমি মনে করি অন্ততপক্ষে ৮০% উত্তরদাতা 'হ্যাঁ' বলতেন। বাংলাদেশ সহ উপমহাদেশের বহু ধর্মীয় সংগঠন এবং আলেম-উলামারা মনে করেন জামায়াত রাজনীতির নামে ইসলাম ধর্মকে কলঙ্কিত করছে। জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার উপর যদি গণভোট হয় এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়— সিংহভাগ মত হবে নিষিদ্ধকরণের পক্ষে। তবে '৭১-এর গণহত্যার সঙ্গে সম্পৃক্ততার দায়ে জামায়াতের বিচারের জন্য গণভোটের প্রয়োজন নেই। নির্বাচকমন্ডলী ২০০৮-এর নির্বাচনেই এই ম্যান্ডেট মহাজোটকে দিয়েছে। আমজনতা যা চায় সরকারের বিজ্ঞ নীতি নির্ধারকরা যদি তা না বোঝেন তাহলে বুঝতে হবে— সর্বনাশের আর বাকি নেই।'

শাহবাগের মহাজাগরণ আমার প্রত্যাশা আরও সমৃদ্ধ করেছে। ট্রাইবুনালের আইন সংশোধনের পর এর প্রতি মানুষের আস্থা বেড়েছে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা নিয়ে বাংলাদেশে এখন যদি গণভোট হয় আমি মনে করি ৫৮% নয়, ৮০% মানুষ এর পক্ষে বলবে। এটাই জাহানারা ইমামের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের সন্তানদের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

খালেদা জিয়া বিএনপির কাঁধে ’৭১-এর ৩০ লক্ষ গণহত্যার দায় চাপিয়ে দিয়েছেন

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যার দায়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে দণ্ডিত দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ওরফে ‘দেইল্লা রাজাকার’-এর পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, সরকার নাকি ইসলামী চিন্তাবিদদের ধরে ধরে ফাঁসি দিচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করেন সাঈদী বা জামায়াতের কোনও নেতা ’৭১-এর গণহত্যার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন না। যে উচ্চতর আদালত সাঈদীকে গণহত্যাকারী বলেছেন, খালেদা জিয়া এই আদালতেরও সমালোচনা করেছেন। সাঈদীর মৃত্যুদণ্ডের অজুহাতে বিএনপির সহোদর ভ্রাতা (তারেক জিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী) জামায়াতে ইসলামীর সন্ত্রাসীরা পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী সারা দেশে পুলিশ ও বিজিবি সহ বিভিন্ন জনপদে এবং সংখ্যালঘু হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাসনালয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ঘরবাড়িতে নৃশংস হামলা চালিয়ে আবারও প্রমাণ করেছে তারা ’৭১-এর অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র সরে আসেনি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ এবং পাকিস্তানি প্রভুদের তুষ্ট করার জন্য জামায়াতের সকল সহিংসতা ও হত্যার দায় স্বেচ্ছায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন খালেদা জিয়া।

২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১, ২ মার্চ (২০১৩) জামায়াতের সহিংসতায় সারা দেশে ৫ জন পুলিশসহ অন্ততপক্ষে ৭০ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন কয়েক শ, যাদের অধিকাংশ জামায়াতের কর্মী হলেও নিহত ও আহতের তালিকায় আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থক এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সহ খেটে খাওয়া নিরীহ মানুষও কম নয়। পূর্বঘোষিত গৃহযুদ্ধের হুমকি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জামায়াত সরাসরি রাষ্ট্রের উপর সশস্ত্র আক্রমণ করেছে যা রাষ্ট্রদ্রোহতুল্য অপরাধ। জামায়াতের রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডের সমর্থনে খালেদা জিয়া ৫ মার্চ হরতাল আহ্বান করে প্রমাণ করেছেন প্রকৃত অর্থেই বিএনপি এখন জামায়াতের ‘বি টিম’-এ পরিণত হয়েছে এবং জামায়াতের আমীর ও ভারপ্রাপ্ত আমীরের অনুপস্থিতিতে তিনি যুদ্ধাপরাধী ও গণহত্যাকারীদের এই দলটির নতুন আমীর হয়েছেন।

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মামলার রায় ঘোষণার দুদিন আগে হঠাৎ সিঙ্গাপুর গিয়ে রায় ঘোষণার একদিন পর দেশে ফিরে এসে খালেদা জিয়া সংবাদ সম্মেলন করে দেশব্যাপী জামায়াতের তাণ্ডবের কারণে ৪৮ জন নিহতের ঘটনাকে ‘গণহত্যা’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এর আগের দিন জামায়াত-শিবিরের এই হত্যা ও ধ্বংসকাণ্ডকে বিএনপি বলেছে, ‘ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা’। (দৈনিক সংগ্রাম, ১ মার্চ ২০১৩)

’৭১-এর গণহত্যায় কত মানুষ নিহত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে খালেদা জিয়া তার তিরিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে একবারও একটি বাক্য উচ্চারণ করেননি। কারা এই গণহত্যা করেছে, গণহত্যাকারীদের বিচার হওয়া উচিৎ কি না এ বিষয়েও তিনি

কখনও টুঁ শব্দ করেননি। বরং শহীদজননী জাহানারা ইমাম যখন এই গণহত্যাকারীদের বিচার দাবি করেছিলেন তাঁকে খালেদা জিয়ার বাহিনী রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে অজ্ঞান করেই ক্ষান্ত হয়নি, বিচারপ্রার্থী শহীদজননীকে খালেদা জিয়া রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করেছিলেন। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ মাথায় নিয়েই জাহানারা ইমাম মৃত্যুবরণ করেছেন।

খালেদা জিয়ার স্বামী বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান একজন বীরউত্তম মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। বিএনপিতে বহু 'বীরউত্তম', 'বীরবিক্রম' ও 'বীরপ্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা আছেন। তৃণমূল পর্যায়ে বিএনপির বহু নেতাকর্মী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গণহত্যাকারী জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিচারের রায় এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়ার সমালোচনা করে, পাকিস্তানি কায়দায় '৭১-এর গণহত্যার ঘটনা অস্বীকার করে খালেদা জিয়া এই গণহত্যার দায় বিএনপির তাবৎ মুক্তিযোদ্ধাদের কাঁধে তুলে দিয়েছেন। অভিশপ্ত জামায়াতের মতো এখন থেকে বিএনপিকেও রোজ কেয়ামত পর্যন্ত '৭১-এর ৩০ লক্ষ গণহত্যার দায় বহন করতে হবে।

১৯৯৩ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবিরের এক নারকীয় হামলায় শতাধিক নিরীহ ছাত্র আহত এবং ছাত্রনেতা রীমু নিহত হয়েছিলেন। নিহত রীমু ওয়ার্কার্স পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্রমৈত্রীর নেতা হলেও তার মা হেলেনা চৌধুরী ছিলেন সাতক্ষীরা বিএনপির সভাপতি। তখন ক্ষমতায় ছিল বিএনপি। রীমু হত্যার প্রতিবাদে ২০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে এক উত্তপ্ত ও আবেগপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল। ক্ষমতাসীন বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ সহ সকল বিরোধী দলের সাংসদরা জামায়াত-শিবিরের এই নৃশংসতার তীব্র নিন্দা সহ জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের নেতারা জামায়াত সম্পর্কে এখন যা বলেন তখনও তাই বলেছিলেন। সেদিন জাতীয় সংসদে বিএনপির সদস্যরা দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতাতুল্য অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। বিএনপির বর্তমান আত্মবিস্মৃত মুক্তিযোদ্ধা নেতাদের জ্ঞাতার্থে তাদের সহযোদ্ধা কয়েকজন সাংসদের বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি—

'আজকে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা এটাই আমার কলংক। আজকে আমার সন্তানের সামনে মাথা নীচু করে আমাকে স্বীকার করতে হয়, ক্ষমতায় থাকার জন্য আজকে আমাকে স্বাধীনতাবিরোধীদের সাথে হাত মিলাতে হয়। এই ক্ষমতা দারুণ মোহ, দারুণ নেশা। এখানে বিবেক বলে কোন কিছু কাজ করে না।... আজকে আসুন শুধু সরকারীভাবে সরকার নয়, সবাই মিলে সামাজিকভাবে স্বাধীনতাবিরোধীদের বয়কট করি। আসুন, আজকে তাদের সঙ্গে আমরা এক কক্ষে বসব না সেই প্রতিজ্ঞা করি। আসুন, আমরা জাতীয় কোন ইস্যুতে তাদের সঙ্গে সমঝোতা করব না সেই সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু আমরা সেটা নিবনা। ক্ষমতায় ভাগাভাগি করার জন্য আমরা একজন আর একজনকে দোষারোপ করব এ হয় না।

'আজকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে জামায়াত শিবির ঔদ্ধত্য দেখানোর সুযোগ পাচ্ছে এটা আমাদের দুর্বলতার জন্য। শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়, আমাদের যারা বিরোধিতা করেছে, আমাদের অস্তিত্বের যারা বিরোধিতা করেছে, যারা আমার অস্তিত্ব স্বীকার করেনি তাদের সাথে আমাদের কোন সামাজিক বন্ধন হতে পারে না। যদি আমরা সকল ব্যাপারে তাদেরকে বয়কট করতে পারতাম তাহলে, আজকে আমাদের রগ কাটা যেত না। আজকে আমাদের ছাত্র ভাইদেরকে জীবন দিতে হতো না। জামায়াত শিবির শুধু রাজনৈতিকভাবে নয়— আজকে প্রশাসনের বিভিন্ন দিকে তাকিয়ে দেখুন, এদেশের অনেক জুনিয়র কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন যারা প্রকাশ্যেই জামায়াত করেন এবং জামায়াতের বই লিখেন। তারপরও তাদেরকে সরকারের বড় বড় আসনে চাকুরী দেয়া হয়, পদোন্নতি দেয়া হয়। আমরা তাদের কাছে সবাই ধর্ণা দেই।...

'আমি বিরোধী দলের বন্ধুদের বলব, স্বাধীনতাবিরোধী চক্র, মৌলবাদী চক্রকে এই দেশের রাজনীতিতে এবং সর্ব জায়গায় তাদেরকে নিষিদ্ধ করেন, তার প্রস্তাব আনেন। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি যদি আপনাদেরকে ভোট দিতে হয় দলের সিদ্ধান্তের বাইরে আমি এই ব্যাপারে দেব।' ১৯৯৩-এর ২০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের অধিবেশনে এসব কথা বলেছিলেন কিশোরগঞ্জ-২ আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপির সাংসদ মেজর আখতারুজ্জামান।

সেদিন পাবনা-৪ আসন থেকে নির্বাচিত বিএনপির সাংসদ সিরাজুল ইসলাম বলেছিলেন— 'আজ রিমুর পিতার অনুভূতি নেয়া হোক এবং সেই অনুভূতিকে সামনে রেখেই আমি ১৯৭১ সালে ফিরে যেতে চাই। আমার যে বোন, মা যেভাবে ধর্ষিত হয়েছিল, যাদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিল তারা আজ ২২ বছর বিভিন্নভাবে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধা শূন্যের সৃষ্টি করতে চায়। যেভাবে তারা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে চেয়েছিল— আজকে আমার ধর্ষিত বোনকে জবাব দিতে চাই। ২২ বছর পর জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ১২ কোটি মানুষের সংসদ আজকে কথা বলছে। কিছু কিছু সদস্য মনে করেন এবং তালি দিতে অসুবিধা বোধ করেন যে আবার Home Minister সাহেব অসন্তুষ্ট হন কিনা। পরিষ্কার কথা আমার— স্বাধীনতার সাথে আমি আপোষ করব না, আমার রক্তের সাথে আমি আপোষ করব না। যারা আমার মা বোনদের সতিত্ব নিয়েছে তাদের সাথে আমি আপোষ করব না। গোলাম আযমকে যখন তারা এই জামায়াতের আমীর করেছিল তখন তার নাগরিকত্ব ছিল না। আমার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তারা সেদিন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল, তাদের সাথে আমার কখনো আপোষ হতে পারে না। আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই— আমাদের ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরে যারা আছেন সবার জন্যে, আজকে তারা সমস্ত মসজিদগুলি কার্যালয়ে পরিণত করছে। আজকে ধর্মান্ধদের দৌরাত্ম্যে আমার বাবা চাচা ভাইয়েরা মসজিদে ইবাদত করতে পারে না। তাদের রাজনীতিতে নামতে বাধ্য করা হয়। এই হচ্ছে আজকে গ্রামগঞ্জের মসজিদগুলোর অবস্থা। তারা এখন মসজিদে অবস্থান নিয়েছে। এদেরকে বিতাড়িত করতে হবে। তারা আফগানিস্তান থেকে বিপ্লব আমদানী করতে চায়। তারা ইরান থেকে বিপ্লব আমদানী করতে চায়। আমি আজকে প্রস্তাব করতে

চাই— সামরিক বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ এন এস আই, ডিএফআই সকল বাহিনীতে নাগরিক সার্টিফিকেটের পাশাপাশি আর একটি সার্টিফিকেট যোগ করতে হবে। জামায়াত শিবির কোন সদস্য, এই বাহিনীতে যোগদান করতে পারবে না। তা না হলে ২০ বছর পর এই বাহিনী দখল করে তারা আবার এদেশের ক্ষমতা দখল করবে। আমি বলতে চাই, আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা নেতাশূন্য করতে চায়। এটাই মূল কথা। যেটা ওরা করতে চেয়েছিল বুদ্ধিজীবী হত্যার মধ্য দিয়ে। ওরা সেই একই পরিকল্পনায় সেদিন ২৫শে মার্চ আমাদের ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করেছিল। ওরা সেই একই কায়দায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘুমন্ত ছাত্রদের উপর আক্রমণ করেছে।'

লক্ষীপুর-৩ থেকে নির্বাচিত বিএনপির এমপি এডভোকেট খায়রুল এনাম বলেছিলেন— 'আজকে এই স্বাধীন দেশের পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে যে সমস্ত বক্তব্য রাখতে হচ্ছে এবং যে সংগঠন সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে হচ্ছে, তাদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানাবার ভাষা আমার নাই। এটা এমন একটি সংগঠন যার কলঙ্কের ইতিহাস ছাড়া আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না। ১৯৭১ সালের ঘটনা থেকে আরম্ভ করে আজকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা পর্যন্ত তারা যেসব নারকীয় ঘটনা এই বাংলাদেশে ঘটিয়েছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের এই স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর যে তাণ্ডবলীলা এ পর্যন্ত তারা ঘটিয়েছেন তার হিসাব করলে আমার মনে হয় তা মিলানো কষ্টকর হবে।

'আজকে আমাদেরকে জানতে হবে তাদের উদ্দেশ্যটা কি। কি কারণে তারা বাংলাদেশের এই নিরীহ সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে ছাত্র সমাজের উপর যে তাণ্ডবলীলা চালাচ্ছে তার উদ্দেশ্যটা কি। আজকে জানতে হবে তাদের এই অস্ত্রের উৎস কোথায়। কোথা থেকে তারা এসব অস্ত্র পাচ্ছে। আমাদের জানামতে পত্রপত্রিকায় যে সব খবর বের হয়েছে, তাদে ৩০৩ রাইফেল, এলএমজি, এসএমজি এবং ৩ ইঞ্চি মর্টার নাকি তাদের কাছে আছে। তারা এগুলি কোথায় রেখেছে, কোথা থেকে তারা এগুলি পেয়েছে তার উৎস খুঁজে বের করতে হবে।

'আজকে এখানে আমরা সকল মাননীয় সদস্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে এই জামায়াত শিবিরের তাণ্ডবলীলা নিয়ে বক্তব্য রাখছি। কিন্তু আজকে আমাদেরকে নজর দিতে হবে এই জামায়াত শিবির চক্র সারা বাংলাদেশে যে একের পর এক ছাত্রদের উপর মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১লা সেপ্টেম্বর যখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কাউন্সিল অধিবেশন হচ্ছিল যখন বিএনপির সকল নেতা এবং কর্মীরা এই ঢাকা শহরে উপস্থিত হয়েছিল। সে সময়ে এই জামায়াত শিবির চক্র অতর্কিতে আক্রমণ করে লক্ষীপুর সরকারী কলেজের ১৪/১৫ জন ছাত্রদল কর্মীকে আহত করেছে। আজকে সেই আহতদের মধ্যে জুয়েল নামের একজন ছাত্রদলকর্মী ঢাকার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ...

'একটা সরকার দেশে আসীন থাকা অবস্থায় একটা রাজনৈতিক সংগঠন কিভাবে সারা দেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যায়? আমার মনে হয় সরকার চেষ্টা করলে এই

সব সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করা একেবারেই সহজ। ... আজকে এই সংসদ থেকে, এই জাতির প্রতিনিধিত্বকারী মাননীয় সংসদ সদস্যদের মুখ থেকে, তাদের বক্তব্য থেকে আওয়াজ এসেছে যে জামায়াত শিবির চক্রের রাজনীতিও এই বাংলাদেশে নিষিদ্ধ করতে হবে। আমিও মাননীয় সকল সংসদ সদস্যদের সাথে একমত পোষণ করে বলতে চাই, পৃথিবীর সকল দেশে যখন এই মৌলবাদী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, তখন বাংলাদেশেও সেই মৌলবাদী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার আবেদন আমি এই সরকারের কাছে জানাচ্ছি।

'আমি পরিশেষে বলতে চাই, এইসব সন্ত্রাসী চক্রের নিজস্ব অস্ত্র কারখানা আছে। সরকারকে খুঁজে বের করতে হবে যে কোথায় তাদের সেই নিজস্ব অস্ত্র কারখানা। খুঁজে বের করে তাদের এই মৌলবাদী রাজনীতি, ধর্মের নামে রাজনীতি বন্ধ করে দিয়ে আজকে সাধারণ মানুষকে, বাংলাদেশের নিরীহ মানুষকে শান্তিতে থাকার সুযোগ করে দিতে হবে।'

২০ বছর আগে জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বিএনপির তিনজন সদস্যের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করেছি। সেদিন জাতীয় সংসদে বিএনপির ষোলজন, আওয়ামী লীগের এগার জন, জাতীয় পার্টির দুজন, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও ইসলামী ঐক্যজোটের একজন ও একজন স্বতন্ত্র সদস্য সহ তেত্রিশ জন সাংসদ প্রায় একই ভাষায় জামায়াত-শিবিরের নৃশংসতার বিবরণ দিয়ে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে এ দুটি সংগঠন নিষিদ্ধকরণের দাবি জানিয়েছিলেন। জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধকরণের ইস্যুতে একমত হয়ে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জাতীয় ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল সেদিন।

সেই সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জামায়াত-শিবিরের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে শহীদজননী জাহানারা ইমামের আন্দোলন ছিল তুঙ্গস্পর্শী। শহীদজননীর আহ্বানে সেদিন জাতি যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল ২০ বছর পর তাঁর আন্দোলনের তরুণ প্রজন্মের ডাকে সমগ্র জাতি আবার জেগে উঠেছে। পার্থক্য হচ্ছে সেদিন বিএনপির ভেতর যে দেশপ্রেম ছিল, স্বাধীনতার শত্রুদের প্রতি যে ঘৃণা ছিল, গত ২০ বছরে খালেদা জিয়ার হিমালয়প্রমাণ জামায়াত-প্রেমের নিচে তা চাপা পড়েছে। পাকিস্তানের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী বিএনপির মুক্তিযোদ্ধারা আজ সাফাই গাইছেন জামায়াত-শিবিরের সকল সন্ত্রাসের পক্ষে। বিএনপির মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ মেজর (অবঃ) আখতারুজ্জামানের ভাষায়— 'ক্ষমতার দারুণ মোহ, দারুণ নেশা। এখানে বিবেক বলে কোন কিছু কাজ করে না।'

বিএনপির তৃণমূল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশপ্রেমিক নেতাকর্মীদের এখনই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা আর কতকাল '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের যাবতীয় হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের দায় বয়ে বেড়াবেন।

৪ মার্চ ২০১৩

জামায়াতের ধারাবাহিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং স্বমূর্তিতে খালেদা জিয়া

১৯৭১ সালের গণহত্যা প্রথম পর্যায়ে ছিল নির্বিচার, কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায় ছিল নির্বাচিত। ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার অপারেশন সার্চলাইটের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সর্বাত্মক হত্যা, ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে স্বাধীনতাকামী বাঙালিকে আতঙ্কগ্রস্ত করা। ২৫ মার্চের রাতে তারা ধর্ম, বর্ণ, বিত্ত ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে গোটা জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এক রাতেই সারা দেশে তারা লক্ষাধিক নিরস্ত্র, নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বাঙালিদের একটি অংশ— যারা জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, পিডিপি প্রভৃতি মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক দল করত, তারা যখন জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার নৃশংস গণহত্যাকে আরও নৃশংস ও পরিকল্পিত রূপ প্রদানের উদ্দেশ্যে 'শান্তি কমিটি', 'রাজাকার', 'আলবদর', 'আলশামস' প্রভৃতি ঘাতক বাহিনী গঠন করে, তখন তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুক্তিযোদ্ধারা সহ আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মী-সমর্থকবৃন্দ এবং দলমত নির্বিশেষে হিন্দু সম্প্রদায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে পরাজয় নিশ্চিত জেনে তারা তালিকা তৈরি করে হত্যা করেছিল দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের, যাতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। '৭১-এর গণহত্যা সম্পর্কে বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানবজাতির ইতিহাসে এত অধিক সংখ্যক হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতনের নৃশংস ঘটনা কখনও কোথাও ঘটেনি। প্রধানতঃ পরিকল্পিত হিন্দুনিধনের জন্য গণহত্যা বিশেষজ্ঞরা একে 'জেনোসাইড' বলেন।

'৭১-এ পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এবং তাদের প্রধান দোসর জামায়াতে ইসলামী মুক্তিযোদ্ধাদের এবং মুক্তিকামী বাঙালিদের বলত 'দুষ্কৃতকারী', 'ইসলামের দুষমন' ও 'ভারতের চর'। শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে মহাজাগরণের তরুণ নায়কদের বিরুদ্ধে জামায়াত ও বিএনপি একই ভাষায় বিষোদগার করেছে। বিএনপির মুখপত্র 'আমার দেশ' বলছে এই মহাজাগরণ ঘটেছে ভারতের মদদে। বিএনপি ও জামায়াতের সকল গণমাধ্যমে মহাজাগরণের নায়কদের বলা হচ্ছে 'ইসলামের দুষমন', 'নাস্তিক', 'মুরতাদ', 'কাফের' ইত্যাদি।

শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের অন্যতম নায়ক ব্লগার রাজিব হায়দারকে হত্যা করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, তাকে নাস্তিক বানাবার জন্য তার ব্লগে আল্লাহ, রসুল ও ইসলামবিরোধী কিছু কদর্য কথা সেঁটে দিয়েছে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এটি জামায়াতের বহুল ব্যবহৃত একটি কদর্য সাম্প্রদায়িক হাতিয়ার। গত বছর পাকিস্তানে জামায়াতের এক লোক কোরাণ শরিফে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এর জন্য এক খৃষ্টান

বালিকার বিরুদ্ধে ব্লাশফেমির মামলা দায়ের করেছিল। মামলার তদন্তে বেরিয়ে এসেছে— কোরাণ শরিফ পোড়ানোর ঘটনার সঙ্গে কোনও খৃষ্টান নয়, জামায়াতের হুজুর জড়িত। একইভাবে রাজিবের ব্লগ তদন্ত করে পত্রিকায় বেরিয়েছে কীভাবে তার মৃত্যুর পর জামায়াতিরা এই দুষ্কর্ম করেছে। ঠিক যেভাবে গত বছর সেপ্টেম্বরে কক্সবাজারের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর নজিরবিহীন নৃশংস হামলা চালানোর আগে বৌদ্ধ যুবক উত্তম বড়ুয়ার ফেসবুকে তারা কোরাণ অবমাননার ছবি সেঁটে দিয়েছিল।

শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরের মহাজাগরণ ভারতের মদদে হয়েছে— এই কথা বলে তারা বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার ক্ষেত্র তৈরি করেছে এবং সাঈদীর মামলার রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি জেলায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে আরম্ভ করে গত এক সপ্তাহে জামায়াতের সন্ত্রাসীরা হিন্দুদের প্রায় দু'হাজার ঘরবাড়ি, মন্দির ও উপাসনাস্থল ধ্বংস করেছে, একজন পুরোহিত সহ সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ৫ জনকে হত্যা করেছে বলে জানিয়েছে 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ'।

সাঈদীর মামলার রায় বাতিলের দাবিতে জামায়াত ও বিএনপি ৩, ৪, ৫ মার্চ হরতাল ডেকেছে, যে সময় ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন। জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক পাকিস্তানপ্রেমের গাঁটছড়ায় বাঁধা। জামায়াত ও পাকিস্তানকে সন্তুষ্ট করার জন্য খালেদা জিয়া ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার নির্ধারিত বৈঠকও বাতিল করেছেন। তিনি জামায়াতের ডাকা হরতালের দিন ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকে গিয়ে হরতালের পবিত্রতা নষ্ট করতে চান নি।

ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বাংলাদেশ সফরের অন্যতম উপলক্ষ্য— মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা গ্রহণ। জামায়াত ও পাকিস্তানের জন্মশত্রু ভারত। এই শত্রুতার কারণেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১ থেকে এ পর্যন্ত জামায়াতের বিবেচনায় ভারতের চক্রান্ত। খালেদা জিয়া বাংলাদেশে দুবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ওয়েস্টমিনস্টার গণতন্ত্রে বিরোধী দলের নেতা ছায়া সরকারের প্রধানমন্ত্রী। বন্ধুপ্রতীম দেশের সফররত রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে বিরোধী দলের নেতা বা ছায়া সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার কূটনৈতিক শিষ্টচার ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অন্তর্গত।

জামায়াত ও পাকিস্তানকে তুষ্ট করতে গিয়ে খালেদা জিয়া আবারও প্রমাণ করেছেন তিনি বাংলাদেশের নয়, পাকিস্তানের একজন সুযোগ্য নেত্রী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌম মর্যাদার প্রতি তার কোন দায়বদ্ধতা নেই। অথচ এই খালেদা জিয়াই গত বছর ভারতে গিয়ে বলে এসেছিলেন তারা এখন থেকে ভারতের বিরুদ্ধে বৈরি কোনও আচরণ করবেন না, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে মদদ দেবেন না ইত্যাদি। অবশ্য খালেদা জিয়ার ভারত সফর এবং তার এসব কথার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করেছিল জামায়াত। জামায়াত ও পাকিস্তানের সঙ্গে খালেদা জিয়ার প্রগাঢ় প্রেম ইতিহাসের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক দলগুলো অযোধ্যার একটি মসজিদ ভেঙেছিল। সেই অজুহাতে জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সহযোগী মুসলিম

মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক দলগুলো বাংলাদেশে ৩৬০০ মন্দির ভেঙেছিল। জাতীয় সংসদের ধারাবিবরণীতে এ পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে। যারা এক দেশের মসজিদ ভাঙার জন্য আরেক দেশের মন্দির ভাঙে তারা কখনও প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না।

বাংলাদেশের হিন্দুরা যেমন বাবরি মসজিদ ভাঙেনি তেমনি গুজরাটের মুসলমানরাও বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে হিন্দুনির্যাতনের জন্য দায়ী হতে পারে না। ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য জুন পর্যন্ত গুজরাটে মুসলিম নিধনের আগে ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামায়াত ও বিএনপির জোট সাম্প্রদায়িক সহিংসতার যে হাজার হাজার ঘটনা সংঘটিত করেছিল মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তার দ্বিতীয় নজির নেই।

এই ঘটনার প্রতিবাদ করার জন্য জামায়াত-বিএনপির জোট সরকার আমাকে ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন সহ বহু সাংবাদিককে গ্রেফতার করে নির্যাতন করেছিল, কয়েক জনকে হত্যাও করেছিল। জামায়াত-বিএনপির জোটের জমানায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের পাশাপাশি মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী, আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়— কেউই তাদের হত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ এবং দেশান্তরিতকরণ থেকে রেহাই পায়নি। সেই সময় জামায়াত-বিএনপির জোটের সন্ত্রাসীরা যে সকল সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং জঙ্গী মৌলবাদী হামলা ঘটিয়েছিল জোটের নেতারা বলেছিলেন এসবের জন্য আওয়ামী লীগও ভারত দায়ী। এবারও সকল সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতনের জন্য খালেদা জিয়ার বিএনপি ও জামায়াত আওয়ামী লীগকে দায়ী করেছে।

এবারও জামায়াতের হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের অন্যতম শিকার হিন্দুরা। এর কারণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে বাচ্চু রাজাকার ও দেইল্লা রাজাকারের মামলায় কয়েজন হিন্দু সাক্ষ্য দিয়েছেন। ২ মার্চ (২০১৩) ডেইলি স্টার-এ বেরিয়েছে, নোয়াখালির বেগমগঞ্জে জামায়াত-শিবিরের ২৫০-৩০০ সন্ত্রাসী হিন্দুদের ঘরবাড়িতে হামলার সময় বলেছে— হিন্দুদের সাক্ষ্য দেয়ার কারণে নাকি সাঈদীর ফাঁসির আদেশ দিয়েছে আদালত। প্রকৃত তথ্য হচ্ছে সাঈদীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত ২০টি অভিযোগের ভেতর মাত্র দুটি অভিযোগে সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। এ দুটি অভিযোগে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কোনও হিন্দু ট্রাইবুনালে আসেনি।

জামায়াত বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করতে চায়, তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য। জামায়াত মনে করে আওয়ামীর একটি বড় ভোট ব্যাংক হচ্ছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়। সমস্যা হচ্ছে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় থাকে তখন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন তা তারা করে না। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সহযোগীরা ১৯৭২-এর সংবিধানে ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পাশাপাশি সংবিধানের মাথার উপর 'বিসমিল্লাহ...' লাগিয়ে 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ', ও 'সমাজতন্ত্র' বাতিল করে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির পাকিস্তানিকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছিলেন। ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদে তিন

চতুর্থাংশ আসনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সুপ্রিম কোর্টের রায় পাওয়া সত্ত্বেও '৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রবর্তন করেনি। বরং এ রায় উপেক্ষা করে সংবিধানে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম', ও 'বিসমিল্লাহ...' রেখে দিয়েছে যা, সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র পরিপন্থী এবং একই সঙ্গে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমান অধিকার, মর্যাদা ও ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী।

দৈনিক কলের কণ্ঠে খবর বেরিয়েছে জয়পুরহাটের একটি গ্রামে জামায়াতিরা আওয়ামী লীগের ১৩ জন কর্মীকে তওবা পড়িয়ে মুসলমান বানিয়েছে। এর আগে জামায়াতিরা ফতোয়া দিয়েছিল যারা আওয়ামী লীগ করে তারা মুসলমান নয়। জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মওদুদি বহু আগেই বলেছিলেন, জামায়াতের বিরোধিতা যারা করবে তারা সব কাফের।

শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরে প্রথম যে ছয় দফা ঘোষণা দেয়া হয়েছিল, যা স্পীকারের মাধ্যমে জাতীয় সংসদে প্রদান করা হয়েছে, সংসদ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী যা সমর্থন করেছেন সেখানে জামায়াতের পাশাপাশি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের কথা বলা হয়েছিল। পরে আওয়ামী লীগের চাপের কারণে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের কথা বাদ দিয়ে শুধু জামায়াত নিষিদ্ধ করার দাবির ভেতর আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে।

এতে মৌলবাদীরা আওয়ামী লীগের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছে এমন প্রমাণ এখনও দৃশ্যমান নয়। বরং গণজাগরণ মঞ্চের নায়কদের 'নাস্তিক', 'মুরতাদ', 'কাফের' আখ্যা দিয়ে তাদের চরিত্রহননের প্রক্রিয়ায় জামায়াত এবং তথাকথিত জামায়াতবিরোধী মৌলবাদীরা কোরাসে কণ্ঠ মেলাচ্ছেন। এর পাশাপাশি জামায়াতের ঘাতকরা মওদুদিবাদবিরোধী ওলামা মাশায়েখদেরও হত্যার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জামায়াত-শিবিরের খুনিদের হাতে নিহত ব্লগার রাজিবের পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, জামায়াতে ইসলামী কোনও রাজনৈতিক দল নয়, সন্ত্রাসী সংগঠন। মন্ত্রীরাও দাবি জানাচ্ছেন জামায়াত নিষিদ্ধ করতে হবে। নাকি তারা নিষিদ্ধকরণের আইন খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

আমরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি— জামায়াত নিষিদ্ধকরণের জন্য নতুন আইন প্রয়োজন হবে না। সরকার চাইলে সংবিধানের ৩৮ ধারা, কিংবা বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২০ অনুচ্ছেদ, কিংবা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ১৮ ধারা প্রয়োগ করে জামায়াত নিষিদ্ধ করতে পারে। এর জন্য কোনও আদালতে যেতে হবে না, প্রশাসনিক নির্দেশেই তা সম্ভব। গত ২ মার্চ জাতীয় সংসদে দফতরবিহীন মন্ত্রী এডভোকেট সুরঞ্জিত সেনগুপ্তও তাই বলেছেন।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুর জীবন ও জীবিকা নিরাপদ করতে হলে, শান্তির ধর্ম ইসলামের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে হলে, বাংলাদেশ থেকে জঙ্গীবাদী সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে এবং আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে এই মুহূর্তে জামায়াত নিষিদ্ধ করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ মহাজোট সরকারের সামনে খোলা নেই।

৮ মার্চ ২০১৩

মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলামের প্রধান প্রতিপক্ষ
জামায়াতে ইসলামী এবং জঙ্গী মৌলবাদীদের দুষ্কর্ম

১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় দখলদার পাকিস্তানি সামরিক জান্তা এবং তাদের এদেশীয় প্রধান সহযোগী জামায়াতে ইসলামী নজিরবিহীন গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধকে বৈধতা প্রদানের জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে ইসলাম ধর্মকে। ১৯৪৭ সালে সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে অবাঙালি শাসকরা সকল রাষ্ট্রীয় শোষণ, পীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্য জায়েজ করেছে ইসলামের দোহাই দিয়ে। ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালির সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের সংগ্রাম ছিল পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী এবং তাদের এদেশীয় তল্পিবাহকদের বিবেচনায় পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে হিন্দু ভারতের চক্রান্ত।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর যাবতীয় হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও বর্বরতা ছিল জামায়াতের বিবেচনায় ইসলামের সমার্থক। শান্তির ধর্ম ইসলাম জামায়াতের কাছে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল এবং রাষ্টক্ষমতা দখলের ঢাল ও তরবারি ছাড়া আর কিছু নয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতের প্রধান গোলাম আযম বলেছিলেন, পাকিস্তান নাকি আল্লাহর ঘর। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সবাইকে জেহাদ করতে হবে। '৭১-এ বাংলাদেশের প্রকৃত মুসলমানরা পাকিস্তানের মত অসভ্য বর্বর রাষ্ট্রকে কখনও আল্লাহর ঘর মনে করেননি। মারেফুল কোরাণে বলা হয়েছে আল্লাহর ঘর হচ্ছে কাবা শরিফ যার হেফাজত করেন স্বয়ং আল্লাহ। জামায়াতের গুরুভাই সৌদি ওহাবিরা শুধু কাবাঘর নয় প্রকৃত ইসলামকে কীভাবে বিকৃত করেছে, কীভাবে মহানবীর কুরায়েশ গোত্রকে লাঞ্ছিত করেছে ওহাবিবাদের ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ আছে। সৌদি ওহাবিবাদের দক্ষিণ এশীয় চাকর-নফরদের দল জামায়াতে ইসলামী প্রভুর সন্তুষ্টির জন্য, গুরু আবুল আলা মওদুদির সন্ত্রাসী দর্শন বাস্তবায়নের জন্য ইসলামকে মানবতার শত্রু এবং রক্তপিপাসু ড্রাকুলার ধর্মে রূপান্তরিত করেছে। সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের আরব শেখদের রাজনৈতিক ইসলামের ফেরিওয়ালা হচ্ছে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী। ভারতে সুবিধা করতে না পারলেও বিভিন্ন সময়ে সরকার, প্রশাসন, সামরিক বাহিনী এবং ক্ষমতালিপ্সু কিছু রাজনৈতিক দলের সহায়তায় পাকিস্তান ও বাংলাদেশে জামায়াত রাজনৈতিক দল হিসেবে ভাল মতো শেকড় গেঁড়েছে। বিশেষভাবে জঙ্গীপনা ও সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে জামায়াতের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দল পাল্লা দিতে পারবে না।

জামায়াতের নেতারা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ইসলামবিরোধী এবং হিন্দু ভারতের চক্রান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করে পাকিস্তান ও

ইসলাম রক্ষার জন্য জেহাদের ডাক দিলেও বাংলাদেশের মানুষ জামায়াতের মওদুদিবাদী ইসলাম ও তথাকথিত জেহাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। জামায়াত এবং তাদের পাকিস্তানি প্রভুদের বিশাল সেনাবাহিনী শোচনীয় পরাজয় মেনে নিয়ে বিজয়ী বাঙালির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। এই নিদারুণ পরাজয় জামায়াত এবং তাদের রাজনৈতিক ও আদর্শিক প্রভুরা কখনও মেনে নিতে পারেনি। বিজয়ী বাঙালির আত্মসন্তুষ্টি ও বিভক্তির সুযোগ নিয়ে যখনই পেরেছে তখনই তারা মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহের উপর ছোবল মেরেছে। ১৯৭৫-এ সপরিবারে স্বাধীন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড, কারাগারে বন্দি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদানকারী বঙ্গবন্ধুর প্রধান সহযোগীদের হত্যাকাণ্ড সহ শত সহস্র সামরিক ও অসামরিক মুক্তিযোদ্ধা হত্যা, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের অনুসারী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের হত্যা, সংখ্যালঘু নিধন, সংবিধান থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা মুছে ফেলে বাংলাদেশকে একটি মনোলিথিক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার উদ্যোগ— '৭১-এ পরাজিত মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির সেই প্রতিহিংসার অন্তর্গত।

৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত এবং সোয়া চার লক্ষ নারীর লাঞ্ছনার বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানি দর্শনকে সমাধিস্থ করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণ। ১৯৭২-এ গৃহীত বাংলাদেশের আদি সংবিধানে এই চেতনাই মূর্ত হয়েছিল সদ্যস্বাধীন প্রজাতন্ত্রের মূলনীতি হিসেবে। জামায়াত মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দাঁড় করিয়েছে ইসলামের শত্রু হিসেবে। '৭২-এর সংবিধানে ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল বা অন্য কোন সংগঠন প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ধর্মের নামে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন প্রভৃতি জঘন্য অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধের পাশাপাশি ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বঙ্গবন্ধু ধর্মহীনতা বোঝাননি, শুধু রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিযুক্ত করেছিলেন।

জামায়াতে ইসলামীর চেতনায় বিশ্বাসী পাকিস্তানপন্থী জেনারেল, কর্ণেল ও মেজররা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভাস্বর '৭২-এর সংবিধানের বলাৎকার করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের 'পাকিস্তানিকরণ' প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা শুধু সংবিধান থেকে নয়, পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচী থেকেও বাদ দেয়া হয়েছিল। '৭৫-এর পর একটি প্রজন্ম বেড়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনাহীন এক অন্ধকার সময়ের ভেতর। এই প্রজন্মকে জানতে দেয়া হয়নি মুক্তিযুদ্ধের শত্রুমিত্র কারা ছিল এবং কেন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল।

বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের 'পাকিস্তানিকরণ' তথা ওহাবি ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত ও কার্যকর প্রতিরোধ ছিল শহীদজননী জাহানারা ইমামের আন্দোলন। '৭১-এর গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জামায়াতে ইসলামীর মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে ১৯৯২-এর জানুয়ারিতে মুক্তিযুদ্ধে সন্তান ও স্বামীহারা লেখক ও সমাজকর্মী জাহানারা ইমাম গঠন

করেছিলেন 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। মুক্তিযুদ্ধের ২১ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অনুসারী বহুধাবিভক্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শক্তিকে প্রধানতঃ দুটি দাবির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা। জামায়াতে ইসলামী যথারীতি জাহানারা ইমাম এবং তাঁর আন্দোলনকে 'ইসলামবিরোধী', 'ভারতের চক্রান্ত' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে জনমত সংগঠিত করার জন্য জাহানারা ইমাম গণআদালতে জামায়াত নেতা যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের প্রতীকী বিচার করেছিলেন ১৯৯২-এর ২৬ মার্চ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ২১তম বার্ষিকীতে। তখন ক্ষমতায় ছিল জামায়াতের পরীক্ষিত মিত্র বিএনপি। জামায়াতকে তুষ্ট করার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গণআদালতের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করেছিলেন। নির্মূল কমিটির বহু নেতাকর্মীকে তখন কারানির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, অনেককে হত্যাও করা হয়েছে। তারপরও আন্দোলন অব্যাহত ছিল। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে এরপর আরও অনেক সংগঠন রাজপথে নেমেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কালক্রমে সর্বস্তরের মানুষের গণদাবিতে পরিণত হয়েছে।

১৯৭২-এ বঙ্গবন্ধুর সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আরম্ভ করেছিল। বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান এই বিচার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারাগারে আটক প্রায় ১১ হাজার অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত গণহত্যাকারীকে তিনি মুক্তি দিয়ে দল গঠনের সুযোগও করে দিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান একজন বীরউত্তম মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতাদের ভেতর বহু বীরউত্তম, বীরবিক্রম ও বীরপ্রতীক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। শুরুতে তারা বিএনপির নীতিনির্ধারকদের জামায়াত ও পাকিস্তানপ্রেম পছন্দ করেননি। খালেদা জিয়ার উগ্র পাকিস্তানপ্রেম ও জামায়াতপ্রেমের কারণে তাদের অনেকে এখন বিএনপির সঙ্গে নেই, যারা আছেন তারা বদলি খেলোয়াড় হিসেবে সাইডলাইনে বসে আছেন। বাকিরা নেত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করতে গিয়ে জামায়াতের কোলে উঠে বসেছেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাওয়ার জন্য শহীদজননী জাহানারা ইমাম সহ মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনের অধিনায়কদের, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতিদের যখন খালেদা জিয়া রাষ্ট্রদ্রোহী বানিয়েছিলেন, রাস্তায় ফেলে পিটিয়েছিলেন বিএনপির কেউ কেউ মৃদু প্রতিবাদ করলেও দলের জামায়াতিকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াননি। যার পরিণতি হচ্ছে হালের বেহাল বিএনপি— জামায়াতের মন জোগাতে গিয়ে খালেদা জিয়াকেও এখন সরাসরি ইসলামের নামে প্রতারণা ও ফতোয়ার আশ্রয় নিতে হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে জেহাদে নামতে হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই— জামায়াতের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ফাঁসি থেকে বাঁচাতে হবে, জামায়াতের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ক্ষমতায় যেতে হবে।

২০০৮-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রায় এক কোটি তরুণ ভোটার শেখ হাসিনার মহাজোটকে তিন চতুর্থাংশের বেশি আসনে জয়ী করেছিল প্রধানতঃ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য এবং জাতীয় সংসদে সর্বসম্মত প্রস্তাব

পাশের পর যখন মহাজোট সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তখন থেকে জামায়াত এই বিচার প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ ও বানচালের জন্য দেশে ও বিদেশে বহুমাত্রিক চক্রান্ত আরম্ভ করেছে। বিএনপি প্রথমে মৃদুস্বরে বলেছিল তারাও বিচারের বিরুদ্ধে নয়, 'তবে', 'কিন্তু'... ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের মামলায় জামায়াতের নায়েবে আমীর দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে যখন মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় তার বিরুদ্ধে জামায়াত ও বিএনপি একজোটে আওয়ামী লীগ বা সরকার নয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে। হরতাল ও বিক্ষোভ সমাবেশের নামে পুলিশদের পিটিয়ে হত্যা করা, '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কায়দায় শহীদ মিনার ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া, সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর নৃশংস হামলা, জাতীয় পতাকা পদদলিত করা, মন্দির ও প্যাগোডার পাশাপাশি মসজিদে আগুন দেয়া, রেললাইন উপড়ে ফেলে ট্রেনে আগুন দেয়া, সরকারি বেসরকারি যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস প্রভৃতি আমাদের তরুণ প্রজন্মকে বুঝিয়ে দিয়েছে— '৭১-এ জামায়াত কী করেছিল। '৭১-এ তারা সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিল ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তাকে, এবার তারা পেয়েছে পাকিপ্রেমী বিএনপিকে।

বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের 'পাকিস্তানিকরণ' তথা 'ইসলামীকরণ' প্রক্রিয়া এদেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষভাবে তরুণ প্রজন্ম কখনও মেনে নেয়নি— যার প্রমাণ হচ্ছে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের ২১ বছর পর জাহানারা ইমামের আন্দোলন এবং এর ২১ বছর পর শাহবাগ চত্বরে তরুণদের মহাজাগরণ।

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা আরব বসন্ত দেখেছি, মিশরের তাহরির স্কয়ারের গণজাগরণ দেখেছি, আমেরিকায় ওয়াল স্ট্রিট দখলের আন্দোলন দেখেছি, ভারতে আন্না হাজারের গণজাগরণও দেখেছি; কিন্তু বাংলাদেশে তরুণ ফেসবুক প্রজন্ম যে মহাজাগরণ ঘটিয়েছে, যা শাহবাগ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রত্যন্ত আঞ্চলে এবং বাঙালি অধ্যুষিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তা নিঃসন্দেহে অনন্য। '৭১-এর গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও চরম দণ্ডপ্রদান এবং জামায়াতে ইসলামীর ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে চলমান এই মহাজাগরণের তরুণ নায়করা শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন— তারা শহীদজননী জাহানারা ইমামের আন্দোলনের সন্তান, '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরপ্রজন্ম। তাদের লক্ষ সরকার পতন নয়— বাংলাদেশকে জঙ্গী মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং অপরাধ থেকে দায়মুক্তির অভিশাপ থেকে মুক্ত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণ। শাহবাগের নায়করা বলেছেন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের কেউ থাকবে না, সরকার ও বিরোধী দল সবাইকে শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার ও চেতনার প্রতি, যার জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছেন।

জামায়াত এবং তাদের সহযোগী সকল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি অতীতের মতো শাহবাগের মহাজাগরণের নায়কদেরও 'ইসলামের শত্রু' ও 'ভারতের এজেন্ট' হিসেবে আখ্যায়িত করে হত্যার জন্য ফতোয়া দিচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করার জন্য জামায়াত শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে ইউরোপ ও আমেরিকায় যেমন

লবিস্ট ভাড়া করেছে— বাংলাদেশেও তারা এমন সব মৌলবাদী সংগঠন ও ব্যক্তি ভাড়া করেছে এক সময় যারা জামায়াতবিরোধী হিসেবে পরিচিত ছিল। এর সর্বশেষ নমুনা হচ্ছে চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল, 'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ'-এর আমীর আল্লামা আহমদ শফীর খোলা চিঠি। সরকার ও দেশবাসীর প্রতি লেখা এই চিঠির শিরোনাম— 'ইসলাম বিদ্বেষের প্রতিবাদে গর্জে উঠুন।' এই চিঠি গত ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে জামায়াত ও বিএনপির দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় বিশাল আকারে ছাপা হয়েছে।

নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে হেফাজতে ইসলাম এই চিঠিতে লিখেছে— 'বাংলাদেশের প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম হাটহাজারী মাদরাসার পরিচালক, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড (বেফাকুল মাদারিস) এর চেয়ারম্যান, দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শীর্ষ আলিম পীরে কামেল শায়খুল ইসলাম আল্লামা আহমদ শফী হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের বর্তমান আমীর। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ পর্যন্ত হেফাজতে ইসলাম মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা ও তাহযীব-তামাদ্দুন সংরক্ষণে সর্বাত্মক ও নিরাপদ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সংগঠন কখনো কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি বা কারো সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধে জড়ায়নি; আগামীতে এর রাজনৈতিক কোনো এজেন্ডা নেই।

'শাহবাগ চত্বরে টানা বার দিন পর্যন্ত চলমান গণ-অবস্থান কর্মসূচীতে এবং সেখানকার জাগরণ মঞ্চের নানা রকম ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড গভীর পর্যবেক্ষণের পর হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে; সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে যে সম্পর্কে অবগত ও সচেতন করার লক্ষ্যে এই খোলা চিঠি।'

শাহবাগের ছাত্র-জনতার মহাজাগরণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তারা লিখেছে— '০১. অগ্নিপূজক ও পৌত্তলিকদের অনুকরণে মুসলমানদের সন্তান-সন্ততিদের দ্বারা মোমবাতি প্রজ্বলন, ০২. নামাজের সময়সহ দিন-রাত অনবরত মাইকে গান-বাজনা, ০৩. কথিত জাগরণ মঞ্চের মূল উদ্যোক্তা আসিফ মহিউদ্দীনসহ স্বঘোষিত নাস্তিকদের ব্লগে আল্লাহ ও রাসূল (সা.) তথা ইসলাম সম্পর্কে চরম অবমাননাকার ব্লগ লেখা ও জঘন্য মন্তব্য, ০৪. নারী-পুরুষের উদ্দাম, নৃত্য, অশ্লীলতা, মদ, গাঁজা সেবন ইত্যাদি অসামাজিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ড, ০৫. পবিত্র মক্কা-মদিনার ইমাম ও খতিবদের বিশেষ পোশাক কো'বা পরিয়ে ফাঁসির অভিনয়, ০৬. শাহবাগ চত্বরের মঞ্চ থেকে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ও দেশের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে হত্যার হুমকি ও অশালীন ভাষায় গালিগালাজ, ০৭. দাড়ি-টুপি পরিহিত ব্যক্তির গলায় রশি বেঁধে রাসূলের সুন্নাত ও ইসলামের প্রতীকসমূহের অবমাননা, ০৮. কোমলমতি, কচি-কাঁচা শিশুদের '... ধরে ধরে জবাই কর' ইত্যাদি অপরাধ প্রবণতামূলক স্লোগান শিক্ষা দেয়া, ০৯. বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের আবহমান ইসলামি সংস্কৃতির বিপরীতে ভারতীয় অপসংস্কৃতির নেতিবাচক প্রদর্শনী, ১০. সব ধরনের ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের উস্কানি দিয়ে দেশকে অনিবার্য সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়া, ১১. গভীর রাত পর্যন্ত শাহবাগে অবস্থানকারী তরুণ-তরুণীদের অবাধ মাখামাখি ও অসামাজিক

কর্মকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছে ফেইসবুক, ব্লগসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয়, ১২. সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হুমকি দেয়া সত্ত্বেও শাহবাগ চত্বর নিয়ে এক শ্রেণীর গণমাধ্যমে দৃষ্টিকটু ও সীমা ছাড়ানো মাতামাতি, ১৩. রাজধানীর বারডেম ও বঙ্গবন্ধু হাসপাতালের রোগীদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও রাস্তা বন্ধ করা অমানবিক পদক্ষেপ ও ১৪. স্বঘোষিত নাস্তিক ব্লগারদের ইসলাম অবমাননার প্রমাণ/প্রতিবেদন তুলে ধরে দেয়া পোস্ট/লেখা প্রকাশ করার কারণে সম্প্রতি নিরপেক্ষ অনেক ইসলামী ব্লগ সরকার কর্তৃক বন্ধ করে দেয়া' ইত্যাদি।

আমাকে এবং আমার বন্ধুদের নিয়ে এই খোলা চিঠিতে লেখা হয়েছে— 'যুদ্ধাপরাধের বিচার মূলত রাজনৈতিক ইস্যু হওয়ায় আমরা সে সম্পর্কে কোনো বক্তব্য বা বিবৃতি দিই নাই। কিন্তু অনুসন্ধানে আমরা যুদ্ধাপরাধের বিচারের নেপথ্যে কাদিয়ানিদের সম্পৃক্ততা খুঁজে পেয়েছি। একই মঞ্চে ঘাদনিক-নেতা, নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষী শাহরিয়ার কবির এবং আহমদিয়া মুসলিম জামায়াতের (কাদিয়ানি) নায়েবে আমীর আবদুল আওয়াল খান পাশাপাশি বসে অনুষ্ঠান করেছে। বর্তমান যুদ্ধাপরাধের বিচারের পেছনে কাদিয়ানিরাও পরোক্ষভাবে বামপন্থী ও সরকারি সমর্থনে সক্রিয় রয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, আন্দোলন চলাকালীন সময়ে শাহবাগ চত্বর থেকে ১১ জন কাদিয়ানি যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। বামপন্থী শাহরিয়ার কবিরের মতো মুশরিক ও মুরতাদরা একদিকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের অপচেষ্টা চালাচ্ছে, আর অন্যদিকে কাদিয়ানিদের মতো মুরতাদ সংগঠনকে সাথে নিয়ে ইসলাম বিরোধী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে।...

'শাহবাগের তথাকথিত জাগরণ মঞ্চে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন ইসলামী ও দেশবিরোধী অসংখ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা শাহরিয়ার কবির, বিশিষ্ট বাম বুদ্ধিজীবী মুনতাসীর মামুন, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে মূর্তি স্থাপনের নেপথ্য নায়ক জাফর ইকবাল, ফতোয়া নিষিদ্ধের রায় প্রদানকারী সাবেক বিচারপতি গোলাম রাব্বানী, হিন্দু নাস্তিক অজয় রায়, বাম ঘারানার চিহ্নিত কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ, ইসলামবিরোধী নারীনীতি প্রণয়ন ও সংবিধান থেকে 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' বাক্যটি বাদ দেয়ার নেপথ্যে সক্রিয় ব্যক্তিরাই শাহবাগ নাটকের পৃষ্ঠপোষক ও মূল কুশীলব।'

আল্লামা আহমদ শফী একসময় জামায়াতের বিরুদ্ধে বই লিখেছিলেন। ২০১০ সালে 'জিহাদের প্রতিকৃতি' প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের সময় আমি প্রথম জানতে পারি তার হাটহাজারী মাদ্রাসা কীভাবে হরকতুল জেহাদের জঙ্গী রিক্রুটের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। এ কথা আমাকে তথ্যপ্রমাণ সহ জানিয়েছেন মাদ্রাসার ছাত্ররা এবং তাদের অভিভাবকরা। আমরা এই ছবিতে প্রথাবিরোধী লেখক অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদকে নাস্তিক, মুরতাদ আখ্যা দিয়ে জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী কীভাবে তাকে হত্যার জন্য দলের জঙ্গীদের প্ররোচিত করেছিলেন তার বিবরণও রয়েছে।

'জিহাদের প্রতিকৃতি' নির্মাণের সময় চট্টগ্রামের হাটহাজারীর এক গ্রামে হরকতুল জিহাদের এক 'শহীদ' কর্মীর পিতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে গিয়ে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। থানা থেকে বেশ দূরে গ্রামটি অত্যন্ত দুর্গম এলাকায়।

আমরা ক্যামেরা ও ক্রু নিয়ে যখন পায়ে হেঁটে গ্রামে ঢুকেছি তখন দুজন বোরখা পরা মহিলা আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাদের দেখে একজন তার সঙ্গীকে বললেন, এরা আমাদের গ্রামে ক্যামেরা নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? এ গ্রামে তো সবাই ওহাবি! অপরজন জবাব দিলেন— বোধহয় আমাদের গ্রামে কেউ সুন্নী হয়ে গেছে। বাংলাদেশে ওহাবিবাদ যে এলাকাবিশেষে গ্রামে ঢুকে গেছে হাটহাজারী না গেলে আমার জানা হত না। ওহাবিদের কাছে সুন্নীরাও কাফের।

মৌলবাদবিরোধী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং বুদ্ধিজীবীদের নাস্তিক, মুরতাদ, বা কাদিয়ানি ফতোয়া দিয়ে হত্যা করা জামায়াতের পুরনো কৌশল। ১৯৫৩ সালে লাহোরে নিরীহ আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর নৃশংস হামলা পরিচালনা ও হত্যাকাণ্ডের জন্য জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর মওলানা আবুল আলা মওদুদিকে দায়ী করে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। পরে সৌদি বাদশাহর অনুরোধে তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল হলেও জামায়াত তাদের কৌশল পরিবর্তন করেনি। এর নৃশংসতম রূপ দেখেছি '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের 'ইসলামের শত্রু' এবং 'ভারতের চর' আখ্যা দিয়ে জামায়াতের ঘাতক বাহিনী আলবদরের খুনীরা যেভাবে হত্যা করেছিল তা হিটলারের নৃশংসতাকেও ম্লান করে দিয়েছিল। জামায়াত এবং তাদের সহযোগী জঙ্গীদের ফতোয়া থেকে আমি তো এক নগণ্য লেখক— কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক আহমদ শরীফ, কবি সুফিয়া কামাল, শহীদজননী জাহানারা ইমাম, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক কর্ণেল কাজী নূরউজ্জামান, মওলানা আবদুল আউয়াল ও সাংবাদিক ফয়েজ আহমদের মতো বরেণ্য ব্যক্তিরাও রেহাই পাননি।

এক সময় জামায়াতবিরোধী 'হেফাজতে ইসলাম' যখন জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মুক্তির জন্য মিছিল করে, জামায়াতের সঙ্গে কোরাসে যখন শাহবাগের মহাজাগরণের তরুণ নেতাদের প্রতি বিষোদগার করে তখন যে কারও বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় আল্লামা আহমদ শফীর বর্তমান অবস্থান কোথায়। তিনি যদি জামায়াতবিরোধী হন জামায়াতের মুখপত্র দৈনিক 'সংগ্রাম'-এ কেন তার চিঠি ছাপতে দেন? পত্রিকায় ছাপা হয়েছে হেফাজতে ইসলামীর নেতারা কীভাবে '৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগিতা করেছেন এবং কীভাবে এই সংগঠন এখন জামায়াতের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করছে। চট্টগ্রামে আলেমদের এক সমাবেশে এই সংগঠনকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'হেফাজতে জামায়াতে ইসলামী' নামে।

শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরের নেতারা বার বার বলেছেন তাদের আন্দোলন ইসলাম বা কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। এ কথা আমরাও বহুবার বলেছি— কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয় এটা নির্ধারণের দায়িত্ব কোরাণ কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রকে দেয়নি। প্রতিপক্ষকে 'মুরতাদ' আখ্যায়িত করে হত্যার বিধান প্রচলন করেছেন জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মওদুদি। এ বিষয়ে মওলানা আ. ত. ময়মনী লিখেছেন, 'জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদি সাহেব একটি বই লিখে গেছেন। বইটির নাম 'মুরতাদ কি সাজা' বা মুরতাদের শাস্তি। মওদুদি সাহেব এই বইতে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীর একমাত্র

শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড তা তিনি সাধ্যমতো প্রমাণ করর চেষ্টা করেছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এ ব্যাপারে পবিত্র কোরাণ কি বলে? উল্লেখ্য যে, কোরাণ শরীফে কোথাও ধর্মত্যাগীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এমন কথার উল্লেখ মাত্র নেই। বরং পবিত্র কোরাণ মানুষকে যে কোন ধর্ম গ্রহণ এবং বর্জন করার স্বাধীনতা প্রদান করেছে। যেমন 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো প্রকার জোর জবরদস্তি নাই'। (বাকারা)। 'যার ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করুক আর যার ইচ্ছা হয় অস্বীকার করুক'। (কাহাফ)। 'উপদেশ গ্রহণ করে যে চায় সে তার প্রভুর পথে চলতে পারে'। (যুমার)। 'ঈমান আনার জন্য কাউকে বাধ্য করা যায় না'। (ইউনুস)। 'মহনবী (সাঃ) একজন উপদেষ্টা মাত্র'। (আরাফ)। 'তাঁকে ধর্মের ব্যাপারে দারোগা করে পাঠানো হয়নি'। (জাসিয়া)। এই সব আয়াতে ধর্মের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

কারো মতের বা ধর্মের সঙ্গে অমিল হলেই তাকে হত্যা করতে হবে এমন কথা কোথাও নেই। অপরদিকে মওদুদি সাহেব তাঁর বইতে বলেছেন যে, ইসলাম গ্রহণ করে অথবা কোন জন্মগত মুসলমান যদি ইসলাম ধর্ম বর্জন করে অন্য কোন মতাদর্শে চলে যায় তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে। মওদুদি সাহেবের কল্পিত ধর্মরাষ্ট্রে কোনো অমুসলমান তার ধর্ম প্রচার করতে পারবে না। শুধু তাই নয়— কোন অমুসলমান অপর কোন অমুসলমানের কাছেও তার মতাদর্শ ব্যক্ত করতে পারবে না। এই হল মওদুদি সাহেবের ধর্মমত। অপরদিকে দেখেছি পবিত্র কোরাণ প্রতিটি মানুষকে বারবার ইচ্ছামত ধর্ম ও মত পরিবর্তনের অধিকার দিয়েছে। আল্লাহ তালা বলেছেন, 'সুম্মা আমানু সুম্মা কাফারু সুম্মা আমানু সুম্মা কাফারু'। (নিসা)। ঈমান এনে আবার কাফির হয়ে গিয়ে আবার বিশ্বাস স্থাপন করে আবার যে কেউ অবিশ্বাসী হয়ে যেতে পারে। যদি ইসলামে বিশ্বাস হারালে তার শাস্তি হয় কতল, তাহলে বারবার ইসলাম গ্রহণ করে তা বারবার ত্যাগ করে যাবার সুযোগ কোথায়? প্রথমবার ইসলাম পরিত্যাগ করলেই তো জীবন শেষ। মৌলবাদীদের ফতোয়া মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হলে বারবার ইসলাম গ্রহণ এবং বর্জন কি করে সম্ভব হবে? ইসলামের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মহানবী (সাঃ) একজন ওহী লেখকও মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি। বহুকাল পরে ঐ ব্যক্তি পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে আসেন। ইসলাম কোনো ইঁদুরের ফাঁদ নয় যার মধ্যে শুধু প্রবেশ করা যায়, বের হওয়া যায় না।'

আল্লামা শফী যখন জামায়াতের মুখপত্র দৈনিক 'সংগ্রাম'-এ আমাদের নাস্তিক মুরতাদ ফতোয়া দিয়েছেন— আমি তার সমালোচনা করেছি। আমার সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে তথাকথিত জামায়াতবিরোধী 'হেফাজতে ইসলাম' ও জামায়াতে ইসলামী প্রায় একই ভাষায় আমাকে আক্রমণ করেছে, যা প্রকাশিত হয়েছে ১৭ মার্চের দৈনিক সংগ্রাম-এ।

জামায়াত যাদের কথায় কথায় 'ইহুদি', 'নাসারা' বলে গালি দেয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরুদ্ধে লবিং করার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় সেই ইহুদি নাসারাদের তারা ভাড়া করেছে। একইভাবে তারা ভাড়া করেছে 'হিন্দু ভারত'-এর কাফেরদের। মুনতাসীর মামুনের ভাষায় বলতে হয়— টাকার কোন ধর্ম নেই, সন্ত্রাসেরও কোন ধর্ম

নেই। জামায়াতের টাকা খেয়ে জামায়াতবিরোধী মোল্লারা মওদুদিবাদের পক্ষে রাস্তায় নেমে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাবে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। প্রকৃত মুসলমানদের কাজ হচ্ছে এদের মুখোশ উন্মোচন করা।

বাংলাদেশের জন্য এবং ইসলামের জন্যেও আশার কথা হচ্ছে— দেশের বহু বরেণ্য ওলামা মাশায়েখ ও ধর্মীয় নেতারা জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের নব্যদোসর হেফাজতে ইসলামের এসব ফতোয়াবাজির কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন।

শান্তির ধর্ম ইসলাম কখনও গণহত্যাকারী, ধর্ষণকারী, লুণ্ঠনকারী সন্ত্রাসীর ধর্ম হতে পারে না। ইসলাম কখনও নিহতের পরিবারকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না, হত্যাকারীর বিচার করা যাবে না— এমন কথাও বলতে পারে না। জামায়াতিরা '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং '৭২-এর সংবিধানকে ইসলামের প্রতিপক্ষ বানিয়েছে, যা মওদুদিবাদের বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত ইসলাম কখনও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিপক্ষ হতে পারে না।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পাশাপাশি ইসলামকেও সন্ত্রাসের কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে হলে ওহাবিবাদ ও মওদুদিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগ্রামকে যুক্ত করতে হবে সুফী আউলিয়াদের প্রচারিত রাজনীতির কলঙ্কমুক্ত মানবিক ইসলামের সঙ্গে। যে রাজনৈতিক দলের দর্শন ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদী সন্ত্রাস সেই দল যদি ইসলাম হেফাজতের দায়িত্ব নয় এবং সরকার যদি তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তা শুধু দেশ ও জাতির জন্য নয়— প্রকৃত ইসলামের জন্যও সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনবে।

২০ মার্চ ২০১৩

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মৌলবাদ

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় বিজয়ের এক বছরেরও কম সময়ে স্বাধীন সা্র্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতিরা সদ্যজাত রাষ্ট্রের জন্য যে সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন তা ছিল অনন্যসাধারণ এক রাষ্ট্রীয় দলিল। এই সংবিধানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চার মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল— 'গণতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্র', 'জাতীয়তাবাদ' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'। শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত এবং অর্থনৈতিকভাবে পেছনের সারির একটি দেশ চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ভেতর 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে অন্যতম নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। যদিও বাঙালি জাতীয়তাবাদ চরিত্রগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, তারপরও রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক রাখার জন্য আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষাকবচ হিসেবে সাংবিধানিকভাবে ধর্মের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল '৭২-এর সংবিধানে।

এ বিষয়ে আমি এর আগেও লিখেছি, 'বাংলাদেশে সেক্যুলারিজমের ধারণা পশ্চিমের চেয়ে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। বাংলাদেশে এবং ভারতেও সেক্যুলারিজম বলতে বোঝায় রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছিন্নতা (Separation of state from religion), ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা নয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তাতে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা আইন করে ধর্মকে নিষিদ্ধ করতে চাই না এবং করব না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের বাধা দিবার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারো নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দিবার মত ক্ষমতা নেই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খৃষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরী, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার বাংলাদেশের মাটিতে চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিষ। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে— আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করেছি।" (গণপরিষদের ভাষণ, ১২ অক্টোবর ১৯৭২)

'ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ করবার জন্য '৭২-এর সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল যা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের

বাইরে কোন সেক্যুলার গণতান্ত্রিক দেশে সম্ভব হয়নি। এই সংবিধান কার্যকর থাকলে বাংলাদেশে বর্তমানে ধর্মের নামে রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার ও জঙ্গী মৌলবাদের জেহাদী উন্মাদনা দেখতে হতো না।

''৭২-এর সংবিধানে সেক্যুলারিজমকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের পর এটি দুই ধরনের সমালোচনা শিকার হয়। এক পক্ষ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, যারা ইসলামকে মনে করে পরিপূর্ণ জীবনবিধান যা রাষ্ট্র-রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি সব কিছু তাদের ব্যাখ্যা ও বিধান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করবে। অপরপক্ষ হচ্ছে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা, যারা পশ্চিমের প্রভাবে ধর্মকে ব্যক্তি ও সমাজজীবন থেকে নির্বাসনের পক্ষে। তাদের বক্তব্য ছিল 'সেক্যুলারিজম'-এর প্রকৃত বাংলা 'ধর্মনিরপেক্ষতা' নয়, 'ইহজাগতিকতা'। অপরদিকে মৌলবাদীরা বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে আক্রমণ করেছে এই বলে যে— ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে নাস্তিকতা, রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হলে মানুষের ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা থাকবে না। মৌলবাদী নয়, এমন দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা ছিল— '৭২-এর সংবিধানপ্রণেতারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানে ঢুকিয়ে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মের প্রতি অনুরাগের বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। শতকরা ৮৫% মুসলমানের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

'বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগী যাঁরা '৭২-এর সংবিধান প্রণয়ন করেছেন তাঁরা ধর্মকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে পৃথক করার কথা বললেও ব্যক্তিজীবনে ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। যে কারণে ইংরেজি সেক্যুলারিজমের বাংলা তাঁরা 'ইহজাগতিকতা' করেননি, 'ধর্মনিরপেক্ষতা' করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বার বার তাঁদের বলতে হয়েছে— ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়।'

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় প্রধান সহযোগী জামায়াতে ইসলামী যে কারণে ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছিল একই কারণে '৭২-এর সংবিধানও তাদের কাছে ছিল ইসলামের প্রতিপক্ষ। সম্প্রতি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে' জামায়াতের নায়েবে আমীর দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে '৭১-এ সংঘটিত গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। সাঈদীর বিভিন্ন ওয়াজে কীভাবে রাষ্ট্রের চার মূলনীতিকে ইসলামের প্রতিপক্ষ বানিয়ে এর প্রতি বিষোদগার করা হয়েছে, কীভাবে অন্যান্য ধর্ম এবং অমুসলিম নাগরিকদের বিরুদ্ধে কদর্য সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে— কিছু নমুনা দেয়া হয়েছে আমার প্রামাণ্যচিত্র 'জিহাদের প্রতিকৃতি'তে।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মকে অবৈধতা প্রদানের পাশাপাশি এর দর্শনকে বাংলাদেশের মাটিতে যেভাবে সমাধিস্থ করেছে, পাকিস্তানি শাসকরা এবং তাদের এদেশীয় তল্পিবাহকরা কখনও তা মেনে নেয়নি। এ কারণেই তারা ১৯৭৫-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদানকারী চার শীর্ষ নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। '৭২-এর

সংবিধানপ্রণেতাদের হত্যা না করলে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তে লেখা সংবিধান থেকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা মুছে ফেলা সম্ভব হত না। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান ৫ম সংশোধনীর দ্বারা সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' ও সমাজতন্ত্র মুছে ফেলে শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' এবং মুখবন্ধে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ-র উপর পূর্ণ বিশ্বাস...' ইত্যাদি সংযোজন করে বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় জেনারেল এরশাদ সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করলেন।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে মূল সংবিধানের চার মূলনীতি পুনঃসংযোজন করলেও জেনারেল জিয়ার 'বিসমিল্লাহ...' এবং জেনারেল এরশাদের 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' রেখে দিয়ে এটিকে স্ববিরোধী এক সংবিধানে পরিণত করেছে। 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সম্পূর্ণভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপন্থী। জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মতলবে ইসলামের নামে বাংলাদেশের সংবিধানে সাম্প্রদায়িকতা প্রবর্তন করেছেন। এ বিষয়ে তখন আমি লিখেছিলাম— 'ইসলামের ইতিহাস ও মহানবী (সঃ) র শিক্ষার আলোকে যদি দেখি— সংবিধানে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' রাখা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকেও অপ্রয়োজনীয়। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের স্বগোত্রীয় মৌলবাদী দলগুলো দাবি করে কোরাণ নাকি তাদের সংবিধান। তারা মানবরচিত সংবিধান, আইন-আদালত মানে না। তাদের এই বক্তব্য থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় ইসলামের তকমাধারী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্ম নিয়ে বৈশ্যবৃত্তির স্বরূপ। যে কোন ধার্মিক মুসলমান বিশ্বাস করেন কোরাণ আল্লাহর কালাম, কোরাণের একটি হরফও বদলানো যায় না। সংবিধান হচ্ছে মানুষের শাসিত রাষ্ট্র পরিচালনার দর্শন ও নিয়ম কানুন। সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের কান্ডারিদের সঙ্গে জনগণের চুক্তিবিশেষ যা প্রয়োজন ও নিয়ম অনুযায়ী সংশোধন ও পরিবর্তন করা যায়।

'বিশ্বের প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র মদিনার সংবিধান রচনা করেছিলেন স্বয়ং মহানবী (সঃ)। তিনি চাইলে কোরাণকে মদিনার সংবিধান হিসেবে চালু করতে পারতেন, ইসলামকে মদিনার রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা দিতে পারতেন। মহানবী (সঃ) তেমন কিছু করেননি বরং তাঁর সংবিধানে মদিনার মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের সমান অধিকার দেয়া হয়েছে, রাষ্ট্রকে কারও ধর্মের বিষয়ে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয়া হয়নি এবং অমুসলিমদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। যে কারণে ৬২২ সালে মহানবী (সঃ) কর্তৃক প্রণীত মদিনার সংবিধানকে গণ্য করা হয় বিশ্বের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান হিসেবে।

'ধার্মিক মুসলমানরা বিভিন্ন ইমামের বিধান মেনে চলেন। সুন্নি মুসলমানরা যে চার ইমামকে অনুসরণ করেন তাঁরা হচ্ছেন— ১) ইমাম মালিক, ২) ইমাম আল শাফি, ৩) ইমাম আবু হানিফা ও ৪) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল। অধিকাংশ সুন্নি মুসলমান ইমাম আবু হানিফার অনুসারী, যাদের বলা হয় হানাফি। মওদুদিবাদী জামায়াতিরা তথা ওহাবিরা নিজেদের হানাফি বলে দাবি করলেও অনুসরণ করে ইমাম হাম্বলের বিধান।

চার ইমামের ভেতর সবচেয়ে রক্ষণশীল হচ্ছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, যিনি জেহাদকে প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য ফরজ করেছেন। কোরাণের উৎসের ব্যাখ্যা নিয়ে বাগদাদের খলিফা মামুনের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য চরম আকার ধারণ করলে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছিলেন, খলিফা যেন রাজ্য শাসন ও রাজনীতির মধ্যে নিজের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেন, ধর্মের বিষয়ে যেন নাক না গলান; কারণ ধর্মের ব্যাখ্যা দেয়ার এখতিয়ার ইমামের, খলিফার নয়। ইমাম ইবনে হাম্বলের এই বক্তব্যের সারকথা হচ্ছে রাজনীতি থাকবে রাজনীতির জায়গায়, ধর্ম থাকবে ধর্মের জায়গায়। জামায়াতি ও ওহাবিদের মোনাফেকি হচ্ছে— দরকারমতো তারা হানাফি হবে, আবার তাদের দরকার হলে হাম্বলি হবে, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মতলবে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির খিচুড়ি পাকিয়ে শান্তির ধর্ম ইসলামকে কলুষিত করবে এবং ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ধর্মভীরু মানুষদের তা গেলাবে।

'মওদুদিবাদী, ওহাবিবাদীরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য, নিজস্ব রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারের জন্য দেশে দেশে ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে— তাদের কৌশল যখন ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল অনুসরণ করে। ইসলামের ব্যাখ্যা নিয়ে আমিনীদের সঙ্গে নিজামীদের গুরুতর মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু যখনই ক্ষমতার মূলো নাকের ডগায় ঝোলে তখনই তারা আদর্শগত যাবতীয় বিরোধ ভুলে গিয়ে মূলোয় দাঁত বসাবার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।' (পঞ্চদশ সংশোধনীর আলোকে বাংলাদেশের সংবিধান, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, নবেম্বর ২০১১)

বাংলাদেশের আমজনতাকে শাসকরা সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী মনে করলেও ইতিহাসে বার বার দেখেছি এদেশের মাটিতে মৌলবাদ কখনও শেকড় গাঁড়তে পারেনি। ধর্মের নামে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের মতো মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব আমরা '৭১-এ দেখেছি, আবার দেখেছি ২০০১ থেকে ২০০৬-এ বিএনপি-জামায়াত জোটের শাসনামলে। সম্প্রতি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের জন্য জামায়াত-বিএনপি একই কৌশল অবলম্বন করেছে। এবার আমাদের ভরসা হচ্ছে শাহবাগে তরুণ প্রজন্মের মহাজাগরণ, যারা নিজেদের দাবি করেছে— শহীদজননী জাহানারা ইমামের আন্দোলনের সন্তান। একুশ বছর আগে জাহানারা ইমাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং তাদের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে যে নাগরিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দীপ্ত শাহবাগের মহাজাগরণের নায়করা তার নেতৃত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ছাত্র-জনতার এই মহাজাগরণ ঢাকার শাহবাগের চত্বর থেকে ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। মৌলবাদীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে জামায়াত-বিএনপি যত বেশি প্রজন্ম চত্বরের তরুণদের 'শাহবাগী নাস্তিক, 'মুরতাদ', 'কাফের' ফতোয়া দিয়ে হত্যার হুমকি দিচ্ছে, ততই তারা সাধারণ মানুষের ঘৃণা কুড়োচ্ছে।

শাহবাগের গণজাগরণের নেতারা বার বার বলেছেন তাদের আন্দোলন ইসলাম বা কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। তারা শ্লোগান দিচ্ছেন— 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার'।

তারপরও তাদের বিরুদ্ধে চরম উস্কানিমূলক বক্তব্যপ্রদান ও ফতোয়া অব্যাহত রয়েছে। সকল উস্কানি সত্ত্বেও তারা যুদ্ধাপরাধী ও মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে অহিংস, অসহযোগ আন্দোলনের কথা বলছেন। তাদের চারপাশে মৌলবাদী হিংস্র শ্বাপদরা যেভাবে উন্মত্ত সন্ত্রাসী তাণ্ডব চালাচ্ছে, যেভাবে তারা রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করছে— সরকারের গান্ধীবাদী হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনকে কীভাবে রূপান্তরিত করতে হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে।

এবারের যুদ্ধ বাংলাদেশকে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার করাল থাবা থেকে মুক্ত করবার জন্য। অতীতে আমরা জয়ী হয়েছি, আগামীতে আমরাই জয়ী হব। এই জয় ইতিহাস নির্ধারিত। মৌলবাদ জয়ী হলে সভ্যতার অগ্রযাত্রা রুদ্ধ হবে। মৌলবাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকার যত কালক্ষেপণ করবে হত্যা ও ধ্বংসের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাবে। জামায়াতে ইসলামীসহ সকল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ না করলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কখনও বাংলাদেশ গড়া যাবে না। শাহবাগের তরুণরা রাষ্ট্রকেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের ঋণের দায়। গণহত্যাকারীদের রাজনীতি বহাল রেখে শুধু ব্যক্তির বিচার করলেই এ দায় থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না।

২৩ মার্চ ২০১৩

সরকারের দ্বিমুখী নীতি ঃ বিপন্ন রাষ্ট্রীয় ও জননিরাপত্তা

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই অস্থিতিশীল এবং হতাশাজনক। নির্বাচনকে সামনে রেখে দিন যতই এগিয়ে যাচ্ছে পরিস্থিতি ততই অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। বিএনপি জামায়াত একের পর এক হরতাল দিয়ে অর্থনীতি, উন্নয়ন, জনজীবনে মারাত্বক স্থবিরতা সৃষ্টি করেছে। গত কয়েক মাস ধরে আমরা যে ধরনের হরতাল দেখছি সেটা আগে কখনো দেখিনি। বিরোধী দলের দাবি আদায়ের চেয়ে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে সারা দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা। হরতাল ডাকা যেমন গণতান্ত্রিক অধিকার তেমনি সেটা পালন না করাও জনগণের অধিকার। মানুষকে ভয় দেখিয়ে হরতাল পালনে বাধ্য করা, আন্দোলনের নামে জনজীবন বিপর্যস্ত করা, জ্যান্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা, গাড়িতে আগুন দেয়া, আতঙ্ক সৃষ্টি করা। এগুলো হচ্ছে ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য। এটাই বিএনপি জামায়াতের রাজনীতির মূল ভিত্তি।

জামায়াতের রাজনীতির বৈশিষ্ট হলো তারা মানুষকে বাধ্য করে তাদের মতে চলার জন্য। জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদির অনেক লেখালিখি রয়েছে এই সব বিষয়ে। এখন বিএনপির রাজনীতি হলো জামায়াতকে অনুসরণ করা। জামায়াত আর বিএনপির রাজনীতির মধ্যে এখন আর কোন সীমারেখা নেই। হরতালের নামে তারা রাষ্ট্রের সম্পদ ধ্বংস করছে, সারাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকাকে বিপন্ন করছে। হরতালের নামে তারা এমন সব ধ্বংসাত্বক কর্মকান্ড করছে যেটা আগে কখনো দেখা যায়নি। বিদ্যুত কেন্দ্রে হামলা করা, রেল লাইন উপড়ে ফেলা, ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয়া, বাসে আগুন দেয়া, নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা করা এসবতো কোন আন্দোলনের ধরন হতে পারে না। এসব আমরা দেখি কোন দেশে গৃহযুদ্ধের সময়। গৃহযুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশে এই ধরনের ঘটনা ঘটে। বিএনপি জামায়াত দেশে গৃহযুদ্ধ বাঁধাতে চায়। সাইদীর রায়ের আগে জামায়াত ঘোষণা দিয়েছিল রায় যদি তাদের পছন্দ মতো না হয় তাহলে দেশে গৃহযুদ্ধ হবে আর এ জন্য সরকারকে দায়ী থাকতে হবে।

জামায়াত বিএনপি তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রে ওপর একের পর এক আঘাত করে চলেছে। তাদের কারণে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জননিরাপত্তা সব কিছুই এখন বিপন্ন। হরতালের কারণে প্রতিদিন দেড় হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে। গত কছর বছর ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা পাঁচ ভাগের ওপরে আছে। প্রবৃদ্ধির এই হারের দিক থেকে আমাদের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায় এক নম্বরে আর বিশ্বে পাঁচ নম্বরে। তাদের আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে এই প্রবৃদ্ধির হার ক্ষতিগ্রস্থ হবে। দেশ পিছিয়ে যাবে। এই ধরনের দেশদ্রোহিতামূলক কাজ তারাই করতে পারে যারা বাংলাদেশকে গ্রহন করতে পারেনি, একাত্তরে যারা এদেশের

স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেনি। জামায়াতে ইসলামী একদিকে যুদ্ধাপরাধীদরে বিচার বানচালের জন্য এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি দিচ্ছে। এর পাশাপাশি তারা একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিচ্ছে। বাংলাদেশ পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে হয়তো এটা তাদের পছন্দ নয়। তারা একাত্তরে গণহত্যা ধর্ষণের মতো যুদ্ধাপরাধ করেছিল পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য। তারা বাংলাদেশের বহুত্ববাদ সমাজ, সভ্যতা, হাজার বছরের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সব কিছু ধ্বংস করার খেলায় মেতে উঠেছে। সাইদীর মামলার রায়কে কেন্দ্র করে যেভাবে তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে এটা এক কথায় নজিরবিহীন।

তাদের এই ধরনের সন্ত্রাস আমরা দেখেছি ২০০১ সালের নির্বাচনের পরে। সেই সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় জামায়াত বিএনপির হাতে হামলার শিকার হয়েছে। কারণ তারা মনে করে এদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাক্তিরা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। যদিও তাদের এই ধারণা সঠিক নয়। এবারতো নির্বাচনের এক বছর আগে থেকেই তারা এ ধরনের সন্ত্রাস শুরু করেছে। তারা এই দেশে মুসলিম ছাড়া অন্য কোন ধর্মীয় অনুসারীদের থাকতে দেবে না। শুধু তাই নয় তাদের মতের বাইরে কোন মুসলিম থাকতে পারবে না। ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী কোন মুসলিম থাকতে পারবে না। তারা তাদের দর্শন অনুযায়ী বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো একটি মনোলিথিক মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে নেমেছে। মাদ্রাসা কেন্দ্রিক যে সব সংগঠন আছে, যারা এক সময় জামায়াতবিরোধী ছিল, এখন জামায়াত কৌশলে তাদের নিজেদের কর্মসূচির সাথে যুক্ত করেছে। এখন হেফাজতে ইসলামকে জামায়াত ব্যাবহার করছে। এভাবেই যারা এক সময় জামায়াতবিরোধী ছিল তারাও এখন জামায়াতের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে মাঠে নেমেছে।

৬ এপ্রিল ঢাকা অভিমুখী লংমার্চ পরবর্তী সমাবেশে হেফাজতের ইসলাম তাদের তের দফায় যা কিছু বলেছে সেটা জামায়াতের রাজনীতি ছাড়া আর কিছু নয়। এটা জামায়াতের রাজনৈতিক দর্শন মওদুদিবাদের ধারাবাহিকতা। এতকাল জামায়াত যেটা বলেছে এখন হেফাজতে ইসলাম সেটাই বলছে। হেফাজতে ইসলামের তের দফায় এমন নতুন কিছু নেই যেটা জামায়াত আগে বলেনি। তারা ধর্ম অবমাননার অভিযোগে মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে আইন করার কথা বলেছে। যাকে বলা হয় ব্লাসফেমি আইন। এই দাবী জামায়াত হেফাজতের অনেক আগেই করেছিল। জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামী ১৯৯৩ সালে পার্লামেন্টে ব্লাসফেমি আইন প্রণয়নের জন্য বিল জমা দিয়েছিলেন। তখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল, তারা জামায়াতের এই আবদার মেনে নেয়নি। এমন কি তারা এটা আলোচনার মধ্যেও আনেনি। কিন্তু লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, ২০০১ সালে সেই মতিউর রহমান নিজামী যখন জোট সরকারের অংশীদার হয়ে ক্ষমতায় গিয়ে মন্ত্রী হয়েছেন তখন একবারও বলেননি যে ব্লাসফেমি আইন পাশ করতে হবে। এই হেফাজতে ইসলামও ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিল। একবারের জন্যও বলেনি যে বাংলাদেশে ব্লাসফেমি আইন পাশ করতে হবে।

হেফাজত বা জামায়াত যেটাকে তাদের ভাষায় আল্লাহ রসুলের সমালোচনা বলে, এর বিরুদ্ধে আইন অনেক আগে থেকেই এই অঞ্চলে ছিল। সেটা বৃটিশ আমলেও দেখা গেছে। দেড়শ বছর আগে বৃটিশ সরকার সেই সময় ধর্মীয় অবমাননার জন্য শাস্তির বিধান রেখে আইন করেছে। এই আইন এখনো ফৌজদারী দন্ডবিধিতে আছে। এটা আমাদের সংবিধানেও আছে। এখন যে তথ্য প্রযুক্তি আইন করা হয়েছে সেখানেও আছে। তাই এটার জন্য নতুন করে কোন আইন করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। এটা আসলে জামায়াতের রাজনৈতিক এজেন্ডা–যেটা পাকিস্তানে তারা করেছে। সেই পাকিস্তানের আজ কি অবস্থা? পাকিস্তান এখন পৃথিবীতে এক নম্বর ব্যার্থ রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আজ সারা বিশ্বের লোকজন এমন কি সেই দেশের বুদ্ধিজীবীরাও বলছেন বিশ্বের সবচেয়ে বিপদজনক রাষ্ট্র পাকিস্তান। এমন কোন দিন নেই যেখানে কোন না কোন জঙ্গি হামলা ঘটে না। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে পাকিস্তানে।

বাংলাদেশকে জামায়াত পাকিস্তান বা আফগানিস্তান বানাতে চাইছে, এটাই তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা। তের দফার আরো একটি দফা হলো কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। এই একই ইস্যুতে জামায়াত পাকিস্তানে ১৯৫৩ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করেছিল। শত শত আহমদিয়া মুসলিমকে তারা হত্যা করেছিল। তাদের হাত থেকে নারী শিশু বৃদ্ধ কেউ রক্ষা পায়নি। জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মওদুদি সেই সময় কাদিয়ানি সমস্যা নামে একটা বই লিখে এই দাঙ্গার উস্কানি দিয়েছিলেন। সেজন্য সামরিক আদালতে এই মওদুদির মৃত্যুদন্ড হয়েছিল। হেফাজতে ইসলাম এই ইস্যু আসলে জামায়াতের কাছ থেকে ধার করেছে। এটা জামায়াতের দাবি। হেফাজত সচেতন বা অবচেতনভাবে জামায়াতের রাজনৈতিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে।

'৫৩ সালে পাকিস্তানে দাঙ্গার পর সরকার বিচারপতি মুনিরের নেতৃত্বে একটি কমিশন করেছিল। সেই কমিশন ১৫ জন ইসলামী চিন্তাবিদকে ডেকে জানতে চেয়েছিলেন ইসলাম এবং মুসলিমের সংজ্ঞা কি? ১৫ জন চিন্তা ১৫টা সংজ্ঞা দিলেন। তারপর কমিশন রিপোর্ট করেছে, যদি একজনের সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয় তাহলে অপরজন মুরতাদ বলবে। রাষ্ট্র তাহলে কার সংজ্ঞা নেবে? সুতরাং কে মুসলিম আর কোনটা ইসলাম সেটা নির্ধারণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিতে পারে না। ভালো হবে রাষ্ট্র যেন এ ব্যাপারে নাক না গলায়। কে মুসলিম আর কে মুসলিম না এটা রাষ্ট্র বলার কেউ না। এই স্বীকৃতি দেয়ার অধিকার কারও নেই। একমাত্র আল্লাহ জানেন কে মুসলিম আর কে মুসলিম নয়। কারণ একমাত্র তিনিই অন্তর্যামী। জামায়াত যেমন এটা বলতে পারে না, হেফাজতে ইসলামও এটা বলতে পারে না। মওদুদি বলেছে তাদের দল না করলে কেউ মুসলিম নয়, তারা মুরতাদ। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিমরা মওদুদির বা জামায়াতের এই আকিদা বিশ্বাস করে না।

আমরা এর আগে অনেকবার দেখেছি, যখন জামায়াত রাজনৈতিকভাবে কোনঠাসা হয়ে পড়ে তখন কাদিয়ানি ইস্যু, ব্লাসফেমি আইন, আস্তিক নাস্তিক ইস্যু, কাফের মুরতাদ ফতোয়া দেয়া এই সব ইস্যু সামনে নিয়ে আসে। এভাবে তারা মানুষের চোখ

অন্য দিকে সরিয়ে নিতে চায়। ১৯৯২ সালে আমরা দেখেছি তারা কাদিয়ানিদের অসংখ্য মসজিদে হামলা চালিয়েছে। তাদের গ্রন্থাগারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। রাজশাহীতে ৫৬টি ভাষায় লেখা কোরান শরিফ ছিল। অনেক প্রাচীন হাতে লেখা কোরান শরিফ ছিল। চেঙ্গিস খান, হালাকু খানের মতো জামাতিরা আহমদীয়াদের গ্রন্থাগার ধ্বংস করেছিল। এটাই হচ্ছে জামায়াতের আসল পরিচয়। তখন তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালিয়েছিল। আহমেদ শরীফ, আহমেদ ছফার মতো বুদ্ধিজীবীদের তারা নাস্তিক মুরতাদ কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছিল। এসব করার মাধ্যমে তারা মানুষের চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। তখন শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটির জামায়াতবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে ছিল। তার সেই আন্দোলনের কারণে জামায়াত রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ন কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল।

এই সময় ভারতে উগ্র হিন্দুরা বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেলে। জামায়াত সেই ঘটনার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হিন্দুদের মন্দিরে হামলা করে। তখন তারা বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের তিন হাজার ছয়শত মন্দির ভেঙে ফেলেছিল। এটা সংসদের ধারা বিবরণীতে লেখা আছে। হিন্দু সম্প্রদায় বা আহমাদিয়া মুসলিমদের আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেয়া, ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীদের প্রতি নাস্তিক মুরতাদ বলে ফতোয়া দেয়া, এই সব কাজ তারা আগেও করেছে। জাহানারা ইমামের আন্দোলনের কারণে কোনঠাসা অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা এসব করেছিল।

এখন তারা ঠিক একই কাজ করছে যখন শাহবাগে জামায়াত নিষিদ্ধ আর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে তরুণদের মহা-জাগরণ ঘটেছে। এই জাগরণ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, সারা দেশের তরুণ সম্প্রদায় জামায়াত নিষিদ্ধ আর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ। ফলে জামায়াত আবারো রাজনীতিতে কোনঠাসা অবস্থায় পড়েছে। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য, মানুষের চোখ অন্যদিকে সরিয়ে দেবার জন্য এখন তারা বিভিন্ন ইস্যু সামনে আনছে। জামায়াত শুরুতেই ফতোয়া দিয়েছে শাহবাগের গণজাগরণ যারা করেছে তারা সবাই নাস্তিক মুরতাদ কাফের। তাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে এক সময় যারা জামায়াতবিরোধী ছিল সেই হেফাজতের ইসলামও এখন বলছে ব্লগাররা নাস্তিক মুরতাদ কাফের।

জামায়াতের পৃষ্ঠপোষকতায় বা আর্থিক সহযোগিতায় হেফাজতের যে সমাবেশ হলো তারও কিন্তু লক্ষ্য একই। হেফাজতের যে তেরো দফা সেটা আসলে জামায়াতেরই তের দফা। এটা খুবই দূঃখজনক যে এক সময় আমরা দেখেছি হেফাজতে ইসলামের আমীর আল্লামা শফী, যিনি এক সময় জামায়াতবিরোধী ছিলেন, এক সময় তিনি জামায়াতের বিরুদ্ধে অনেক লিখেছেন, সেই সব লেখা আমরাও পড়েছি। আজকে আল্লামা শফীর তের দফা তার নিজের সেই সব লেখার বিরোধী। তাদের লেখার মধ্যেই আছে জামায়াতের ফেতনা কাদীয়ানীদের থেকেও ভয়ঙ্কর। অথচ আজ তিনি কাদিয়ানিদের অমুসলিম করার কথা বলছেন কিন্তু জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার কথা বলছেন না। মওদুদিপন্থি আকিদা নিষিদ্ধ করার কথা বলেননি। এগুলো

থেকে এটা পরিস্কার হয়ে গেছে যে জামায়াতের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। নারী নীতি, শিক্ষা নীতি নিয়ে সরকার অনেকবার বলেছে এর মধ্যে ইসলামবিরোধী কি আছে আপনারা দেখান। তারা একবারও নির্দিষ্টভাবে বলছে না যে এটা ইসলামবিরোধী। তারা বলছে শাহবাগের নারী পুরুষের মেলামেশার কথা।

হেফাজতের তের দফার প্রতিটি দফা ধরে ধরে বিচার করলে দেখা যাবে যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটা যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনি আমাদের সংবিধানের দৃষ্টিতেও এটা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগে এক সাক্ষাতকারে পরিস্কারভাবে বলেছেন আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি হলো ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্র। একই সঙ্গে হেফাজতের তের দফা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদেরও পরিপন্থি। তাই তের দফার একটিও যদি মানা যায় তাহলে সেটা হবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের পরিপন্থি, সংবিধানের পরিপন্থি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি এবং ইসলামেরও পরিপন্থি। সেকারণে তের দফা দাবির একটিও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা আগেই বলেছি হেফাজতকে সমাবেশ করতে দিয়ে সরকার তাদের প্রশ্রয় দিয়েছে। এটা সরকারের উচিত হয়নি। এই হেফাজতের নেতারা শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের নেতাদের চট্রগ্রামে সমাবেশ করতে দেয়নি। তারা হুমকি দিয়েছিল চট্রগ্রামে সমাবেশ করলে লাশের পর লাশ পড়ে যাবে। যেহেতু প্রশাসন শাহবাগের আন্দোলনের নেতাদের সমাবেশ করতে দেয়নি তাই আমরা মনে করেছিলাম হেফাজতকেও সরকার মতিঝিলে সমাবেশ করতে দেবে না। কিন্তু সরকার তাদের সমাবেশ করতে দিয়েছে। আমরা হরতাল দেয়ার কারণে তারা তাদের ঘোষণা অনুযায়ী লোক সমাগম করতে পারেনি। তারা ঘোষণা দিয়েছিল ৫০ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটাবে তারা শাহবাগ দখল করে নেবে। তাদের সেই ষড়যন্ত্র সফল হয়নি আমাদের প্রতিরোধের কারণে। সরকার তাদের সঙ্গে আপোষ করছে।

সেদিন হেফাজতের কর্মীরা আমাদের ওপর হামলা করেছিল। আমি মনে করি না সেটা হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা। এটা তারা পরিকিল্পতভাবেই করেছে। কারণ তাদের সমাবেশের আগেই আল্লামা শফী জামায়াতের পত্রিকাগুলোতে বিশাল খোলা চিঠি লিখে আমাকে ও মুনতাসীর মামুনসহ শাহবাগের গণজাগরণের নেতাদের নাস্তিক মুরতাদ কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন। এই জাতীয় ফতোয়া দেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো তাদের কর্মীদের বলা এরা হত্যার যোগ্য এবং যেখানে পারো তাদের হত্যা করো। এমন কি চট্রগামসহ বিভিন্ন সমাবেশে তারা অনেকবার বলেছেন নির্মূল কমিটির নেতাদের যেখানে পাবে সেখানে হত্যা করবে। এভাবে তারা কর্মীদের হত্যার জন্য প্রলুব্ধ করেছেন, তাদের উৎসাহিত করেছেন। জামায়াত অনেকবার আমাদের হত্যার জন্য ফতোয়া দিয়েছে। পার্লামেন্টে হুমায়ন আজাদ সম্পর্কে সাঈদী বলেছেন তিনি নাস্তিক মুরতাদ কাফের। তাদের হত্যার জন্য ব্লাসফেমি আইন করতে হবে। তারপরেই হুমায়ন আজাদের ওপর হামলা হয়েছে। কাজেই মাওলানা শফী যখনই খোলা চিঠি লিখেছেন তখনই আমরা ধরে নিয়েছি আমাদের ওপর হামলা হবে। ৬ এপ্রিল (২০১৩) হেফাজতের লঙ মার্চের দিন মহাখালিতে আমাদের সমাবেশ ছিল। আমাদের

সমাবেশের পাশ দিয়ে তাদের অনেক গাড়ি চলে গেছে আমরা কোন বাধা দেইনি। আমাদের ওপর হামলাটা পরিকল্পিত বলে মনে হয়েছে কারণ টঙ্গি থেকে যারা হেঁটে আসছিল তাদের জন্য মতিঝিল যাওয়ার সহজ রাস্তা হলো বিশ্বরোড। কেন তারা মহাখালি হয়ে অতিরিক্ত পাচ কিমি পথ ঘুরে যাবে? কিন্তু সেটাই হয়েছে। তারা আমাদের সমাবেশ অতিক্রম কার সময় হঠাৎ করে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। পরে জানা গেছে জামায়াতের লোকেরা আগে থেকে মহাখালি বাজারে অবস্থান নিয়েছিল। এবং মিছিলকারিদের তারা হামলা করতে প্রলুব্ধ করে। হেফাজতের ছত্র ছায়ায় জামায়াতিরা আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে।

ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে সরকার ব্লগারদের গ্রেফতার করেছে। আমি মনে করি এটা অত্যান্ত নিন্দনীয়। এটা আমাদের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার যেমন বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতার পরিপন্থি। আমরা বার বার বলে আসছি ব্লাশফেমির ধারণাটি এসেছে ইহুদি, খৃস্টান ধর্ম থেকে। ইসলাম ধর্মানুযায়ী কেউ যদি আল্লাহ, রসুল বা ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করেন তার কোন জাগতিক শাস্তি পবিত্র কোরআনের কোথাও রাখা হয়নি। স্বয়ং আল্লাহ তাকে সেই শাস্তি দেবেন। এখন আল্লাহ যে শাস্তি দেবেন সেটা যদি বান্দা নিজের হাতে তুলে নেয় তাহলে সেটাইতো ধর্মের অবমাননা। কতগুলি শাস্তি আছে যেগুলো জাগতিক শাস্তি, সেটা কোরআনে উল্লেখ আছে। কিন্তু ধর্ম অবমাননার অভিযোগের শাস্তি আল্লাহ নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন। আমি অন্তত দুইশত আয়াত দেখাতে পারবো যেখানে পবিত্র কোরানে অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা এবং ধর্ম অবমাননার শাস্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। ব্লাসফেমির ধারণাটি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের ফৌজদারী দন্ডবিধিতে আছে কারো ধর্মীয় অনুভূতিতে যদি আঘাত দেয়া হয় তাহলে সেটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সেই অভিযোগে সরকার কারো বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে কিন্তু কাউকে রাতের অন্ধকারে গ্রেফতার করা, এবং তাদের টেলিভিশনের সামনে হাজির করাটা একেবারে নজিরবিহীন। পাকিস্তানে আমরা দেখেছি ব্লাসফেমির আইনে যাদের গ্রেফতার করা হয় তাদের ক্যামেরার সামনে হাজির করা হয় না। কারণ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমান করা না গেলে তাদের ছেড়ে দেয়া হয় কিন্তু পরে উগ্রপন্থিরা তাদের হত্যা করে। তাই সেখানে নিয়ম হয়েছে গ্রেফতারের পর তাদের চেহারা দেখানো যাবে না। কিন্তু আমাদের এখানে সেটা করা হয়েছে। এটা অত্যান্ত নিন্দনীয়। আমরা এই গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়েছি। এই গ্রেফতারের জন্য বাইরে বেশ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। এ্যামনেস্টিসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন এই গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের যে উদানৈতিক ভাবমূর্তি রয়েছে তার ভীষণ ক্ষতি হয়েছে।

ব্লগারদের গ্রেফতারের মধে দিয়ে সরকার হেফাজতের দাবির কাছে নতি স্বীকার করেছে। কারণ তাদের গ্রেফতারের জন্য হেফাজত সরকারকে চাপ দিয়েছিল। তাদের এই সব দাবি উঠেছে সাঈদীর গ্রেফতারের পর থেকে। সরকার তাদের সন্তষ্ট করার জন্য এটা করেছে। মৌলবাদের সাথে আপোষ করলে তার ফল কখনো শুভ হয় না।

আস্কারা দেয়া হলে তাদের ধৃষ্টতা বেড়ে যাবে। এখনতো তারা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে নাস্তিক বলছে। গ্রেফতার করা উচিত ছিল সেই হেফাজতের নেতাদের যারা বাংলাদশে বসে আমাদের সংবিধানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার কোন অবস্থান নিয়েছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষ নেতা তোফায়েল আহমেদও বলেছেন সরকার দুই নৌকায় পা রেখে চলতে পারে না।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা কতগুলি বিধি নিষেধ সাপেক্ষে। কেই কেউ বলছে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা যাবে না। তেমনি আমিওতো বলতে পারি আমার রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আঘাত করা যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যদি হয় আমার আদর্শ ও রাজনৈতিক অনুভূতি এটাকে আপনি কিভাবে আঘাত করবেন? কিন্তু যুদ্ধাপরাধীরা সেটাই করছে। কাজেই যদি ব্যবস্থা নিতে হয় তাহলে সবার বিরুদ্ধে নিতে হবে। আল্লাহ রসুলের সমালোচনা যেমন নিন্দনীয়, অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা সেটাও নিন্দনীয়, কাদিয়ানিদের কাফের ঘোষণার দাবিও নিন্দনীয়। এই সব নিন্দনীয় কাজের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনের বিধান অনুযাযী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পাকিস্তানে আমরা এমনও দেখেছি জামায়াতের বিরুদ্ধে কথা বলাটাই তারা ব্লাসফেমি বলে ধরে নিয়েছে। জামায়াত বলে তারা আল্লাহ দল, কাজেই আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলা মানেই আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলা। আমরা পরিস্কারভাবেই বলি এগুলো ইসলামবিরোধী আকিদা। আমাদের কথা হচ্ছে রাষ্ট্রকে ধর্মীর ব্যাপারে একেবারেই নিরপেক্ষ থাকতে হবে। পাকিস্তানে যেমন মুনির কমিশন হয়েছিল তেমনি সরকার এখন একটা কমিশন করে দিতে পারে। তারা বিবেচনা করে দেখতে পারে হেফাজত যা বলছে বা আমরা যেটা বলছি তার মধ্যে কতটুকু গ্রহণযোগ্যতা আছে। আজ বিএনপি হেফাজত ও জামায়াতকে প্রশ্রয় দিয়ে নির্বাচনের রাজনীতিতে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। এর মাসুল বিএনপিকে দিতে হবে।

১৬ এপ্রিল ২০১৩

নির্মূল কমিটির উপর জামায়াতের ধারাবাহিক আক্রমণের শানে নজুল

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করার জন্য জামায়াতে ইসলামী অবশেষে এক সময়ের জামায়াতবিরোধী চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসাভিত্তিক 'হেফাজতে ইসলাম'-কে মাঠে নামিয়েছে। এই সংগঠনের আমীর আল্লামা শাহ্ আহ্মদ শফী এক সময় জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবুল আলা মওদুদির সমালোচনা করে বইও লিখেছিলেন। এই একই ব্যক্তি এখন জামায়াতের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের নেতাদের সমালোচনার পাশাপাশি আমাকে ও মুনতাসীর মামুনকে 'নাস্তিক', 'মুরতাদ' ইত্যাদি বলে আমাদের প্রতিরোধের ডাক দিয়েছেন।

গত মাসে চট্টগ্রামে গণজাগরণ মঞ্চের সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল হেফাজতওয়ালারা। নেতারা বলেছেন ১৩ মার্চের সমাবেশে আমরা যদি চট্টগ্রাম যাই আমাদের লাশ ফেলে দেয়া হবে। তাদের হুমকির কারণে প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে আমাদের চট্টগ্রাম যেতে না দিলেও গত ৬ এপ্রিল লংমার্চ করে ঢাকা এসে হেফাজতকে মহাসমাবেশ করার অনুমতি দিয়েছে।

লংমার্চ ঘোষণার সময় হেফাজতের নেতারা বলেছিলেন সারা দেশ থেকে ৫০ লক্ষ 'তৌহিদী জনতা' ঢাকা এসে মহাসমাবেশ করে শাহবাগ থেকে 'নাস্তিক, মুরতাদ, কাফের'দের উৎখাত করে 'ইসলামী জাগরণ মঞ্চ' বসাবেন। তারা গণজাগরণ মঞ্চের নেতাদের ফাঁসিও দাবি করেছেন, কারণ শাহবাগ থেকে যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবি উঠেছে।

শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চকে রক্ষার পাশাপাশি জননিরাপত্তা বিপন্ন হওয়ার শংকা থেকে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' ও 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট' সহ ২৭টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন লংমার্চের সময় সারা দেশে ২৪ ঘণ্টার হরতাল আহ্বান করেছিল এবং সকল পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনকে অনুরোধ করেছিল ৫ এপ্রিল সন্ধ্যা থেকে ৬ এপ্রিল সন্ধ্যা পর্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার জন্য।

আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম হরতালের দিন ঢাকার উত্তরের গাবতলী থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণের সাঈদাবাদ পর্যন্ত ৪০টি স্থানে নির্মূল কমিটি ও জোট অবস্থান ও সমাবেশ করবে। ৬ এপ্রিল সকাল ৮টায় অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, ক্যাপ্টেন (অবঃ) শাহাবউদ্দিন বীরউত্তম, কাজী মুকুল, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, অধ্যাপিকা জেরিনা রহমান খান, অধ্যাপিকা সোনিয়া নিশাত আমীন, সঙ্গীতশিল্পী জান্নাতুল ফেরদৌসী ও অধ্যাপক মোহাম্মদ সেলিম সহ কেন্দ্রের অধিকাংশ নেতার সঙ্গে আমি অবস্থান নিয়েছিলাম মহাখালী ফ্লাইওভারের নিচে। আমাদের সমাবেশ আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল ১০টায়। আমরা ভেবেছিলাম খুব বেশি হলে হাজার দেড়েকের সমাগম হবে এবং সে অনুযায়ী মাইক, চেয়ার ও শতরঞ্জির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঠিক সাড়ে নটায় হেফাজতে

ইসলামের একটি বড় মিছিলকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে জামায়াত শিবিরের সন্ত্রাসীরা আমাদের সমাবেশস্থলে হামলা চালায়। প্রথমে হামলাকারীরা সভাস্থলে স্যান্ডেল-জুতা, পানির বোতল ও কাঁচের গ্লাস ছুঁড়ে মারে এবং পরে বড় বড় ইট ও পাথর নিক্ষেপ করে। এরপর হামলাকারীরা আরও মারমূর্তি হয়ে সমাবেশস্থলে ছুটে এসে বড় ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে ফেলে, টেবিল, চেয়ার, মাইক, সাউন্ডসিস্টেম সব কিছু ভেঙে সভাস্থল তছনছ করে।

হামলাকারীরা যখন সভামঞ্চে আমাকে ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনসহ সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো ইট পাথর নিক্ষেপ করছিল তখন নির্মূল কমিটির কর্মীরা মানবঢাল তৈরি করে আমাদের রক্ষা করতে গিয়ে নিজেরা আহত হন। অন্যথায় সেদিন আমাদের প্রাণনাশের ঘটনা ঘটতে পারত। এই সময় হামলাকারীদের ইটের আঘাতে বনানী থানার দুইজন পুলিশ কর্মকর্তা সহ কয়েকজন পথচারীও আহত হন। আমাদের ২০ জন আহত কর্মী স্থানীয় ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ করেন। হেফাজতের নামে জামায়াতের এই নৃশংস কাপুরুষোচিত হামলার দৃশ্য ৬ এপ্রিল বিভিন্ন টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয় এবং পরদিন ৭ এপ্রিল জাতীয় দৈনিকসমূহে এর সংবাদ প্রকাশিত হয়।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে হেফাজতে ইসলামের আমীর শায়খুল হাদিস আল্লামা আহ্‌মদ শফী জামায়াতে ইসলামের মুখপত্র দৈনিক 'সংগ্রাম'-এ 'ইসলাম বিদ্বেষের প্রতিবাদে গর্জে উঠুন' শিরোনামে প্রকাশিত এক খোলা চিঠিতে আমাকে ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে 'নাস্তিক', 'মুরতাদ', 'মুশরিক' ও 'ইসলামবিদ্বেষী' আখ্যা দিয়ে আমাদের হত্যার জন্য তাঁর সংগঠনের এবং সমমনা অন্যান্য জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের কর্মীদের উৎসাহিত করেছেন। এরপর থেকে বিভিন্ন জনসভায় ও গণমাধ্যমে প্রদত্ত বক্তব্যে হেফাজতে ইসলামের শীর্ষ নেতারা ধারাবাহিকভাবে অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করে আমাদের হত্যার জন্য তাদের অনুসারী জঙ্গীদের প্ররোচিত করেছেন।

৬ এপ্রিল আমাদের উপর হেফাজতের আলখাল্লাধারী জামায়াতি জঙ্গীদের হামলা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। টঙ্গী ও উত্তরা থেকে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে যাওয়ার সোজা রাস্তা ছিল বিশ্বরোড। মিছিলকারীরা বিশ্বরোড বাদ দিয়ে পাঁচ কিলোমিটার ঘুরে যখন মহাখালীর পথ ধরেছিল— পুলিশের তখনই বাধা দেয়া উচিৎ ছিল। যে পুলিশ হেফাজতওয়ালাদের নিরীহ হুজুর মনে করে ছেড়ে দিয়েছে এবং পরে সেই পুলিশ জঙ্গী হুজুরদের মার খেয়ে হাসপাতালে গেছে।

আমাদের সমাবেশস্থলে মৌলবাদী দুর্বৃত্তদের হামলার সংবাদ জানার পর শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে টেলিফোন ও মেইল পেয়েছি। নির্মূল কমিটির সহযোদ্ধা ও শুভানুধ্যায়ীরা উদ্বেগ প্রকাশ করে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছেন। লাহোর থেকে নির্মূল কমিটির পাকিস্তান শাখার সহ-সভাপতি এডভোকেট জাফর মালিক লিখেছেন— তাদের দেশে জামায়াতে ইসলামী যখন কোণঠাসা হয়ে পড়ে তখন তারা সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য এ ধরনের সন্ত্রাস ও হামলার আশ্রয় নেয়।

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠনের প্রয়োজন হয়েছিল সময়ের প্রয়োজনে। ১৯৯১-এর ২৯ ডিসেম্বর '৭১-এর ঘাতক দালালদের প্রধান দল জামায়াতে

ইসলামী যখন শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধী এবং পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমকে দলের আমীর ঘোষণা করে তখন গোটা জাতি বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। এই বিক্ষোভেরই চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ছিল 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠন। দেশের ১০১ জন বরেণ্য নাগরিক একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করে সূচনা করেছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং তাদের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে এক অভূতপূর্ব নাগরিক আন্দোলন, যার নেতৃত্বে ছিলেন শহীদজননী জাহানারা ইমাম। সেই থেকে জামায়াতের প্রধান টার্গেট হচ্ছে নির্মূল কমিটি।

নির্মূল কমিটি গঠনের ২১ বছর পর একইভাবে সময়ের দাবি মেটানোর প্রয়োজনে ৫ ফেব্রুয়ারি (২০১৩) ঢাকার শাহবাগ চত্বরে সূচিত হয়েছে এক অনন্যসাধারণ ছাত্রজনতার অভ্যুত্থান, যার নেতৃত্বে রয়েছেন তরুণ ব্লগাররা। দু বছর আগে কায়রোর তাহরির স্কয়ারে মিশরের তরুণ ব্লগার ও ফেসবুক প্রজন্ম শাহবাগের মতো এক মহাজাগরণের সূচনা করেছিলেন, যার অবসান ঘটেছে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পতনের মাধ্যমে।

শাহবাগের সঙ্গে তাহরির স্কয়ারের পার্থক্য হচ্ছে— ১) শেষোক্তটি ছিল সরকারের পতনের জন্য কিন্তু প্রথমটি তা ছিল না, বরং শুরুতে শাহবাগ ছিল সরকারের শুভেচ্ছাধন্য। ২) তাহরির স্কয়ারের প্রতি সমর্থন ছিল মৌলবাদী 'মুসলিম ব্রাদারহুড'-এর, শাহবাগের অবস্থান ছিল সরাসরি মুসলিম ব্রাদারহুড-এর জ্ঞাতিভাই জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে। শাহবাগ গণজাগরণ মঞ্চের তরুণ ব্লগাররা শুরুতেই ঘোষণা করেছিলেন তারা শহীদজননী জাহানারা ইমামের সন্তান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তাদের চালিকাশক্তি।

মৌলবাদীরা এখন যেভাবে গণজাগরণ মঞ্চের নায়কদের নাস্তিক-মুরতাদ-কাফের বলে চরিত্রহননের অপচেষ্টা করছে, ২১ বছর আগে নির্মূল কমিটির আন্দোলনের শীর্ষ নেতাদেরও তারা একই ভাষায় চরিত্রহনন করেছে। হেফাজতের অন্যতম নেতা মওলানা আশরাফ আলী নিজামপুরী তাদের ভাষায় নাস্তিক-মুরতাদ-কাফের এরকম দেশী-বিদেশী ১৩ জন ধর্মীয় নেতা ও বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে একটি বই লিখেছেন, যার শিরোনাম হচ্ছে 'বুদ্ধিজীবী, মৌলবাদী ও ফতোয়াবাজি'। হেফাজতের আমীর আল্লামা শফী এ বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন। যে ১৩ জন সম্পর্কে হেফাজত নেতা এ বই লিখেছেন সবার উপরে রয়েছে আহমদিয়া মুসলিম জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ও লেখক সালমান রুশদীর নাম। বাকি ১১ জনের ভেতর রয়েছেন কবি সুফিয়া কামাল ও শহীদজননী জাহানারা ইমাম সহ ৮ জন নির্মূল কমিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের, এমন কি '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের নায়কদের বিরুদ্ধে একই ভাষায় কুৎসা রটনা করেছিল মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি। শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের সর্বত্র— বিশেষভাবে মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহে প্রগতিবাদীরা সব সময় মৌলবাদীদের আক্রমণের শিকার হয়েছে, তাদের হত্যা করা হয়েছে, হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করা হয়েছে, নির্যাতন করা হয়েছে এবং বহু ক্ষেত্রে আর্থিকভাবে তাদের ধ্বংস করা হয়েছে।

নির্মূল কমিটি গঠনের পরপরই জামায়াত সমর্থক ফ্রিডম পার্টির দৈনিক মিল্লাত লিখেছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলন করার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা

সংস্থা নাকি জাহানারা ইমাম, কর্ণেল (অবঃ) কাজী নূর উজ্জামান এবং আমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করেছে। জামায়াতের আক্রমণের অন্যতম অভিব্যক্তি হচ্ছে প্রতিপক্ষের চরিত্রহনন। জাহানারা ইমাম গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের কথা বলেছিলেন। সরকার বলেছিল তারা গণআদালত করতে দেবে না। এরপর গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের প্রতীকী বিচারে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে বিব্রত হয়ে বিএনপি সরকার জামায়াতি মিত্রদের সন্তুষ্ট করার জন্য শহীদজননী জাহানারা ইমাম সহ গণআদালতের ২৪ জন উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করেছিল। এই মামলায় জামিনে থাকাকালে নির্মূল কমিটি করার জন্য আমাকে সরকারি মালিকানাধীন সাপ্তাহিক বিচিত্রার নির্বাহী সম্পাদকের পদ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হয়। শুধু তাই নয়, অন্য কোনও পত্রিকায় আমি যাতে কাজ করতে না পারি তার জন্য কয়েকজন পত্রিকা মালিককে তখন সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। ৯৪-এর জুনে শহীদজননী জাহানারা মৃত্যুবরণ করেছেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ মাথায় নিয়ে।

গণআদালতের পর থেকেই সারা দেশে নির্মূল কমিটি এবং জাতীয় সমন্বয় কমিটির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের উপর সরকারের হামলা, গ্রেফতার, নির্যাতন ও হত্যা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছিল। ১৯৯৩ সালের ২৮ মার্চ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেট-এ জাতীয় সমন্বয় কমিটির পূর্বঘোষিত সমাবেশস্থল পুলিশ ঘিরে ফেলেই ক্ষান্ত হয়নি, শহীদজননী জাহানারা ইমামকে পিটিয়ে অজ্ঞান করে ফেলেছিল। সেদিন আমাদের উপর পুলিশের হামলায় সংসদ সদস্য আবদুর রাজ্জাক সহ বহু নেতাকর্মী আহত হয়েছিলেন। এরপর মে মাসে একই স্থানে নির্মূল কমিটির সমাবেশে জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা বোমা নিক্ষেপ করেছিল। কর্ণেল জামান অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছিলেন।

বাইরে থেকে হামলার পাশাপাশি ভেতর থেকে অন্তর্ঘাতের অপচেষ্টাও কম হয়নি। ১৯৯৫ সালের মে মাসে ধরা পড়ল— নির্মূল কমিটির কেন্দ্রে কয়েকজন ফ্রিডম পার্টির লোক ঢুকে পড়েছে। একজন কর্মীর অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়ে এটি ধরা পড়েছিল। নির্মূল কমিটির মিছিলে আমাদের একজন নিবেদিত কর্মী হিমাংশু 'জয় বাংলা' শ্লোগান দেয়ায় কেন্দ্রের সাদেক-হাশেম চক্র তাকে তোপখানা রোডের অফিসে এনে পিটিয়েছিল। এ নিয়ে কেন্দ্র ও মহানগরে তুমুল উত্তেজনা ও ক্ষোভ লক্ষ্য করে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরা নির্মূল কমিটির তৎকালীন আহ্বায়ক মুশতারী শফীকে অনুরোধ করি। জাহানারা ইমামের মৃত্যুর পর চট্টগ্রামের শহীদজায়া মুশতারী শফীকে নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচন করা হয়েছিল। আমি ছিলাম নির্বাহী আহ্বায়ক।

মুশতারী শফী প্রথমে সাদেক-হাশেমদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হলেও পরে তার আত্মীয় এনএসআই-এর এক কর্মকর্তার পরামর্শে সরাসরি সাদেকদের পক্ষ অবলম্বন করেন, যার ফলে এবং সংগঠনের ভেতর এক বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি হয়। এই সংকট মোকাবেলার জন্য অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান ও কথাশিল্পী শওকত ওসমানের নেতৃত্বে গঠিত নির্মূল কমিটির উপদেষ্টা পরিষদ এগিয়ে আসে। এই উপদেষ্টাদের সবাই ছিলেন গণআদালতের

বিচারক এবং গণতদন্ত কমিশনের সদস্য। ১৯৯৫-এর ১৭ আগস্ট কেন্দ্র ও উপদেষ্টা পরিষদ সংবাদ সম্মেলন করে সাদেক-হাশেম-রাসা সহ কেন্দ্রের ১১ জনকে বহিষ্কার এবং মুশতারী শফীকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই বহিষ্কৃতরা পরে বিএনপি, জাগপা ও জামায়াতবান্ধব বিভিন্ন সংগঠনে আশ্রয় নিয়েছে।

যে কোন প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলন যদি সরকার বা প্রতিক্রিয়াশীলদের উদ্বেগের কারণ হয় তার উপর আঘাত বিভিন্ন দিক থেকে আসবে এটাই স্বাভাবিক। নেতৃত্ব যদি নীতি ও আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকে এবং বিচক্ষণ, সাহসী ও দূরদর্শী হয়— এ ধরনের আঘাত তারা মোকাবেলা করে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। নেতৃত্ব যদি দুর্বল, আপোষকামী ও নৈতিকতাবর্জিত হয় সে আন্দোলন ষড়যন্ত্র ও সমঝোতার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়। নির্মূল কমিটির ২১ বছরের আন্দোলনে আমরা এ ধরনের বহু সংগঠনের জন্ম ও মৃত্যু দেখেছি।

নির্মূল কমিটির উপর সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছিল ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর। বিএনপির সঙ্গে জোট বেঁধে জামায়াত ক্ষমতার শরিক হয়ে হিংস্র হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নির্মূল কমিটির উপর। তারা আমাকে ও মুনতাসীর মামুনকে গ্রেফতার করার পাশপাশি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতা ও কর্মীদের হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছিল। আমাদের বহু কর্মী মিথ্যা হামলার হুলিয়া মাথায় নিয়ে এলাকাছাড়া ও দেশছাড়া হয়েছেন। অনেকে সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসেছেন, অনেকে শারীরিক নির্যাতনে চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেছেন। আমাদের বহু কার্যালয় ও পাঠাগার ভষ্মিভূত করা হয়েছে, কিন্তু আন্দোলন থেমে থাকেনি। ২০০১-২০০২ সালে আমাদের গ্রেফতার ও নির্যাতনের প্রতিবাদে দেশে ও বিদেশে বহু সংগঠন ও বরেণ্য ব্যক্তি বিবৃতি দিয়েছেন, প্রতিবাদের মিছিলে রাস্তায় নেমে এসেছেন, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের অমানবিক ফ্যাসিসুলভ আচরণের নিন্দা করেছেন এবং এভাবে আন্দোলনের দাবি বিশ্ব পরিসরে বিস্তৃত হয়েছে।

জামায়াতের ঘাতকরা এ পর্যন্ত আমাকে তিনবার হত্যা করার উদ্দেশ্যে হামলা করেছে। ২০০০ সালের আগস্টে তারা রাতের বেলা সোনারগাঁও হোটেলের পাশের রাস্তা থেকে অপহরণ করতে গিয়ে বাধা পেয়ে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে গিয়েছিল। ২০০২ সালে কারাগার থেকে জামিনে মুক্তির পর চট্টগ্রামের তরুণ সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা আমাকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর প্রতিবাদে চট্টগ্রামে জামায়াত আমাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। জামায়াতের হুমকি উপেক্ষা করে সাংবাদিক আবেদ খানের সঙ্গে ৫ ফেব্রুয়ারি আমি চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম। আমাদের গাড়ি বহরে জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা বৃষ্টির মতো বোমা নিক্ষেপ করেছে। তাদের হামলায় একজন রিকশাচালক নিহত এবং অন্ততপক্ষে ১৫ জন পথচারী আহত হয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের সমাবেশ তারা বন্ধ করতে পারেনি।

২০০৪-এর নবেম্বরে উত্তরবঙ্গে ধর্ষিতা রাধারানী সহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতার শিকার কয়েকটি পরিবারকে আর্থিক ও আইনি সহযোগিতার জন্য আমরা যখন সৈয়দপুরে গিয়েছি মহাসড়কে আমাদের চলন্ত মাইক্রোবাসের উপর ট্রাক তুলে দেয়া

হয়। গাড়িতে আমার সঙ্গে ছিলেন নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল, কেন্দ্রের অন্যতম সমন্বয়কারী আবদুল হাকিম পিয়াল, মহানগরের বিপ্লব, অপু ও মিজু। আমাদের মাইক্রোবাসটি চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছিল। গুরুতর আহত ও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমাদের স্থানীয় একটি ক্লিনিকে নেয়া হয়। ক্লিনিকের ডাক্তাররা আঘাতের ভয়াবহতা দেখে প্রথমে সৈয়দপুরের সামরিক হাসপাতালে যোগাযোগ করেন। আমার নাম শুনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের চিকিৎসা করতে অপারগতার কথা জানিয়ে দেন। এরপর তারা রংপুরের সামারিক হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রংপুরের সিএমএইচ কর্তৃপক্ষ প্রথমে অপেক্ষা করতে বলেন। দু ঘণ্টা পর তারা তাদের অপারগতার কথা জানান। সৈয়দপুরের ক্লিনিকের ইমার্জেন্সি রুমের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা সহযোদ্ধা পিয়ালকে দেখেছি বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে। পিয়ালের মৃত্যুর পর সৈয়দপুর ক্লিনিকের ডাক্তাররা আমাদের দুটি এ্যাম্বুলেন্সে করে রংপুরের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

হাসপাতাল থেকে টেলিফোনে আমি ঢাকায় স্থানীয় সাংসদ আসাদুজ্জামান নূরকে বলেছিলাম আমাদের জন্য হেলিকপ্টার পাঠাতে। ডিজিএফআই-এর আপত্তির কারণে নূর ভাই সেদিন সরকারি হেলিকপ্টার পাঠাতে পারেননি। পরদিন বেসরকারি হেলিকপ্টারে আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় ঢাকা আনা হয়। আমার ডান পায়ের হাঁটুর উপরের বড় হাড় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। অবস্থা এত গুরুতর ছিল যে বাইরে নিয়ে অপারেশনের সময় ছিল না। মহানগরের তরুণ কর্মীরা দীর্ঘ চিকিৎসার পর সুস্থ হলেও মুকুল ও আমাকে শারীরিক পঙ্গুত্ব মেনে নিতে হয়েছে। তখন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল কীভাবে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার নির্দেশে সিএমএইচ আমাদের চিকিৎসা প্রদানে অপারগতা জানাতে বাধ্য হয়েছিল এবং সময়মতো হেলিকপ্টার পাঠাতে দেয়নি।

গত ২১ বছরে নির্মূল কমিটির নেতা-কর্মীদের উপর এরকম বহু হামলার ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ গত ১১ এপ্রিল (২০১৩) খুলনায় নির্মূল কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট চিকিৎসক ও শিল্পপতি ডাঃ বাহারুল আলমের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ফার্মাসিউটিক্যালে জামায়াত শিবিরের সন্ত্রাসীরা নৈশপ্রহরীদের বেঁধে রেখে গোটা কারখানা গান পাউডার ছড়িয়ে আগুন দিয়ে ভস্মিভূত করেছে। বিভিন্ন দৈনিকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এর ফলে ১০ কোটি টাকার জীবন রক্ষাকারী ঔষধ, কাঁচামাল ও সম্পদ ধ্বংস হয়েছে।

প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করবার জন্য জামায়াত কী করতে পারে তার নমুনা আমরা ’৭১-এ দেখেছি এবং এখনও দেখছি। এখন তো শুধু নির্মূল কমিটি, গণজাগরণ মঞ্চ, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল বা সরকার নয়— গোটা বাংলাদেশকে জামায়াত প্রতিপক্ষ বিবেচনা করছে। নইলে হরতালের নামে নিরীহ মানুষ হত্যা, সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর ধারাবাহিক হামলা ও হত্যা, নির্বিচারে পুলিশ হত্যা, বিদ্যুৎকেন্দ্র ভস্মিভূত করা, রেলের লাইন উপড়ে ফেলে যাত্রীদের উপর হামলা, রেলগাড়ির বগিতে আগুন দেয়া, বাসচালক, ট্রাকচালক, গাড়ির যাত্রীদের হত্যা বা আহত করা— এসব কখনও সরকারবিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচী হতে পারে না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের পাশাপাশি ’৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য জামায়াত মরিয়া হয়ে

উঠেছে। যে হেফাজতে ইসলাম এক সময়ে কট্টর জামায়াতবিরোধী ছিল তাদেরও জামায়াত কিনে ফেলেছে। জামায়াতের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেফাজতিরা এখন একই ভাষায় আমাদের প্রতি বিষোদগার করছে, হত্যার হুমকি দিচ্ছে।

জামায়াত এবং তাদের মৌলবাদী সহযোগীরা কখনও তাদের প্রতিপক্ষ চিনতে ভুল করেনি। যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই তারা আঘাত করেছে। ভুল করি আমরা, যখন মৌলবাদী শিবিরে মিত্র খুঁজি, যখন ভাবি শয়তান আবার ফেরেশতা হবে। আমাদের এই ভুলের জন্য গত ৪২ বছরে কম মাশুল দিইনি।

জামায়াত জানে না, যতবার আমাদের উপর হামলা হয়েছে, জামায়াতের প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা ও ক্ষোভ তত বেড়েছে। মানুষের এই ক্ষোভ ও ঘৃণার আগুনেই একদিন জামায়াত পুড়ে ছাই হয়ে বাংলাদেশের মাটিতে মিশে যাবে। আমার মনে আছে, ২০০৪ সালে উত্তরবঙ্গে আমাদের উপর জামায়াতের হামলার পর রংপুরের হাসপাতালে মধ্যরাতে কিছুক্ষণের জন্য আমার জ্ঞান ফিরেছিল। তাকিয়ে দেখি কয়েকজন মুসল্লি মেঝেতে জায়নামাজ বিছিয়ে নফল নামাজ পড়ছেন। আমাকে তাকাতে দেখে বয়োজ্যেষ্ঠ একজন এগিয়ে এসে দোয়া পড়ে মাথায় ফুঁ দিলেন। বললেন, 'আপনার বাঁচবার কথা ছিল না। আল্লাহ্ আপনাকে দিয়ে বড় কোনও কাজ করাবেন, সেজন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন।'

১৮ এপ্রিল ২০১৩

হেফাজতের ১৩ দফার শানে নজুল

চট্টগ্রামের হাটহাজারী মাদ্রাসার 'হেফাজতে ইসলাম' জন্মগতভাবে একটি দু'নম্বরি সংগঠন। হাটহাজারীর দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম-এর মহাপরিচালক আল্লামা শাহ্ আহমদ শফী সাহেব এবং তার সহযোগীরা ২০১০-এর ১৯ মার্চ 'হেফাজতে ইসলাম' গঠন করেছেন। এর প্রায় ৬০ বছর আগে সিলেটের মৌলভিবাজারের বরুণার পীর শেখ লুৎফর রহমান সাহেব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আদি ও আসল 'হেফাজতে ইসলাম', যার শাখা পাকিস্তানেও আছে। বর্তমানে মূল 'হেফাজতে ইসলাম'-এর প্রধান হচ্ছেন বরুণার গদ্দিনশিন পীর খলিলুর রহমান সাহেব, যাদের সঙ্গে হাটহাজারী, জামায়াত বা জঙ্গীবাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

একজনের গড়া একটি প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও সাফল্য কেউ যদি আত্মসাৎ করতে চায় ইসলামী বিধান অনুযায়ী তার শাস্তি কী হবে আল্লামা শফী ও তার সহযোগীরা ভাল বলতে পারবেন, তবে আদি হেফাজতে ইসলাম'-এর খলিলুর রহমান সাহেব ইচ্ছে করলে জালিয়াতির অভিযোগে হাটহাজারীওয়ালাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি দুই ধরনের মামলাই করতে পারেন।

হাটহাজারীর হেফাজতীদের কাণ্ডকারখানা দেখে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের কয়েকজন স্বনামধন্য আলেম বলেছেন 'হেফাজতে ইসলাম' নামে কোনও সংগঠন প্রতিষ্ঠা খোদার উপর খোদকারির শামিল, কারণ কোরাণ ও ইসলামের প্রকৃত হেফাজতকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্। পবিত্র কোরাণে আল্লাহ্ বলেছেন, 'আমিই কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং অবশ্য আমিই উহার সংরক্ষক।' (সুরা ঃ হিজ্‌র, আয়াত ঃ ৯) বান্দা চাইলে 'হেফাজতে ঈমান' বা 'হেফাজতে মুসলিম' নামে সংগঠন করতে পারে, 'হেফাজতে ইসলাম' কদাচ নয়।

'হেফাজতে ইসলাম' নামটি ইসলামসম্মত কী না এ নিয়ে আলেমরা বাহাস করুন, আমি আমার সামান্য ইসলামী এলেম নিয়ে এ বিতর্কে জড়াতে চাই না। আমি বলতে চাই হাটহাজারীর হেফাজতওয়ালারা যে ১৩ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে সরকার পতনের ডাক দিয়েছেন সেগুলোও দু'নম্বরি।

হাটহাজারীর হেফাজতে ইসলামের আমীর আল্লামা আহ্মদ শফী একজন জামায়াতবিরোধী আলেম হিসেবে পরিচিত। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবুল আলা মওদুদির কঠোর সমালোচনা করে তিনি 'ইজহারে হাকীকত বা বাস্তব দৃষ্টিতে মওদুদী মতবাদ' নামে একটি পুস্তিকাও লিখেছেন।

মওদুদি সম্পর্কে আহমদ শফীর মন্তব্য হচ্ছে, '...তিনি নিজ ইচ্ছামত পবিত্র কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন এবং সর্বাদিসম্মত গ্রহণযোগ্য হাদিস, যা শ্রেষ্ঠতম ইমামে হাদিস হযরত ইমাম বুখারী রহ. এবং ইমাম মুসলিম রহ. এর নিকটও

গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, তিনি সেগুলিকেও প্রত্যাখ্যান করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ জন্য সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের ওলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, মওদুদি সাহেব নিজেও বিপথগামী এবং অন্যকেও বিপথগামী করার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন।......

'মাওলানা মওদুদি একজন ভ্রান্ত মতবাদী ও বিপথগামী লোক, তাঁর নীতি আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নীতি বিরুদ্ধ। তার বিভিন্ন লিখনীতে সল্‌ফে সালেহীন, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও হযরাতে আম্বিয়ায়ে কিরামের শানে বেয়াদবীসমূহ করা হয়েছে। অতএব তাদের সঙ্গে মেলামেশা ও সংশ্রব রাখা উচিত হবে না। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ. ইরশাদ করেন, "কোন ভ্রান্ত মতবাদী ব্যক্তির সংস্পর্শ কাফেরের সংস্পর্শের চেয়েও জঘন্য ক্ষতিকর।" তাদের পিছনে নামাজ পড়াও উচিত নয়। ফাছেক ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়া মাকরূহে তাহ্‌রীমা। যেমন ফিক্বাহ্‌ শাস্ত্রের কিতাবসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। যেহেতু সোহবত বা সংস্পর্শেরও একটা পৃথক প্রতিক্রিয়া রয়েছে, কাজেই তাদের সোহবত আশঙ্কামুক্ত নয়। তাদের লিখা বই পুস্তক পড়া সর্বসাধারণ বরং অনভিজ্ঞ আলেমের জন্যও উচিত নয়। কারণ নিশ্চয়ই ক্ষতির আশঙ্কা বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত জামায়াতের সদস্যভুক্ত হওয়াও অনুচিত।'[১]

জামায়াতে ইসলামী এবং জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদি সম্পর্কে হেফাজতে ইসলামপ্রধান আহমদ শফীর এই মূল্যায়নের সঙ্গে উপমহাদেশের অন্যান্য আলেম ওলামাদের মূল্যায়নের কোনও পার্থক্য নেই। এই পুস্তিকায় তিনি আরও বলেছেন, **'রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা অর্থনেতিক কোন সমস্যার খাতিরে সাময়িকভাবে হলেও কোন হানাফী, সুন্নী ব্যক্তির জন্য জামায়াতের সাথে মিলে কাজ করা বা তার সহযোগিতা জায়েয নয়'**। এ ধরনের আরও অনেক কথা বলে আহমদ শফী তাঁর পুস্তিকার 'আল জওয়াব' অধ্যায়ে লিখেছেন, **'রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের (জামায়াতের) সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা যদি তা ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কামুক্ত হয় তবে জায়েয হতে পারে'**।[২]

এর শানে নজুল হচ্ছে 'জামায়াতে ইসলামী'র সদস্যভুক্ত কোন ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়া 'নাজায়েয' এবং তারা কাফেরের চেয়েও জঘন্য ক্ষতিকর হলেও 'রাজনৈতিক কারণে জামায়াতের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা' সম্পূর্ণ জায়েজ। জামায়াত সম্পর্কে হেফাজতপ্রধান আহমদ শফীর এই মূল্যায়নই সম্প্রতি সরকারপতনের আন্দোলনে হেফাজত-জামায়াত এবং তাদের প্রধান সহযোগী বিএনপিকে এক মঞ্চে একত্রিত করেছে। এভাবেই একটি 'অরাজনৈতিক' ও 'জামায়াতবিরোধী' সংগঠন জামায়াতের রাজনীতিকে প্রথমে জায়েজ করেছে এবং পরে শিরোধার্য হিসেবে গ্রহণ করেছে।

---

১. হযরতুল আল্লামা মাওলানা শাহ্‌ আহ্‌মদ শফী সাহেব (দাঃ বাঃ), 'ইজহারে হাকীকত ও বাস্তব দৃষ্টিতে মওদুদী মতবাদ', মাদানী দারুল মুতালায়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম (প্রকাশকাল উল্লেখ করা হয়নি)

২. প্রাগুক্ত, পৃ:- ২১

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও চরম শাস্তিপ্রদান এবং জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে ঢাকার শাহবাগ চত্বরে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর গণজাগরণ মঞ্চের নেতাদের নাস্তিক মুরতাদ কাফের বলে হত্যা আরম্ভ করেছে জামায়াত। যদিও এই মঞ্চের নেতারা বহুবার বলেছেন তাদের আন্দোলন ইসলাম বা কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। মঞ্চের মুখপাত্র ডাঃ ইমরান এইচ সরকার এ কথাও বলেছেন যে, তিনি একজন ধর্মানুরাগী মুসলমান, নামাজ রোজা সবই করেন। এত সব বলেও জামায়াতকে নিরস্ত করা যায়নি, কারণ নাৎসিপ্রেমী ও হিটলার-অনুরাগী জামায়াত বিশ্বাস করে গোয়েবল্‌সীয় তত্ত্বে — কোনও মিথ্যা শতবার বললে মানুষ তা সত্য বলে মেনে নেয়। জামায়াতের গুরু মওদুদিও বলেছেন, 'সময় সময় মিথ্যা বলা শুধু জায়েজই নয় বরং অবশ্য কর্তব্য'। (তরজুমানুল কোরাণ, মে ১৯৫৮) অথচ হাদিসে আছে ইসলাম ধর্মে সবচেয়ে নিকৃষ্ট তিনটি গুনাহর অন্যতম হচ্ছে 'মিথ্যা কথা বলা'। (সহীহ মুসলিম শরীফ দ্রষ্টব্য)

শাহবাগের মহাজাগরণে ভীত হয়ে জামায়াত উদ্যোগ নিয়েছে— বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসায় জামায়াতবিরোধী যত আলেম ওলামা আছেন তাদের যেভাবেই হোক পক্ষে আনতে হবে। হেফাজতের লং মার্চের সময় এই সংগঠনের নেতাদের বিপুল অঙ্কের অর্থপ্রদানের বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে উল্লেখ করা হয়েছে। এককালের জামায়াতবিরোধী এবং হালে জামায়াতপ্রেমে গদগদ হয়ে হাটহাজারীর হেফাজতিরা জামায়াতের মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম'-এ আল্লামা শফীর নামে বিশাল চিঠি ছেপেছেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে জামায়াতের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এ চিঠি ছাপা হয়েছে। সাংবাদিকতার রীতির পরিপন্থী হলেও বিষয়বস্তুর সঙ্গে দলের আদর্শের মিল থাকার কারণেই এককালের জামায়াতবিরোধীদের এই চিঠি 'সংগ্রাম' কর্তৃপক্ষ লুফে নিয়েছে। চিঠির শিরোনাম হচ্ছে 'ইসলাম বিদ্বেষের প্রতিবাদে গর্জে উঠুন।' এতে গণজাগরণ মঞ্চের তরুণ নেতাদের সঙ্গে আমাকে ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে 'নাস্তিক', 'মুরতাদ', 'মুশরিক' ও 'ইসলামবিদ্বেষী' আখ্যা দিয়ে আমাদের হত্যার জন্য দলের জঙ্গীদের প্ররোচিত করা হয়েছে, যার প্রাথমিক মহড়া আমরা দেখেছি ৬ এপ্রিল মহাখালীতে হেফাজতের মিছিল থেকে আমাদের সমাবেশে কাপুরুষোচিত হামলায়। এতকাল জামায়াত আমাদের 'নাস্তিক', 'মুরতাদ' বলেছে। এখন জামায়াতের সঙ্গে পোঁ ধরে হেফাজতও জামায়াতি জবানে আমাদের প্রতি বিষোদ্গার করছে।

হেফাজত দাবি করে— তারা কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয়, তাদের সংগঠনের কোনও রাজনৈতিক অভিলাষ নেই। ভাল কথা, মৌলবিবাজারের আদি হেফাজতের নেতারা শুরু থেকেই নিজেদের রাজনীতি থেকে বহু দূরে রেখে ইসলামের প্রচার প্রসারে নিয়োজিত রয়েছেন। রাজনৈতিক দল না হলেও হাটহাজারীর নেতারা যে ভাষায় কথা বলেন, যে ভাষায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হুমকি দেন তার সঙ্গে জামায়াতিদের এতটুকু অমিল নেই। ৬ এপ্রিলের লংমার্চে জামায়াতের আনুষ্ঠানিক সমর্থনকে তারা মোবারকবাদ জানিয়েছেন। ৬ এপ্রিলের মহাসমাবেশ থেকে হেফাজতের নেতারা যে ১৩ দফা দাবি ঘোষণা করেছেন তার অধিকাংশ জামায়াতের একান্ত নিজস্ব দাবি,

জামায়াতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র বিএনপিও যার সঙ্গে একমত নয়। হাটহাজারীর হেফাজতের ১৩ দফা দাবিতে বলা হয়েছে—

১. সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস পুনঃস্থাপন করতে হবে।

২. আল্লাহ, রাসুল (সা.) ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাস করতে হবে।

৩. শাহবাগ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নাস্তিক-মুরতাদ এবং প্রিয় নবী (সা.)-এর শানে কুৎসা রটনাকারী ব্লগার ও ইসলামবিদ্বেষীদের সব অপপ্রচার বন্ধ করে তাদের গ্রেফতারপূর্বক কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. রাসুলপ্রেমিক প্রতিবাদী আলেম-ওলামা, মাদরাসার ছাত্র এবং তৌহিদি জনতার ওপর হামলা, দমন-পীড়ন, নির্বিচার গুলিবর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে।

৫. অবিলম্বে গ্রেফতার করা সব আলেম-ওলামা, মাদরাসা ছাত্র ও তৌহিদি জনতাকে মুক্তিদান, দায়ের করা সব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং দুষ্কৃতকারীদের বিচারের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

৬. জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশের সব মসজিদে মুসল্লিদের নির্বিঘ্নে নামাজ আদায়ে বাধাবিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং ওয়াজ-নসিহত ও ধর্মীয় কার্যকলাপে বাধাদান বন্ধ করতে হবে।

৭. কাদিয়ানিদের সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা এবং তাদের প্রচারণা ও ষড়যন্ত্রমূলক সব অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

৮. ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতার নামে সব বেহায়াপনা, অনাচার, ব্যভিচার, প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, মোমবাতি প্রজ্বলনসহ সব বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

৯. মসজিদের নগরী ঢাকাকে মূর্তির নগরীতে রূপান্তর এবং দেশব্যাপী রাস্তার মোড়ে ও কলেজ-ভার্সিটিতে ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন বন্ধ করতে হবে।

১০. ইসলামবিরোধী নারীনীতি, ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাতিল করে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ইসলামি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

১১. সারাদেশের কওমি মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, ওলামা-মাশায়েখ এবং মসজিদের ইমাম-খতিবকে হুমকি-ধমকি ও ভয়ভীতি দানসহ তাদের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে হবে।

১২. রেডিও-টেলিভিশনসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় দাড়ি, টুপি ও ইসলামি কৃষ্টি-কালচার নিয়ে হাসি-ঠাট্টা এবং নাটক-সিনেমায় খল ও নেতিবাচক চরিত্রে ধর্মীয় লেবাস পোশাক পরিয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মনে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব সৃষ্টির অপপ্রয়াস বন্ধ করতে হবে।

১৩. পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশব্যাপী ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডে এনজিও, কাদিয়ানিদের অপতৎপরতা এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণসহ সব অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

জামায়াতের নায়েবে আমীর দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিভিন্ন ওয়াজ শোনার অভিজ্ঞতা যাদের আছে, তাদের এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপরোক্ত ১৩ দফার মূল দাবিগুলো জামায়াতের দলীয় দাবি, যা বিশেষ মতলবে বিশেষ সময়ে থলের ভেতর থেকে বের করা হয়, অন্য সময়ে থলের ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়। এখন হেফাজত বলছে ১৩ দফা দাবি না মানা হলে তারা সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন করবে। বিএনপি জামায়াতও এই এক দফার কথা বলছে।

১৩ দফার প্রধান দাবি হচ্ছে আল্লাহ, রাসুল (সাঃ) ও ইসলাম ধর্মের অবমাননার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে আইন অর্থাৎ 'ব্লাশফেমি আইন' পাশ করতে হবে। জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান আমীর মতিউর রহমান নিজামী ১৯৯৩ সালে জাতীয় সংসদে এই একই দাবি জানিয়ে একটি বিল জমা দিয়েছিলেন, যা তৎকালীন বিএনপি সরকার গ্রহণ করেনি। এর কয়েক মাস আগে ১৯৯২-এর নবেম্বরে জামায়াতে ইসলামী কাদিয়ানিদের কাফের ঘোষণার দাবি জানিয়ে, বিভিন্ন স্থানে নিরীহ আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মসজিদ, পাঠাগার, দফতর ধ্বংস করেছিল।

জামায়াত যখন কোণঠাসা হয় তখনই তারা 'কাদিয়ানিদের কাফের ঘোষণা' কিংবা 'ব্লাশফেমি আইন পাশ' করার জন্য হইচই করে। কিন্তু এই জামায়াত যখন ক্ষমতায় থাকে তখন এসব বিষয়ে টু শব্দটিও করে না। যে নিজামী ১৯৯৩ সালে জাতীয় সংসদে 'ব্লাশফেমি আইন' প্রণয়নের দাবি জানিয়েছিলেন ২০০১-এর পর খালেদা জিয়ার কৃপায় মন্ত্রী হয়ে এ বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন। একইভাবে জামায়াত আহমদীয়াদের উপর হামলা, হত্যা, নির্যাতন অব্যাহত রাখলেও ক্ষমতায় থাকাকালে তাদের কাফের ঘোষণার উদ্যোগ নেয়নি। কারণ জামায়াত জানে বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশে বা বিদেশে এসব দাবি কাউকে গেলানো যাবে না; বাড়াবাড়ি করলে আম ও ছালা দুই-ই যাবে।

হেফাজতের ১৩ দফার প্রথম দাবি হচ্ছে— জিয়াউর রহমান ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস...'-এর যে কথা সংযোজন করেছিলেন, যা উচ্চতর আদালত অবৈধ ঘোষণ করে বাতিল করে দিয়েছে সেগুলো আবার সংযোজন করতে হবে।

বাংলাদেশ অথবা পৃথিবীর অন্য সব দেশের সোয়াশ কোটি মুসলমান সব সময় মহান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন। তাদের নতুন করে এই বিশ্বাস স্থাপনের জন্য জবরদস্তি করা ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়; যে বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে কোরাণ, হাদিস এবং মহানবীর (সাঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। জামায়াত ও জিয়াপ্রেমে দিওয়ানা হাটহাজারীর হুজুরদের কাছে কোরাণ, হাদিস এবং আল্লাহ্ ও রাসুলের (সাঃ) সতর্কবাণীর কি কোনই মূল্য নেই?

যে কোনও সভ্য দেশের সংবিধানে ধর্ম-ভাষা-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার থাকে। বাংলাদেশে এখনও প্রায় দুই কোটি হিন্দু, বৌদ্ধ,

খৃষ্টান, আদিবাসী ও নৃগোষ্ঠী রয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, এমন কি ইসলাম ধর্ম অনুযায়ীও অন্য ধর্মের মানুষকে ইসলামে বিশ্বাস স্থাপনে কেউ জবরদস্তি করতে পারে না। হাটহাজারীর হেফাজতকারীরা কি ভুলে গেছেন পবিত্র কোরাণ আল্লাহ্ তাঁর রাসুল (সাঃ)-কে বলেছেন, 'তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করিলে পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনিত। তবে কি তুমি মুমিন হইবার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করিবে?' (সুরা ঃ ইউনুস, আয়াত ঃ ৯৯)

পবিত্র কোরাণে আল্লাহ্ আরও বলেছেন, 'যাহারা দীন (ইসলাম) সম্পর্কে নানা মতের সৃষ্টি করিয়াছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছে তাহাদের কোন দায়িত্ব তোমার নয়; তাহাদের বিষয় আল্লাহ্র এখতিয়ারভুক্ত।' (সুরা ঃ আন'আম, আয়াত ঃ ১৫৯)

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইহুদীরা একাত্তর অথবা বাহাত্তর ফেরকায় (দলে) বিভক্ত হয়েছিল এবং খৃস্টানরাও অনুরূপ সংখ্যক ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর ফেরকায়' (জামে আত-তিরমিযী, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৪)।

কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয় এ নিয়ে ফতোয়া দেয়ার অধিকার আল্লাহ কোনও সরকার বা মাদ্রাসাকে দেননি। ১৯৫৩ সালে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদি 'কাদিয়ানি সমস্যা' নামে একটা বই লিখে পাকিস্তানের লাহোরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়েছিলেন। মওদুদিই প্রথম দাবি করেছিলেন আহমদীয়াদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। এই দাঙ্গায় আহমদীয়া মুসলিম জামায়াতের কয়েকশ মানুষকে হত্যা করা হয়। সামরিক আদালতে বিচারে মওদুদিকে তখন এর জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিচারপতি মুনীরের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল, যা মুনীর কমিশন নামে খ্যাত। এই কমিশন মন্তব্য করেছে— কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয় এটা নির্ধারণের দায়িত্ব সরকার বা কোন সংগঠন যদি নেয় তাহলে সমাজে সমূহ বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

পবিত্র কোরাণে আল্লাহ্ রাসুলের (সাঃ) সমালোচনা বা ব্লাশফেমির জন্য জাগতিক শাস্তির বিধান নেই, আছে আল্লাহপ্রদত্ত কঠিন শাস্তি, যা কেয়ামতের পর ভোগ করতে হবে। ব্লাশফেমির জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান এসেছে ইহুদি ও খৃষ্টান ধর্ম থেকে, যার প্রয়োগ এখন পশ্চিমের কোথাও নেই। পাকিস্তানে ব্লাশফেমি আইনের বিরুদ্ধে শুধু নাগরিক সমাজ নয়, সেখানকার রাজনৈতিক নেতা— এমনকি মন্ত্রীরাও সোচ্চার। পাকিস্তানে ব্লাশফেমি আইনের প্রতিবাদ করার জন্য মৌলবাদীরা ২০১১ সালে পাঞ্জাবের গভর্ণর সালমান তাসির ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শাহবাজ ভাট্টিকে হত্যা করেছে।

নারীনীতির বিরুদ্ধে জামায়াত ও সহযোগী মৌলবাদীদের জেহাদ নতুন কোন বিষয় নয়। ইসলামের দোহাই দিয়ে নারীকে তারা পুরুষের অধীন এবং পর্দার অন্তরালে আটকে রাখতে চায়। একই সঙ্গে বঞ্চিত করতে চায় পৈত্রিক সম্পত্তির সমান অধিকার থেকে। হেফাজতের মৌলবাদীরা এবার নারীনীতি বাতিলের পাশাপাশি 'প্রকাশ্যে নারীপুরুষের অবাধ বিচরণ' নিষিদ্ধকরণের দাবি জানিয়েছে, যা বাস্তবায়ন করতে হলে

গার্মেন্টস সহ দেশের অধিকাংশ শিল্প কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এমন কি জাতীয় সংসদের কার্যক্রম সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বন্ধ করে দিতে হবে। কোন বিচরণ অবাধ, কোনটি অবাধ নয় এ ফতোয়া কে দেবে? নারীদের প্রতি হেফাজতিদের বর্বরোচিত আচরণ মূর্ত হয়েছে তাদের ৬ এপ্রিলের মহাসমাবেশে কর্তব্যরত নারী সাংবাদিকের উপর কাপুরুষোচিত হামলার ঘটনায়। নারীদের প্রতি শত শত অসভ্য মন্তব্য পাওয়া যাবে হেফাজতিদের আদর্শ নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর, বিভিন্ন ওয়াজের ক্যাসেটে।* জামায়াত ও হেফাজতের দাবি মানতে হলে বাংলাদেশকে জাহেলিয়াতের যুগে ফিরে যেতে হবে।

জামায়াতের সহযোগী মৌলবাদীরা বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একবার ঢাকার ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। ২০০৮-এর অক্টোবরের বিমানবন্দরের সামনে স্থাপিত লালন ভাস্কর্য ভাঙা সম্পর্কে 'আমিনীদের জেহাদী আস্ফালন ঃ নিরব প্রশাসন' শিরোনামে জনকণ্ঠে আমি লিখেছিলাম— 'মৌলবাদীদের হুমকির কারণে সরকার জিয়া বিমানবন্দরের সামনে নির্মীয়মান বাঙালির লোক সংস্কৃতির প্রতীক 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' ভাস্কর্যটি সরিয়ে ফেলেছে। সেই সময় আমি দেশের বাইরে ছিলাম। যেদিন এই ভাস্কর্যটি ভেঙে ফেলার খবর পত্রিকায় ছাপা হয় (১৬ অক্টোবর '০৮) সেদিন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রামাণ্যচিত্র 'ওয়ার ক্রাইমস সেভেন্টি ওয়ান' দেখতে এসে আলোচনা সভায় সৌদি আরবের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইসলামিক প্লুরালিজমে'র পরিচালক ডঃ ইরফান আল আলাভী বলেছিলেন কীভাবে সৌদি রাজতন্ত্রের মদদে ওহাবি মতবাদের অনুসারী জঙ্গী মৌলবাদীরা বিশ্বব্যাপী ইসলামের উদারনৈতিক অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি ধ্বংস করছে। বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক মানবতার প্রতীক বাউলদের ভাস্কর্য স্থাপনকে যারা মূর্তিপূজার সঙ্গে তুলনা করছে তারা বিলক্ষণ জানে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার

---

* এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর ইন্টারনেটে প্রচারিত হয়েছে নারীদের সম্পর্কে হেফাজতপ্রধান আহমদ শফীর যৌনবিকৃতি ও অশ্লীলতায় ভরপুর ওয়াজ। এই ওয়াজে তিনি বলেছেন, 'ছোট একটা ছেলে তেঁতুল খাচ্ছে আপনি দেখছেন, আপনার মুখ দিয়া লালা বের হবে। সত্য না মিথ্যা বলেন তো? আরে বলেন না। তেঁতুল বৃক্ষের নিচ দিয়ে আপনি হেটে যান, আপনার মুখ থেকে লালা বের হয়। মার্কেটে যেখানে তেঁতুল বিক্রি করে ঐ দিকে যদি আপনি যান আপনার মুখ থেকে লালা বের হয়। সত্য না মিথ্যা বলেন তো সত্য না মিথ্যা? মহিলা তার থেকেও বেশি খারাপ। মহিলার দিকে দেখলে দিলের মধ্যে লালা বের হয়। বিবাহ করতে ইচ্ছা হয়। লাভ ম্যারেজ, কোর্ট ম্যারেজ করতে ইচ্ছা হয়। হয় কিনা বলেন? এই মহিলারা তেঁতুলের মতো। দিবারাত্র মহিলার সাথে লেখাপড়া করছেন, আপনার দিল ঠিক রাখতে পারবেন না। রাস্তাঘাটে হাটা ওঠা করছেন হ্যান্ডসেক করে করে আপনার দিল ঠিক থাকতে পারবে না। যতই বুজুর্গ হউক না কেন, এই মহিলাকে দেখলে মহিলার সাথে হ্যান্ডসেক করলে, আপনার দিলের মধ্যে কু খেয়াল এসে যাবে। খারাপ খেয়াল। এটা মনের জেনা, দিলের জেনা হতে হতে আসল জেনায় পরিণত হবে। এটা সত্য না মিথ্যা? আরে বলেন না ভাই। কেউ যদি বলে একজন বুড়া মানুষ, হুজুর, মহিলাকে দেখলে আমার দিল খারাপ হয় না, কু খেয়াল দিলের মধ্যে অসেনা, তা হলে আমি বলব ভাই, হে বুড়া তোমার ধ্বজভঙ্গ বিমার আছে। তোমার পুরুষত্ব নষ্ট হয়ে গেছে, সেজন্য মহিলাদেরকে দেখলে তোমার মনে কুভাব আসেনা।'

করেছেন লালনের মতো সুফী সাধকরা, মওদুদি, গোলাম আযম বা আমিনীদের মতো জঙ্গী ওহাবিরা নয়।

'বাংলাদেশের চেয়ে সংখ্যানুপাতে অধিক মুসলিম অধ্যুষিত এক ডজনেরও বেশি দেশে ভাস্কর্য রয়েছে। ইরাকের রাজধানীকে বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমান শ্রদ্ধাভরে 'বাগদাদ শরিফ' বলেন, সুফিসাধক হযরত আবদুল কাদের জিলানীর মাজার থাকার কারণে। মক্কা ও মদিনার পর সুন্নী মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র শহর বাগদাদ। এই শহরের কেন্দ্রে রয়েছে আরব্য উপন্যাসের নায়ক বাদশাহ শাহরিয়ারের গল্পবলিয়ে লাস্যময়ী বেগম শাহেরযাদের ভাস্কর্য, যার স্রষ্টা প্রখ্যাত আরব ভাস্কর মোহাম্মদ গণি হিকমত। বাগদাদের কাহরামানা স্কয়ারে রয়েছে আলীবাবা চল্লিশ চোরের সুন্দরী মর্জিনার ভাস্কর্য। ইরাকে সাদ্দাম হোসেনকে আমেরিকানরা যখন প্রহসনের বিচার করে হত্যা করেছিল তখন অনেকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাংলাদেশের মৌলবাদীরাও মাতম করেছিল। এই মোল্লারা জানে না সাদ্দাম ইরাকের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। সাদ্দামকে হত্যার পর আমেরিকার পুতুল সরকার ক্ষমতায় এসে ইরাকের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিয়ে এর মুসলমানি করেছে। সাদ্দামের জমানায় বাগদাদের বিভিন্ন সড়ক দ্বীপে অনেক ভাস্কর্য স্থাপিত হয়েছে। শহরের কেন্দ্রে আল ফেরদৌস স্কয়ারে সাদ্দাম স্থাপন করেছিলেন নিজের বিশাল ভাস্কর্য। সাদ্দামকে গ্রেফতারের পর এই ভাস্কর্যটি ভেঙে ফেলা হলেও একই জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে তরুণ ইরাকী ভাস্কর হাশিম হামাদের ২৩ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এক অনুপম ভাস্কর্য, যেখানে রয়েছে পিতা, মাতা ও সন্তান— যাদের হাতে বাঁকা চাঁদ, পাশে সূর্য। বাঁকা চাঁদ ইসলামের প্রতীক, সূর্য সুমেরিয় সভ্যতার প্রতীক। ধর্মীয় বিশ্বাসে মুসলিম হলেও ইরাকীদের অহঙ্কার প্রাচীন সুমেরিয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী তারা।

'মিশরের গ্র্যান্ড মুফতি ভাস্কর্য নির্মাণের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু রাজধানী কায়রোর কোন ভাস্কর্য ভাঙার জন্য কখনও ফতোয়া দেননি। কায়রোর রাজপথে বহু ভাস্কর্য রয়েছে। কায়রোর অদূরে ফেরাউনদের আমলের নৃসিংহ মূর্তি (স্ফিংস) ভাঙার কথাও সেখানকার মুফতি বা আলেমরা কখনও বলেননি। মুসলমানদের পবিত্র শহর জেরুযালেমেও বহু ভাস্কর্য রয়েছে। ভাস্কর্য রয়েছে মুসলমানদের তীর্থস্থান সৌদি আরবের জেদ্দা, রিয়াদ এবং মধ্য এশিয়ার পবিত্র শহর সমরখন্দ ও বোখারায়। সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কে জাতীয় জাদুঘরের পাশে রয়েছে বিশাল ভাস্কর্য উদ্যান। ভাস্কর্য আছে তুরস্ক, ইরান, জর্দান ও ইন্দোনেশিয়া সহ অনেক দেশে। সৌদি আরব, মিশর, সিরিয়া বা ইরাকের গ্র্যান্ড মুফতিরা কি আমিনী, সাঈদী ও নূরানীদের চেয়ে কম মুসলমান? আফগানিস্তানে মোল্লা উমর আর ওসামা বিন লাদেনের অনুসারী তালেবানরা প্রায় দু হাজার বছরের পুরনো বৌদ্ধমূর্তি কামানের গোলা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে, যা শুধু বৌদ্ধধর্ম নয়, মানবসভ্যতার মহান অর্জনের উপর নৃশংস হামলার নামান্তর। তারপরও গজনীতে আবু মুসলিম খোরাসানির ভাস্কর্যের গায়ে তারা হাত দেয়নি।' (জনকণ্ঠ, ২৫ নবেম্বর ২০০৮)

পুরনো বাংলা প্রবাদ আছে বিশেষ ধরনের লোক ধর্মের কথা শুনতে চায় না। হাটহাজারীর জঙ্গী হেফাজতওয়ালাদের কোরাণ হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে লাভ নেই, তারা তা শুনবেন না। যারা এখনও তাদের ইসলামের হেফাজতকারী মনে করেন তাদের উদ্দেশে বলতে চাই, আল্লাহ্ সব মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন। কোরাণ হাদিসের বহু বাংলা তরজমা ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র থেকে তফসির সহ প্রকাশিত হয়েছে। আপনারা কোরাণ হাদিস পড়ে জানুন ইসলাম কী বলে। ইসলাম যে শান্তির ধর্ম, জ্ঞান অন্বেষণের ধর্ম, ভিন্ন ধর্মের সঙ্গে সহ অবস্থানের ধর্ম এসব কথা জামায়াতি ও হাটহাজারীর হেফাজতিদের কোনও লেখায় পাবেন না। জেহাদের নামে প্রতিপক্ষকে কতল ও সন্ত্রাস ছাড়া অন্য কোন ইসলাম তাদের মগজে নেই। ইসলামের আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য অনুভব করতে হলে সুফী সাধকদের রচনা পড়ুন এবং প্রার্থনা করুন, আল্লাহ্ যেন মওদুদিবাদী জামায়াত এবং তাদের নিত্যনতুন সহযোগীদের কবল থেকে ইসলাম ধর্ম এবং বনি আদমদের হেফাজত করেন।

সরকারকে আমরা বলতে চাই— হাটহাজারী নয়, শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ তথা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হেফাজত করা আপনাদের দায়িত্ব। হাটহাজারীর হেফাজতিদের মুক্তিযুদ্ধকালীন কর্মকাণ্ড এবং পরবর্তীকালে জামায়াত জঙ্গী সম্পৃক্ততা সম্পর্কে তদন্তের জন্য পাকিস্তানের মুনীর কমিশনের মতো উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন করুন। যে সব আলেম ওলামা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা '৭২-এর সংবিধানে আস্থা রাখেন তাদের সংগঠিত ও সহযোগিতা করুন। কারণ এই আলেমরা বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই বলছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কখনও ইসলামের প্রতিপক্ষ নয়, বরং ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের চেতনা ইসলামের সমার্থক। মওদুদিবাদি জামায়াতিরা এবং হালে তাদের মুখপাত্র 'হেফাজতে ইসলাম' মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর '৭২-এর সংবিধানকে ইসলামের প্রতিপক্ষ বানিয়েছে।

২৫ এপ্রিল ২০১৩

জাহানারা ইমামের আন্দোলন
গণআদালত থেকে গণজাগরণ মঞ্চ

২০১৩ সালে আমরা শহীদজননী জাহানারা ইমামের জন্মদিন পালন করছি এক কঠিন সংকটকালে। '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জামায়াত-শিবিরচক্রের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে একুশ বছর আগে সূচিত হয়েছিল এক অভূতপূর্ব নাগরিক আন্দোলন, যার নেতৃত্বে ছিলেন জাহানারা ইমাম। গত একুশ বছরে এই আন্দোলনকে বহু ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করতে হয়েছে। তবে এ বছরের মতো এত কঠিন সংকট অতীতে কখনও মোকাবেলা করতে হয়নি। '৭১-এর ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধীদের প্রধান দল জামায়াতে ইসলামী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করার জন্য অতীতের যে কোনও সময়ের তুলনায় নৃশংস হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি তারা 'হেফাজতে ইসলাম' নামক এক জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনকে মাঠে নামিয়েছে যারা বাঙালির পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, বাংলাদেশের সংবিধান এবং মুক্তচিন্তার মানুষদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। তারা জেহাদ ঘোষণা করেছে নারীর অধিকার ও মর্যাদা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের নায়কদের বিরুদ্ধে, যারা নিজেদের ঘোষণা করেছে জাহানারা ইমামের আন্দোলনের সন্তান হিসেবে। তাদের সর্বশেষ ঘোষণা হচ্ছে ৫ মে'র ভেতর তাদের দাবি মানা না হলে ৬ মে থেকে হেফাজতের জঙ্গীনেতা আল্লামা আহমদ শফীর সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী নাগরিক আন্দোলন অতীতে কখনও এর চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়নি।

শহীদজননী জাহানারা ইমাম ১৯৯২-এর ১৯ জানুয়ারি, গঠন করেছিলেন 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। গত একুশ বছর বহু ঝড়ঝঞ্ঝা ও ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করে এই আন্দোলন এখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। ভিকটিমদের পরিবারের দীর্ঘ প্রতীক্ষা এবং নাগরিকদের অব্যাহত আন্দোলনের পর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে।

'৯২-এর ১৯ জানুয়ারি নির্মূল কমিটি গঠনের তিন সপ্তাহ আগে মুক্তিযুদ্ধের আত্মস্বীকৃত প্রতিপক্ষ, গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সংবিধান লংঘন করে শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে দলের আমীর ঘোষণা করেছিল। তখন এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজ। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাৎক্ষণিকভাবে বিক্ষোভ মিছিল বের করে যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা গোলাম আযমের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে এই জনবিক্ষোভের ফলশ্রুতি— 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'।

দেশের ১০১ জন বিশিষ্ট নাগরিকের সমন্বয়ে গঠিত নির্মূল কমিটির ঘোষণায় বলা হয়েছিল— 'আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীবৃন্দ এই মর্মে ঘোষণা করছি, বেআইনীভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানী নাগরিক ও যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমকে যদি অবিলম্বে দেশ থেকে বহিষ্কার করা না হয় তাহলে আগামী ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার ২১তম বার্ষিকীর দিন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশিষ্ট নাগরিক ও আইনজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত প্রকাশ্য গণ-আদালতে গোলাম আজমের বিচার হবে। যেহেতু গোলাম আজম অপরাধ করেছে এদেশের সমগ্র জনগণের কাছে সেহেতু গণ-আদালতই হবে এই ঘৃণিত ব্যক্তির বিচারের উপযুক্ত স্থান।'

গোলাম আযমের বিচারের দাবি আরও স্পষ্ট করে ১০ ফেব্রুয়ারি '৯২ তারিখে প্রকাশিত নির্মূল কমিটির প্রথম ইশতেহারে বলা হয়— 'গোলাম আজমের বিচার হওয়া দরকার— (১) একাত্তরের নৃশংস গণহত্যাযজ্ঞের প্ররোচনা দানের জন্য (২) ঘাতক বাহিনীসমূহকে হত্যা, নারী নির্যাতন ও লুণ্ঠনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য (৩) স্বাধীনতার জন্য জীবন বাজি রেখে দেশের যে শ্রেষ্ঠ সন্তানরা যুদ্ধ করছিল তাদের 'জারজ সন্তান' 'দুষ্কৃতকারী' আখ্যা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রচেষ্টার জন্য (৪) বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য (৫) বাংলাদেশে বসে স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা অব্যাহত রাখার জন্য ... ।'

নির্মূল কমিটির ঘোষণা ও ইশতেহার বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। দেশের সকল জনপদের সর্বস্তরের মানুষ নির্মূল কমিটির ঘোষণার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। শুধু দেশের ভেতরে নয়, বাঙালি অধ্যুষিত বিভিন্ন দেশে স্বতস্ফূর্তভাবে গঠিত হয়েছে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জামায়াত-শিবির চক্রের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে লক্ষ লক্ষ গণস্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে। জাহানারা ইমামের জনসভায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়েছে। '৯২-এর ২৬ মার্চ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের প্রতীকী বিচার প্রত্যক্ষ করার জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ ছুটে এসেছিলেন। খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকার দূরপাল্লার বাস, ট্রেন, লঞ্চ বন্ধ করে রাস্তায় বেরিকেড দিয়ে, ১৪৪ ধারা জারি করেও গণআদালত অভিমুখী প্রবল জনস্রোত রুদ্ধ করতে পারেনি। তবে ক্রোধ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সরকার জাহানারা ইমাম সহ গণআদালতের ২৪ জন উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করেছিল।

গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের ধারণা নেয়া হয়েছিল ভিয়েতনামে আমেরিকার যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য গঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইবুনাল অন ভিয়েতনাম' থেকে। এটি ছিল যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিবেকবান মানুষের প্রতিবাদের অভিব্যক্তি। এই ট্রাইবুনালের কোন আইনি বৈধতা বা দণ্ড কার্যকর করার ক্ষমতা ছিল না। ১৯৬৬ সালের ১৩ নবেম্বর লন্ডনে এই ট্রাইবুনালের প্রথম মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাইবুনালের অনারারি প্রেসিডেন্ট

ছিলেন বৃটিশ লেখক ও দার্শনিক লর্ড বার্টান্ড রাসেল, নির্বাহী সভাপতি ছিলেন ফরাসী লেখক জাঁ পল সার্ত্রে এবং অধিবেশনসমূহের সভাপতি ছিলেন রুশ আইনজ্ঞ ও ঐতিহাসিক ভ্লাদিমির দেদিজের। ট্রাইবুনালের সদস্য ছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ২৩ জন আইনজ্ঞ, লেখক, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ। একইভাবে বিভিন্ন দেশের ৩১ জন বিশিষ্ট নাগরিক এই ট্রাইবুনালে সাক্ষ্যপ্রদান করেছিলেন। বার্টান্ড রাসেল ও জাঁ পল সার্ত্রের এই ট্রাইবুনাল বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে ১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধী ও গণহত্যাকারী গোলাম আযমের জন্য বিচারের জন্য গঠিত গণআদালত বা 'পিপলস ট্রাইবুনালে'র সদস্য ছিলেন ১২ জন, যার চেয়ারপার্সন ছিলেন শহীদজননী লেখক জাহানারা ইমাম। এই গণআদালতে গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১০টি অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তিনজন বরেণ্য বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও লেখক সৈয়দ শামসুল হক এই অভিযোগ উত্থাপন করেন। ১০টি অভিযোগে গোলাম আযমের বিচার হয়, দশজন বিশিষ্ট নাগরিক ও শহীদ পরিবারের সদস্য এই ট্রাইবুনালে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ট্রাইবুনালের রায়ে বলা হয় গোলাম আযমের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রতিটি অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে এবং এগুলো হচ্ছে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। গণআদালত যেহেতু রায় কার্যকর করার ক্ষমতা রাখে না সেহেতু তারা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন গোলাম আযমের বিচার ও শাস্তি কার্যকর করার জন্য। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে দেশে ও বিদেশে জনমত সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এই গণআদালত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

গণআদালতে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমের বিচারের পর জাহানারা ইমামের আন্দোলনের বড় সাফল্য ছিল গোলাম আযম ছাড়া অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের দুষ্কর্ম অনুসন্ধান এবং মাঠপর্যায়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের জন্য 'জাতীয় গণতদন্ত কমিশন' গঠন করা। বরেণ্য কবি ও সমাজকর্মী সুফিয়া কামালকে চেয়ারপার্সন করে '৯৩-এর ২৬ মার্চ ১১ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় গণতদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন প্রথম পর্যায়ে আটজন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সাতজন যুদ্ধাপরাধীর দুষ্কর্ম সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করে প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দুটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ১৯৯৪ ও ১৯৯৫-এর মার্চে। প্রতিবেদনের উপসংহারে '৭১-এর গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কীভাবে হবে সে বিষয়ে বলা হয়—

> 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনগুলোর ভিত্তি গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক নুরেমবার্গ ও টোকিও ট্রায়ালের মাধ্যমে। এরপর জাতিসংঘের বিভিন্ন কনভেনশন, ঘোষণা ও মানবাধিকার দলিলে যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধগুলার বিচার নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া হয়।
>
> 'এই বিচার সম্পাদনের সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তির কারণে পৃথিবীর অনেক দেশই যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য নিজস্ব আইন প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম (ট্রাইব্যুনাল) এ্যাক্টটি যুদ্ধাপরাধ, শান্তিবিরোধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং

গণহত্যাজনিত অপরাধের বিচারের জন্য প্রণীত হয়। এই আইনে রাজনীতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কারণে বেসামরিক জনগোষ্ঠীর উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া, তাদের হত্যা, ধর্ষণ, আটক, নিপীড়ন, সম্পদ ধ্বংস করা বা এসব অপরাধের প্রচেষ্টা, এসব অপরাধে সহযোগিতা, ষড়যন্ত্র ও উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং প্ররোচনা প্রদানকে যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী, শান্তিবিরোধী ও গণহত্যাজনিত অপরাধের সংজ্ঞাভুক্ত করা হয়। '৭৩-এর আইনে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে এসব অপরাধের বিচার ও সেই বিচারকার্যে একাত্তরের পত্রপত্রিকা, প্রচার মাধ্যমে পরিবেশিত তথ্যাদি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণের বিধান করা হয়।

'গণতদন্ত কমিশন অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অপরাধ ও প্রাসঙ্গিক আইনগুলো পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, বাংলাদেশের ১৯৭৩ সালের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম (ট্রাইব্যুনাল) এ্যাক্ট এবং প্রচলিত আইনের অধীনে এই সকল অপরাধীর বিচার করা যেতে পারে।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নিরাপদ ও অর্থবহ করতে হলে এই ধরনের ঘাতক, দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। বাংলাদেশে আজ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। সরকার ও বিরোধীদলগুলো গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলছে। গণতদন্ত কমিশন বিশ্বাস করে এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে যারা দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছে, যারা তাদের গণহত্যা, ধর্ষণ, গৃহে অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও যাবতীয় ধ্বংসযজ্ঞে প্রত্যক্ষ ও পরোপক্ষভাবে সম্পৃক্ত থেকেছে, তাদের বিচার এড়িয়ে গণতন্ত্র, আইনের শাসন কিংবা মানবাধিকার কিছুই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এক্ষেত্রে বিচারের মূল দায়িত্ব সরকারের। সরকারেরই ক্ষমতা রয়েছে যে কোন অপরাধ বিচারের।'

গত একুশ বছরে শহীদজননী জাহানারা ইমামের নাগরিক আন্দোলনকে বহু চড়াই-উৎরাই, বহু প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়েছে। আন্দোলনের স্রোত কখনও বাধাগ্রস্ত হয়ে স্তিমিত হয়েছে কিন্তু অতীতের অন্য সব নাগরিক আন্দোলনের মতো আপোসের চোরাবালিতে হারিয়ে যায়নি। আন্দোলনের বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা ও আঘাতের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর ছিল অন্তর্ঘাত। খালেদা জিয়ার সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ বার বার অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা, কিংবা প্রলোভনে বশীভূতদের দ্বারা নির্মূল কমিটি ভাঙতে চেয়েছে। তারা বলেছে, এই সংগঠনটি দাঁড় করানো হয়েছে আওয়ামী লীগ ও ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার অর্থানুকুল্যে। নির্মূল কমিটির প্রতিপক্ষ '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের দল জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের অপরাপর মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক দোসররা সব সময় সেক্যুলার মানবতাবাদী, সমাজতন্ত্রী ও গণতন্ত্রকামীদের ভারত, আওয়ামী লীগ ও হিন্দুদের চর হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, যেভাবে '৭১-এ মুক্তিযোদ্ধাদের তারা বলত 'দুস্কৃতকারী', 'দেশদ্রোহী' ও 'ভারতের এজেন্ট'।

প্রতিপক্ষের এসব আগ্রাসী প্রচারণায় অনেক সময় আন্দোলনের নতুন কর্মীরা বিভ্রান্ত ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে, তবে একদল তরুণের জায়গায়

আরেক দল এসেছে। আন্দোলনের শাখা প্রশাখা ও শেকড় বিস্তৃত হয়েছে দেশের মাটিতে এবং দেশের বাইরেও। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সর্বত্র আমজনতার প্রাণের দাবি। এই দাবি আদায়ের গুরুদায়িত্ব নির্মূল কমিটি স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছে। এভাবেই শহীদজননীর আন্দোলনের স্রোতধারা সাময়িক স্থবিরতা বা মন্থরগতির পরও আবার বেগবান হয়েছে। কিছু মানুষের দাবি কালপরিক্রমায় গণদাবিতে পরিণত হয়েছে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী যখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তখন থেকে এই বিচার বানচাল করার জন্য জামায়াত এবং তাদের সহযোগীরা বহুমাত্রিক চক্রান্ত আরম্ভ করেছে। শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে তারা বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিকে ভাড়া করেছে এই বিচারের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়াবার জন্য। জামায়াত বলছে তারা বিচার, ট্রাইবুনাল কিছুই মানে না। জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করে ট্রাইবুনালের কাঠগড়ায় দাঁড় করালেও বিচার বিঘ্নিত ও বিলম্বিতকরণের ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় সরকার পদে পদে ব্যর্থ হয়েছে। ট্রাইবুনালে সরকার পক্ষের সাক্ষীদের জামায়াত ভয়ভীতি দেখিয়ে মামলা দুর্বল করতে চেয়েছে। সাক্ষীদের হত্যা ও গুম সহ ট্রাইবুনালে অনুপ্রবেশ ও অন্তর্ঘাতের বহু ঘটনা ঘটেছে, যা সরকার প্রতিহত করতে পারেনি। এরই প্রতিফলন ঘটেছিল আসামী কাদের মোল্লার মামলার রায়ে, যখন আমরা ক্ষুব্ধ হয়ে লক্ষ্য করি তাকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

কাদের মোল্লাসহ '৭১-এর সকল গণহত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড এবং তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে জাহানারা ইমামের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্ম যখন শাহবাগ চত্বরে মহাজাগরণ ঘটিয়েছে তখনই তারা জামায়াতের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। জাহানারা ইমাম এবং তাঁর সহযোগীদের জামায়াত যেভাবে 'নাস্তিক', 'মুরতাদ', 'কাফের' বলেছিল একই ভাষায় তারা শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের নায়কদের প্রতি বিষোদগার করছে। শুধু তাই নয়, রাজিব ও জগৎজ্যোতিকে হত্যার মাধ্যমে তারা ব্লগারদের হত্যা প্রক্রিয়াও আরম্ভ করেছে।

জামায়াতের লেলিয়ে দেয়া হেফাজতিরা সারা দেশে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে জঙ্গী সমাবেশের নামে নির্মূল কমিটি ও গণজাগরণ মঞ্চের নেতৃবৃন্দের প্রতি বিষোদগার অব্যাহত রেখেছে। হেফাজতে ইসলাম-এর প্রতি সরকারের সমনীয় মনোভাব তাদের আরও দুঃসাহসী ও সহিংস করে তুলছে। তারা ঘোষণা দিয়েছে—— বাংলাদেশের সংবিধান তারা মানে না, কোরাণ তাদের সংবিধান এবং তাদের নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে।

আমরা দাবি জানিয়েছি জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের পাশাপাশি জামায়াত-জঙ্গী সম্পৃক্ততার জন্য হেফাজতের রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড অবিলম্বে নিষিদ্ধ করতে হবে। মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তির সঙ্গে যে কোন সমঝোতা কিংবা তাদের প্রতি নমনীয়তা দেশ ও জাতির জন্য সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনবে।

৩ মে, ২০১৩

৫ মে'র মহাষড়যন্ত্র এবং জাতীয় নিরাপত্তা

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর গত সোয়া চার বছরে গৃহযুদ্ধ ও সরকার উৎখাতের কয়েকটি উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। ২০০৯ সালে ফেব্রুয়ারির বিডিআর বিদ্রোহ ছিল গৃহযুদ্ধের প্রথম প্রচেষ্টা। সর্বশেষ উদ্যোগ ছিল ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলামের সরকার উৎখাতের মহাষড়যন্ত্র। দুটোই ব্যর্থ হয়েছে সশস্ত্র বাহিনী, নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সময়োপযোগী ও কুশলী পদক্ষেপ এবং এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ, সাহসী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্বের কারণে।

২০০৯ সালের বিডিআর বিদ্রোহে সামরিক বাহিনীর ৫৬ জন কর্মকর্তাকে জীবন দিতে হয়েছে। সেনাবাহিনীর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমগ্র জাতিকে ক্ষুব্ধ ও বেদনাহত করেছিল। বিদ্রোহ দ্রুত দমিত না হলে দেশের সর্বত্র সামরিক বাহিনী ও বিডিআর-এর সংঘর্ষ অবধারিত ছিল, যা গৃহযুদ্ধ থেকে সরকার উৎখাতের ঘটনায় পর্যবসিত হতে পারত। একইভাবে গত ৫ মে হেফাজতে ইসলাম প্রথমে ঢাকা অবরোধ, তারপর মতিঝিলের শাপলাচত্বরে ব্যাংকপাড়ায় এসে অবস্থানগ্রহণ এবং শেষ রাতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংকে হামলার পরিকল্পনা সহ পরদিন সচিবালয় দখলের মহাষড়যন্ত্র করেছিল। যথাসময়ে সরকার পতনের এই উদ্যোগ প্রতিহত করা না হলে আফগানিস্থানে ওসামা ও মোল্লা উমরের তালেবানি সরকারের মতো ৬ বা ৭ মে বাংলাদেশে আহমদ শফী ও বাবুনগরীর হেফাজতি সরকার কায়েম হতো।

হেফাজতে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক জুনায়েদ বাবুনগরী গ্রেফতারের পর গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদে বলেছেন বটে শাপলাচত্বরের মহাসমাবেশের মঞ্চ বা ৫ মে'র দুপুরের পর থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতির উপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, কিন্তু হেফাজতি সরকার গঠন এবং প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ষোলআনা খায়েশ তার ছিল। বাবুনগরী বলেছেন, পুলিশের উপর হামলা, বায়তুল মোকাররমের চারপাশের দোকানে, সিপিবির অফিসে, ব্যাংকের বুথে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুণ্ঠনের ঘটনার সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির সন্ত্রাসীরা যুক্ত ছিল।

বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেট সহ গোটা পুরানা পল্টন এলাকা যে জামায়াত-শিবিরের দুর্গবিশেষ এ তথ্য আমরা সবাই জানি। হেফাজতের নেতাদের অনেকের উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ এবং আফগানিস্থানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে জেহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকলেও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটাবার মতো উপযুক্ত পরিকল্পনা, প্রস্তুতি ও নেতৃত্ব তাদের নেই। গৃহযুদ্ধ ও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানোর সামর্থ, মানসিকতা ও পরিকল্পনা বাংলাদেশে বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপি ছাড়া যে অন্য কারও নেই এর প্রমাণ হচ্ছে গত তিন মাসে এ দুই

দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বক্তব্য, যা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে। হেফাজত কীভাবে জামায়াত ও বিএনপির পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠে নেমেছে এর বিবরণ বিভিন্ন দৈনিকের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে যেমন প্রকাশিত হচ্ছে, হেফাজতের গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের স্বীকারোক্তি থেকেও তা জানা যাচ্ছে।

হাটহাজারীর আহমদ শফী, মুফতি ইজাহার ও জুনায়েদদের হেফাজতের জন্ম ২০১০-এ হলেও গত ৫ ফেব্রুয়ারি শাহবাগের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের আগে এদের কোনও তৎপরতা চোখে পড়েনি। মহাজোট সরকার যখন থেকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তখন থেকে জামায়াত চোখে অন্ধকার দেখছে। জামায়াত জানে বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে যদি দলের শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন হয়— বাংলাদেশের মাটিতে তাদের পা রাখার জায়গা থাকবে না। জামায়াত এটাও জানে, একা তাদের পক্ষে এ বিচার প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নবিদ্ধ ও বানচাল করবার জন্য শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে তারা বিদেশে যেমন বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে ভাড়া করেছে দেশের ভেতরেও বিএনপির কাঁধে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো ভর করে একের পর এক সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের রায়ে দলের অন্যতম নেতা কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদানে জামায়াত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও পারেনি এর প্রতিবাদে শাহবাগ চত্বরে তরুণ ব্লগারদের নেতৃত্বে মহাজাগরণের কারণে। কাদের মোল্লা সহ সকল যুদ্ধাপরাধীর চরম দণ্ড এবং জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে শাহবাগে ইমরান, বাঁধন, মারুফ, জেবতিক, কানিজ, নন্দিতা ও লাকিদের অভূতপূর্ব উত্থান, দিনের পর দিন সর্বস্তরের নাগরিকদের চলমান মহাসমাবেশ প্রত্যক্ষ করে জামায়াত যারপরনাই আতঙ্কিত হয়েছে এবং অতীতের মতো ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের প্রতি একের পর এক 'নাস্তিক', 'মুরতাদ', 'কাফের'-এর তীর-বল্লম নিক্ষেপ করছে।

মুক্তিযুদ্ধকালে যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও গণহত্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি ধর্মব্যবসায়ীদের দল স্বাধীন বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবেই নিষিদ্ধ ছিল। স্বাধীন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু করার অজুহাতে সংবিধান সংশোধন করে '৭১-এর ঘাতক দালালদের প্রধান দল জামায়াত ও অন্যান্য ধর্মভিত্তিক দলকে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়েছিলেন। এরপর জেনারেল এরশাদ ও খালেদা জিয়ার আমলে সরকার ও প্রশাসন এবং সৌদি বাদশাহ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শেখদের পৃষ্ঠপোষকতায় জামায়াতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৮ সালে আত্মপ্রকাশের পর জামায়াতের ধারাবাহিক উত্থান প্রথমবারের মতো থমকে গিয়েছিল ১৯৯২-এর জানুয়ারিতে সূচিত জাহানারা ইমামের আন্দোলনের কারণে।

গত একুশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময়ও দেখা গেছে— জামায়াত যখনই কোণঠাসা হয় তখনই নিজেদের ইসলামের হেফাজতকারী হিসেবে দাবি করে প্রতিপক্ষকে 'নাস্তিক', 'মুরতাদ', 'কাফের' বলে প্রতিহত করবার চেষ্টা করে। ১৯৯২-এর নবেম্বরে জাহানারা ইমামের আন্দোলন যখন তুঙ্গে জামায়াত প্রথমে কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে 'খতমে নবুয়ত' নামক একটি সংগঠনকে মাঠে নামিয়েছিল। তখন রাজশাহী সহ বিভিন্ন অঞ্চলে আহমদীয়া মুসলিম জামায়াতের বিভিন্ন কমপ্লেক্স ও মসজিদে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে পবিত্র কোরাণের বহু দুস্প্রাপ্য সংগ্রহ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। এর পরের মাসে ৬ ডিসেম্বর ভারতে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক বাবরী মসজিদ ভাঙার অজুহাতে তারা বাংলাদেশে হিন্দুদের সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মন্দির ভেঙেছিল। এর পাশাপাশি জাহানারা ইমামের আন্দোলনের পুরোগামী নেতা অধ্যাপক আহমদ শরীফ, কর্ণেল (অবঃ) কাজী নূর উজ্জামান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরীদের 'নাস্তিক', 'মুরতাদ' আখ্যা দিয়ে হত্যার হুমকি দিয়েছিল। জাহানারা ইমামকে তারা 'জাহান্নামের ইমাম' এবং কবি সুফিয়া কামালকে 'পতিতা' বলার মতো ধৃষ্টতা তারা প্রদর্শন করতে পেরেছিল খালেদা জিয়ার সরকারের আশীর্বাদের কারণে। ১৯৯৩ সালে জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী 'নাস্তিক', 'মুরতাদ'দের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দাবি করে পাকিস্তানের মতো ব্লাসফেমি আইন প্রণয়নের জন্য জাতীয় সংসদে প্রস্তাব করেছিলেন।

একুশ বছর পর শাহবাগের ছাত্রজনতার জামায়াতবিরোধী মহাজাগরণে ভীত হয়ে জামায়াত একের পর এক পুরনো তাসই খেলছে। জোট বাঁধার সুবাদে এবার তারা বিএনপিকে ষোলআনা পাশে পেয়েছে। শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের নেতাদের সম্পর্কে জামায়াত ও বিএনপির গণমাধ্যমে একযোগে বলা হল এই তরুণ ব্লগাররা সবাই আল্লাহ, রসুলের (সাঃ) সমালোচনাকারী 'নাস্তিক', 'মুরতাদ', 'কাফের' ইত্যাদি। শুধু কাগজে লিখে বা জনসভায় বিষোদগার করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, ব্লগার রাজিব ও জগৎজ্যোতিকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ঢাকা ও সিলেটে। '৯২-এ তারা যেমন খতমে নবুয়তকে মাঠে নামিয়েছিল, এবার তারা ঢাল হিসেবে মাঠে নামিয়েছে এককালের জামায়াতবিরোধী হাটহাজারীর আল্লামা আহমদ শফীর 'হেফাজতে ইসলাম'কে। এককালে জামায়াতবিরোধী হলেও আহমদ শফীর দুর্বলতা কোথায় জামায়াত তা জানে। চট্টগ্রামের একাধিক ধর্মীয় সংগঠনের নেতারা বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের সময় আহমদ শফী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী ছিলেন। ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো জঙ্গী মৌলবাদের জন্ম দিয়েছে জামায়াত, যার অন্যতম সহযোগী ছিলেন হেফাজতের নেতারা। জামায়াত জানে হেফাজতের নেতাদের টাকা দিয়ে কেনা কোনও সমস্যা নয়। এককালের কট্টর জামায়াত সমালোচক হেফাজতের আমীর আহমদ শফী জামায়াতের মুখপত্র দৈনিক 'সংগ্রাম'-এ এক বিশাল খোলা চিঠি লিখে রাতারাতি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'ইসলাম বিদ্বেষের প্রতিবাদে গর্জে উঠুন' শিরোনামের এই উগ্রভাষী ও রাষ্ট্রদ্রোহী খোলা চিঠি ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে জামায়াত ও বিএনপির

দৈনিকগুলোর প্রথম পাতায় অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে প্রকাশিত হয়েছে। এই চিঠিতে আমাদের বিরুদ্ধে জামায়াতের পুরনো অভিযোগগুলোর পুনরাবৃত্তির পাশাপাশি সরকারের বিরুদ্ধে 'সর্বাত্মক আন্দোলনে'র হুমকিও দেয়া হয়েছে। এরপর আরও নির্দিষ্টভাবে হেফাজতিরা যে ১৩ দফা দাবি প্রণয়ন করেছে সেগুলো জামায়াতেরই দাবি, যা গত ষাট বছর ধরে আমরা শুনছি।

১৯৫৩ সালে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আমীর আবুল আলা মওদুদি 'কাদিয়ানি সমস্যা' শিরোনামে এক চটি বই লিখে পাকিস্তানের লাহোরে এমন এক দাঙ্গা বাঁধিয়েছিলেন, যা দমনের জন্য পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করতে হয়েছিল। '৫৩ সালের মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত ৪০ দিনের এই দাঙ্গায় আহমদীয়া মুসলিম জামায়াতের শত শত নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য তখন সামরিক আদালতে জামায়াতপ্রধান মওদুদির বিচার হয়। দাঙ্গার পরিকল্পনা ও প্ররোচনাকারী হিসেবে মওদুদিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল। পরে সৌদি বাদশাহের হস্তক্ষেপে পাকিস্তান সরকারকে মওদুদির মৃত্যুদণ্ড রদ করতে হয়েছে।

ঠিক ষাট বছর পর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় হেফাজতকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে জামায়াত যে দাঙ্গা বাঁধাতে চেয়েছিল, সরকার উৎখাতের যে ষড়যন্ত্র করেছিল তা দমন করার জন্য সামরিক আইন জারি দূরে থাক সামরিক বাহিনী তলব করবারও প্রয়োজন হয়নি। ৫ মে শেষ রাতে হেফাজতের লক্ষাধিক মানুষের জঙ্গী সমাবেশ ভাঙার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সুপরিকল্পিত অভিযান এক ঘন্টারও কম সময়ে সফল হয়েছে। এই অভিযানে হাজার হাজার নিহতের দাবি করেছে হেফাজত-জামায়াত-বিএনপি (অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের ভাষায় 'হে-জা-বি')। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে 'হে-জা-বি'দের এই উদ্ভট অবিশ্বাস্য সংখ্যাতত্ত্ব পাত্তা পায়নি। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ৫ ও ৬ মে'র 'হে-জা-বি' তাণ্ডবে নিহতের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৪০-এর উর্ধ্বে নয়, যাদের ভেতর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও রয়েছেন।

৫ মে হেফাজতের ঢাকা অবরোধের কর্মসূচিকে সরকার ভেবেছিল ৬ এপ্রিল তাদের লংমার্চের মতো কিছু একটা হবে, অবরোধের পর তারা যে যার জায়গায় ফিরে যাবে। অবরোধের পর যখন তারা মতিঝিলের শাপলা চত্বরে আসতে চেয়েছে—মাইকের সংখ্যা ও সমাবেশের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে মহানগর পুলিশ সে অনুমতিও দিয়েছে। শাপলা চত্বরে পাঁচ ঘণ্টার শান্তিপূর্ণ সমাবেশের প্রতিশ্রুতি দিয়ে হেফাজত কীভাবে তা ভঙ্গ করেছে পাঁচটা বাজার আগেই সবার কাছে তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। বায়তুল মোকারমকে কেন্দ্র করে গুলিস্তান, পুরানা পল্টন, কাকরাইল ও নয়া পল্টন থেকে 'হে-জা-বি' তাণ্ডব, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ ও লুন্ঠনের ঘটনা মালিবাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। সড়কদ্বীপের গাছ কাটার জন্য মেশিন-করাত ব্যবহার, লোহার রেলিং ভাঙার জন্য হাতুড়ি-শাবলের ব্যবহার, অগ্নিসংযোগের জন্য গান পাউডার ও পেট্রলের ব্যবহার, পুলিশের উপর পাল্টা গুলির ঘটনা থেকে মাগরেবের আগেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল 'হে-জা-বি'দের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা।

যখন আতঙ্কিত নগরবাসী রুদ্ধশ্বাসে দেখছিল— হালাকু খাঁর বাহিনী যেভাবে বাগদাদের সব পাঠাগার ভষ্মিভূত করেছিল ঠিক সেভাবে দাউ দাউ করে জ্বলছে বায়তুল মোকাররমের উত্তর ও দক্ষিণ গেট-এর শত শত বইয়ের দোকান, যখন ইসলামের ধ্বজাধারী 'হে-জা-বি' আগুনে পুড়ে ছাই হচ্ছে পবিত্র কোরাণ ও হাদিস সহ যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ, তসবি, টুপি, জায়নামাজ; যখন ব্যাংকের বুথ ভাঙা হচ্ছে ঠিক তখনই বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া আহ্বান জানালেন দলের সকল নেতা-কর্মীসহ ঢাকাবাসীকে 'হে-জা-বি' সন্ত্রাসের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। খালেদা জিয়ার এই আহ্বান ছিল ৪ মে শাপলা চত্বরে আয়োজিত বিএনপির মহাসমাবেশে থেকে তার ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটামের অন্তর্গত। তিনি বলেছিলেন ৪৮ ঘণ্টার ভেতর তার দাবি না মানলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পালাবার পথ পাবেন না। এর আগেই শাপলা চত্বরে হেফাজতের নেতারা ঘোষণা দিয়েছিলেন ১৩ দফা মানা না হলে তারা কেউ শাপলা চত্বর ছেড়ে যাবেন না। হেফাজতের নেতারা সেদিন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও এলজিআরডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের কঠোর হুঁশিয়ারির জবাব দিতে গিয়ে খালেদা জিয়ার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন, আশরাফও নাকি পালাবার পথ খুঁজে পাবেন না।

হেফাজত-জামায়াত-বিএনপির সরকার উৎখাতের পরিকল্পনা মোটামুটি নিখুঁত ছিল। প্রথম ধাক্কা এসেছে খালেদা জিয়ার আহ্বান ব্যর্থ হওয়ায়। 'হে-জা-বি'দের হিসেব ছিল খালেদা জিয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মিশরের তাহরির স্কয়ারের মতো বিএনপির লক্ষ লক্ষ কর্মী ও ঢাকাবাসী রাস্তায় নেমে আসবে। ঢাকাবাসী দূরে থাক বিএনপিরও কেউ নতুনভাবে রাস্তায় নামেনি। বিকেলে যেসব সন্ত্রাসী নেমেছিল লুটপাট করে তারা ঘরে ফিরে গিয়েছিল। ফলে শাপলা চত্বরে অবস্থানকারী ভাবীপ্রধানমন্ত্রী জুনায়েদ বাবুনগরী সহ হেফাজতের তাবৎ নেতা সংগঠনের হাজার হাজার শিশু-কিশোর কর্মীদের অন্ধকারে অভুক্ত ও অরক্ষিত রেখে পালিয়ে গেলেন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলীতে যখনই দাঙ্গাকারী, জনসম্পদ ও রাষ্ট্রীয়সম্পদ ধ্বংসকারী সন্ত্রাসীরা নিহত হয়— বিএনপি-জামায়াত-হেফাজত সহ ১৮ দলীয় জোটের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার পাখির মতো মানুষ হত্যা করছে। গত ৫ ও ৬ মে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হেফাজতে ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বিএনপি-জামায়াতের সন্ত্রাসীরা যে নজিরবিহীন নৃশংস তাণ্ডব চালিয়েছে, যা প্রতিহত করার জন্য পুলিশকেও এক পর্যায়ে গুলী ছুঁড়তে হয়েছে তার ফলে দেশী ও বিদেশী গণমাধ্যমের হিসেবে সাধারণ মানুষ, নিরীহ পথচারী ও হেফাজতের কর্মীদের নিহতের সংখ্যা ৪০-এর বেশি না হলেও খালেদা জিয়ার বিএনপি-জামায়াত-হেফাজত দাবি করেছে এই সংখ্যা নাকি দুই থেকে তিন হাজারেরও বেশি এবং এই হত্যাকাণ্ড নাকি '৭১-এর ২৫ মার্চের গণহত্যার ঘটনাকে ম্লান করে দিয়েছে। '৭১-এর গণহত্যা নিয়ে এরকম জঘন্য মিথ্যাচার ও মশকরা কেবল বেগম খালেদা জিয়াদের পক্ষেই সম্ভব।

খালেদা জিয়ার বিএনপি-জামায়াত-হেফাজত দাবি করেছে সরকার নাকি হাজার হাজার লাশ গুম করে দিয়েছে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে ৫ মে শাপলা চত্বরে শত শত দেশী-বিদেশী সাংবাদিক হেফাজতের সমাবেশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের শত শত স্টিল ও টিভি ক্যামেরা, এমনকি মোবাইল ফোনের ক্যামেরাও ১৮ ঘণ্টা চালু ছিল। কারও ক্যামেরায় হাজার হাজার লাশের ছবি, কিংবা হাজার হাজার লাশ গুম করার ছবি ধরা পড়ল না। এটা কি জাদুকর পিসি সরকার বা হুডিনির ভোজবাজি? তিন হাজারের বেশি লাশ সরাতে গেলে কয়টা ট্রাক লাগে? লাশ কোথায় ফেলা হয়েছে, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা না ধলেশ্বরী নদীতে?

'পাখির মতো গুলী করে হত্যা' বাগ্‌ধারাটি বেগম খালেদা জিয়ার কল্যাণে স্কুলপড়ুয়া বালক-বালিকারাও শিখে গেছে। হেফাজত-জামায়াত-বিএনপির তাবৎ সন্ত্রাসীদের খালেদা জিয়া পাখি হিসেবে গণ্য করেন। তিনি এদের তোতা, আবাবিল বা বুলবুলি ভাবতে পারেন, আমরা তো শকুন ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ যেমন তার কালজয়ী কবিতায় লিখেছিলেন— 'জাতির পতাকা আজ খামচে ধরেছে সেই পুরনো শকুন।' খালেদা জিয়ার আদরের এই শকুন পাখিদের আমরা দেখেছি '৭১-এ। তখনকার সব প্রামাণ্যচিত্রে আমরা দেখেছি শকুনরা কীভাবে ছিঁড়ে খাচ্ছে আমাদের স্বজনদের শবদেহ। '৭১-এ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পাকিস্তানি সামরিক কর্তাদের আতিথ্যগ্রহণকারিণী খালেদা জিয়া গণহত্যা দেখেননি, গণহত্যার ইতিহাসও পড়েননি। যদি দেখতেন বা পড়তেন তাহলে ৫ মে হেফাজত-জামায়াতের দুই ডজন কেডারের মৃত্যুকে গণহত্যা বলতেন না। গত কয়েক মাসের দাঙ্গাকারী, তাণ্ডব সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসীদের হত্যাকে পাখির মতো বলতে পারতেন না। ৫ ও ৬ মে জামায়াত-হেফাজতের গুলিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সাধারণ পথচারী ও আওয়ামী লীগের কর্মী নিহত হওয়ার সংবাদ খবরের কাগজে বেরিয়েছে।

আমরা নীতিগতভাবে কোনও হত্যা সমর্থন করি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি মৃত্যুদণ্ডেরও বিরুদ্ধে। কাস্টডিতে হত্যা যখনই হোক না কেন আমি প্রতিবাদ করেছি। মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করলেও '৭১-এর গণহত্যাকারী, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের জন্য আমি মনে করি মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে সর্বনিম্ন শাস্তি এবং এই শাস্তিপ্রদানের দায় যেমন ট্রাইবুনাল এড়াতে পারে না, একই সঙ্গে অপরাধীদেরও অধিকার রয়েছে এই শাস্তিলাভের।

৫ ও ৬ মে সহ গত কয়েক মাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তখনই গুলী করেছে যখন হেফাজত-জামায়াত-বিএনপির সন্ত্রাসীদের দ্বারা নিরীহ মানুষের জীবন-জীবিকা আক্রান্ত হয়েছে, কিংবা কর্তব্যরত পুলিশ আক্রান্ত ও নিহত হয়েছেন। নিরস্ত্র পুলিশকে জামায়াতের সন্ত্রাসীরা কীভাবে রাস্তায় ফেলে থান ইট দিয়ে বার বার আঘাত করে মাথা থেঁতলে দিয়েছে, কীভাবে মাথার ভেতর লোহার রড ঢুকিয়ে পুলিশ হত্যা করেছে— টেলিভিশনের পর্দায় সে সব ভয়ঙ্কর নৃশংস দৃশ্য সবাই দেখেছে এবং আতঙ্কিত হয়েছে। বাংলাদেশের ৪২ বছর কিংবা পাকিস্তানকালের ২৪ বছরের ইতিহাসে পুলিশহত্যার এমন দৃশ্য দেখিনি।

৮ মে ঢাকার পুলিশের কমিশনার গোয়েন্দা প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে বলেছেন, ৫ তারিখ মধ্যরাতে হেফাজতের কর্মীদের মূল পরিকল্পনা ছিল বাংলাদেশ ব্যাংক সহ মতিঝিল পাড়ার বড় বড় সব ব্যাংক ও স্টক এক্সচেঞ্জ ভবনে হামলা ও লুণ্ঠন। অন্য সব ব্যাংকে কী আছে জানি না, শুধু বাংলাদেশ ব্যাংকের ভল্টে রয়েছে ১৪ বিলিয়ন ডলারের স্বর্ণ ও কারেন্সি নোট। রাতে ব্যাংক লুটের পর সকালে বিএনপি-জামায়াতের সহযোগিতায় সচিবালয় দখলেরও পরিকল্পনা ছিল হেফাজতের।

ঢাকা অবরোধের আগেই বিএনপির পরিকল্পনা অনুযায়ী হেফাজত ঘোষণা করেছিল ৫ মে'র ভেতর সরকার ১৩ দফা দাবি না মানলে ৬ মে থেকে সারা দেশে হেফাজতের সরকার কায়েম হবে। ৮ মে দৈনিক 'আমাদের সময়' লিখেছে, হেফাজত বাংলাদেশে আফগান স্টাইলে তালেবানি শাসন কায়েম করবে এবং এই হেফাজতী সরকারের ধর্মগুরু হবেন আল্লামা শফী, আর হেফাজতের সাধারণ সম্পাদক জুনায়েদ বাবুনগরী হবেন প্রধানমন্ত্রী।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং স্থানীয় সরকারের মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম ৫ মে সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, হেফাজতের ১৩ দফা দাবি মানতে হলে বেগম খালেদা জিয়াকে বোরখা পরে পাকঘরে বসে থাকতে হবে। বিএনপির মুক্তিযোদ্ধা নেতা সাদেক হোসেন খোকা বলেছেন, তার দল ক্ষমতায় গেলে হেফাজতের ১৩ দফা দাবি বাস্তবায়ন করা হবে, যে ১৩ দফার প্রতিটি বাক্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানবিরোধী।

আমরা দাবি জানিয়েছি— ৫ মে'র হত্যা ও তাণ্ডবের শ্বেতপত্র সরকারকে প্রকাশ করতে হবে। জাতিকে জানতে হবে হেফাজতের গডফাদার ও গডমাদারদের আসল চেহারা।

'হে-জা-বি' নেতারা যখন ৫ মে আরব বসন্তের মতো তৌহিদী জনতার অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সরকার পতনের পরিকল্পনা করছিলেন তখন তারা শেখ হাসিনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সাহস ও ক্ষমতাকে আমলে আনেননি। এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষতা ও দূরদর্শিতা আমরা বিডিআর বিদ্রোহের সময় দেখেছি, এবার 'হে-জা-বি' মহাষড়যন্ত্রে আবার দেখলাম। প্রায় বিনা রক্তপাতে লক্ষাধিক জেহাদীর জঙ্গী সমাবেশ ভেঙে দেয়ার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দিতে হবে। শত শত দেশীবিদেশী সাংবাদিকের উপস্থিতিতে এ ধরনের অভিযানে এত বড় সাফল্য সাম্প্রতিককালে বিশ্বের অন্য কোথাও দেখা যায়নি। বরং গত তিন বছর ধরে আমরা এর বিপরীত দৃশ্যই দেখছি আরব দেশগুলোতে।

৫ মে'র অভ্যুত্থানপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও 'হে-জা-বি'রা হতোদ্যম হয়ে চুপচাপ ঘরে বসে থাকবে এমনটি মনে করবার কোন কারণ নেই। পাকিস্তানে এখন আইএসআই ও সেনাবান্ধব সরকার ক্ষমতায় এসেছে। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচনে পিপিপির পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল জারদারি ক্ষমতায় এসে আইএসআই'র ক্ষমতা খর্ব

করতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানে জামায়াত-সমর্থিত মুসলিম লীগ ক্ষমতায় আসার কারণে বাংলাদেশে আইএসআই'র কর্মপরিধি এখন আরও বিস্তৃত হবে। 'হে-জা-বি'রা নতুন উদ্যমে আরব বসন্ত উৎসবের পরিকল্পনা করবে। পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগে এখনও তাদের অবস্থান রয়েছে।

জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে মেধা, দক্ষতা ও প্রযুক্তির ঘাটতি দ্রুত পুরণের পাশাপাশি মহাজোট সরকারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি দায়বদ্ধতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। আফগানিস্থানের সমাজতন্ত্রী প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহ তালেবানদের উত্থান প্রতিহত করবার জন্য আপোষের পথ বেছে নিয়েছিলেন। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে প্রথমে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং পরে আফগানিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেও তিনি বাঁচতে পারেননি। মোল্লা উমররা কী নৃশংসভাবে ড. নজিবুল্লাহকে হত্যা করেছে আমরা তা দেখেছি।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ক্ষেত্রে আপোষের কোনও সুযোগ নেই। ৫ মে জামায়াত-হেফাজতের মহাতাণ্ডব এবং সরকার উৎখাতের পরিকল্পনার কথা জেনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, হেফাজত ও জামায়াতকে আর ছাড় দেয়া হবে না। তাঁর এই ঘোষণার প্রতিফলন আমরা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নীতিতে দেখতে চাই।

১৩ মে ২০১৩

পনের সম্পাদকের ক্ষুব্ধতার শানে নজুল

উচ্চতর আদালতের ভাষায় 'বাইচান্স' সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের গ্রেফতার, তার মালিকানাধীন পত্রিকা 'দৈনিক আমার দেশ' এবং 'দিগন্ত টেলিভিশন' ও 'ইসলামী টেলিভিশন'-এর প্রচার বন্ধ করে দেয়ার প্রতিবাদে দেশের গুরুত্বপূর্ণ দৈনিকসমূহের পনের জন সম্পাদক যে বিবৃতি দিয়েছেন তার পক্ষে ও বিপক্ষে সংবাদপত্রের 'উপসম্পাদকীয়'-র পাতায় এবং টেলিভিশনের 'টক শো'-এ তুমুল আলোচনা ও সমালোচনা হচ্ছে। টেলিভিশনের মধ্যরাতের 'টক শো'-এ টকারদের সামনে চায়ের পেয়ালা থাকে। পনের সম্পাদকের যুক্ত বিবৃতি আক্ষরিক অর্থেই চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলেছে। মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক-যুদ্ধাপরাধী জামায়াত ঘরানার কাগজে যেমন পনের সম্পাদককে জাতীয় বীরের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হচ্ছে— জামায়াতবিরোধী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বপক্ষের পত্রিকায় তাদের তুলোধুনো করা হচ্ছে। বিবৃতিদাতা সম্পাদকদের ভেতর আমার শ্রদ্ধাভাজন, প্রিয়ভাজন ও স্নেহভাজন কয়েকজন থাকলেও তাদের বিবৃতি আমাকে যারপরনাই হতাশ করেছে।

এই বিবৃতি যেদিন (১৯.০৫.২০১৩) ছাপা হয় সেদিন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, নাট্যব্যক্তিত্ব নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের নেতা ডাঃ কামরুল হাসান খান, ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ ও আমি খুলনার জনসভা শেষে একসঙ্গে ঢাকা ফিরছিলাম। মামুনের অভ্যাস— সকালে গাড়িতে দীর্ঘযাত্রায় বেরুলে একগাদা দৈনিক কিনতে হবে। সাত সকালে খুলনায় যে কটি দৈনিক পাওয়া গেছে সবগুলো সংগ্রহ করে গাড়ি ছেড়েছে যশোরের পথে— মামুন বিস্ময়সূচক মন্তব্য করে পনের সম্পাদকের বিবৃতির প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। বলা বাহুল্য আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বিস্মিত হয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষের সম্পাদকদের অভাবনীয় সহাবস্থানে এবং পরে ক্ষুব্ধ হয়েছি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মাহমুদুর রহমানের মতো একজন দুর্বৃত্ত মালিক-সম্পাদকের পক্ষাবলম্বনের কারণে।

মামুন আর বাচ্চুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের বয়স পঁয়তাল্লিশ বছরের কম নয়। বিবৃতিদাতা সম্পাদকদের ভেতর সংবাদের মনিরুজ্জামানের সঙ্গে মামুনের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ, আর ডেইলি স্টারের মাহফুজ আনামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেশি বাচ্চুর। ক্ষুব্ধ মামুন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাল— বাচ্চু, এখনই তুই এর প্রতিবাদ করে বিবৃতির ব্যবস্থা কর। আমি মনিরুজ্জামানকে ফোন করছি, তুই তোর জানি দোস্ত মাহফুজ আনামকে ফোন কর। এরপর মামুন আমাকে বলল, তুমি কাকে কাকে ফোন করবে এখনই করে ফেল।

সেদিন আমি ফোন করেছিলাম সে সব সম্পাদককে যারা বিবৃতিতে সই করেননি। তাদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হলাম উদ্যোগ নেয়া হয়েছে 'প্রথম আলো' ভবন

থেকে। সাংবাদিকদের, বিশেষভাবে সম্পাদকদের আমরা সম্ভ্রমের সঙ্গে জাতির বিবেক বলি। আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের সাংবাদিকতার জীবনের সিংহভাগ সময় কাজ করেছি সম্পাদকীয় বিভাগে, যদিও হাতেখড়ি হয়েছিল প্রতিবেদক হিসেবে। সাংবাদিকদের অধিকার ও মর্যাদার জন্য আন্দোলন করেছি। বঙ্গবন্ধুর আমলে দৈনিক বাংলার প্রধান সম্পাদক ও সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে হাসান হাফিজুর রহমান ও তোয়াব খানকে যখন অপসারণ করা হয় তখনও এর প্রতিবাদে রাস্তায় মিছিল করেছি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রামে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের অতুলনীয় অবস্থানের কথা বহু আন্তর্জাতিক ফোরামে বলেছি। 'পেশাগত দায়িত্ব' ও 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা'র প্রতারক যুক্তি ও জরাজীর্ণ অজুহাত প্রদর্শন করে বাংলাদেশের প্রথিতযশা সম্পাদকরা যেভাবে মাহমুদুর রহমানের কদর্য মিথ্যাচার, তথ্যসন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, ফ্যাসিবাদী আচরণ, সংবিধানবিরোধী অবস্থান এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিনাশী কর্মকাণ্ডের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন— সাংবাদিক পরিচয় দিতে আমার মতো যারা আত্মশ্লাঘা বোধ করেন তাদের সকল অহংকার ধুলোয় মিশে গেছে। কারণ বিবৃতিদাতাদের তালিকায় অপসাংবাদিকতার ধ্বজাধারীদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পতাকাবাহীরা একই বন্ধনীতে আবদ্ধ হয়েছেন। জামায়াত পরিবারের বিশাল অর্থভাণ্ডার এবং আন্তর্জাতিক যোগসূত্রের প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হলেন বাংলাদেশের আলোকিত তারকা সম্পাদকরা।

জামায়াতের আদর্শিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব এবং তাদের সহিংস শক্তির আন্তর্জাতিক উৎস সম্পর্কে মওলানা আবদুল আউয়াল, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ও অধ্যাপক আবুল বারকাতের মতো প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের পাশাপাশি আমার মতো অভাজনরা প্রায় পাঁচ দশক ধরে লেখালেখি করছি। অনেক সময় আমাদের বন্ধুরাও এই বলে সমালোচনা করেছেন— আমরা নাকি জামায়াতের শক্তি বাড়িয়ে বলছি, আসলে জামায়াত এত শক্তিশালী নয়। একুশ বছর আগে আমরা যখন শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে '৭১-এর ঘাতক দালাল ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জামায়াতের ইসলামীর মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে দেশব্যাপী বিশাল, নাগরিক আন্দোলনের সূচনা করেছিলাম তখনও কেউ কেউ বলেছিলেন— জামায়াত কত পার্সেন্ট ভোট পায়, তাদের নিয়ে এত হইচই করবার কী আছে? কোন কোন বাম বন্ধু এমনও বলেছিলেন, আমরা নন-ইস্যুকে ইস্যু করছি। আমি প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জামায়াতের অবস্থান নিয়ে অনেক লিখেছি। এখন দেখছি জামায়াত আমার ঘরের ভেতর ঢুকে গেছে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার পক্ষ-বিপক্ষের ভয়ঙ্কর সহবাস আমার বিশ্বাসের ভিত্তিমূল দুর্বল করে দিয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের পর পর দৈনিক বাংলা ও সাপ্তাহিক বিচিত্রায় যখন সাংবাদিকতার দ্বিতীয় পর্বে প্রবেশ করি তখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে দেশে ও বিদেশে তুমুল আলোচনা ও বিতর্ক যেমন অনুসরণ করেছি— এ নিয়ে লেখালেখিও কম করিনি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কখনও সাংবাদিকের স্বাধীনতা ছিল না। এই স্বাধীনতা

একান্তভাবে মালিকের স্বাধীনতা, পুঁজির স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের কর্মীদের শোষণের স্বাধীনতা। তারপরও পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্রের জগতে এমন সব সম্পাদক দেখেছি যারা পত্রিকার মালিকদের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করতেন সাংবাদিকদের অধিকার ও মর্যাদার পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবশনের জন্যে। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে আমরা যখন সাংবাদিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করি তখন আমাদের একটি দাবি ছিল সম্পাদকরা মালিকের নয়, সাংবাদিক-কর্মচারীদের প্রতিনিধি হবেন, তাদেরও ইউনিয়নের সদস্য সদস্য হতে হবে। সেই সময়ে মালিকদের সম্পাদক হওয়ার প্রথা ছিল না। পেশার প্রতি দায়বদ্ধ, প্রবীণ ও দক্ষ সাংবাদিকদের ভেতর থেকে মালিকরা সম্পাদক নিয়োগ করতেন, যেমনটি করা হতো প্রতিবেশী ভারতে বা পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশসমূহে।

স্বাধীনতা যে স্বেচ্ছাচারিতা নয়, দায়বদ্ধতা— এই আপ্তবাক্যটি তোয়াব ভাই এর মতো সম্পাদকরা নবীন সাংবাদিকদের মাথায় গজাল মেরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। জনস্বার্থ ও জননিরাপত্তার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়ে আমাদের জানতে হয়েছে। ছুরি কসাইয়ের হাতে যেমন থাকে, শল্যচিকিৎসকের হাতেও থাকে। শেষোক্তের ছুরি ব্যবহৃত হয় মানবদেহের রোগ নিরাময়ের জন্য। কলম যে কারও হাতে থাকতে পারে। সাংবাদিক কলম ধরেন সমাজদেহের রোগ নিরাময়ের জন্য, মানবজাতির কল্যাণের জন্য, সত্য ও সুন্দরের সাধনার জন্য। অনেক ব্যক্তিগত অপছন্দের বিষয় মেনে নিতে হয়েছে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং জন ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণে।

একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মুহূর্তে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধ ও গণহত্যাযজ্ঞে এদেশীয় যারা শরিক ছিল, যারা তখন জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত ছিল; যারা 'রাজাকার', 'আলবদর', 'আলশামস', 'মুজাহিদ বাহিনী', 'শান্তি কমিটি' প্রভৃতি ঘাতক বাহিনী গঠন করেছে এর রাজনৈতিক দর্শন রয়েছে। না, সেই দর্শন ইসলাম নয়, ইসলামের নামে মওদুদিবাদ ও ওহাবিবাদ; যারা মনে করে ধর্মের নামে প্রতিপক্ষকে হত্যা বা ধ্বংস করা অবশ্যকর্তব্য। হিটলার ও মুসোলিনির নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন জামায়াতের প্রতিষ্ঠিতা আবুল আলা মওদুদি । এই ভক্তির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি মূর্ত হয়েছে মওদুদির সেই বহুল আলোচিত উক্তিতে— 'ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা হচ্ছে ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।' (ইসলাম কা নজরিয়ায়ে সিয়াসি, প্রকাশক ঃ জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় প্রকাশনা বিভাগ, লাহোর, ১৯৫২, পৃঃ-৩৫)

'৭১-এর যুদ্ধাপরাধদের বিচারের জন্যই বাংলাদেশের মানুষ ২০০৮-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোটকে তিন চতুর্থাংশেরও বেশি আসনে জয়ী করেছিল। মহাজোট ক্ষমতায় এসে যখনই এই বিচার আরম্ভ করেছে তখন থেকে জামায়াত এবং তাদের দেশী-বিদেশী সহযোগী-সুহৃদরা এটি বানচালের জন্য বহুমাত্রিক চক্রান্ত আরম্ভ করেছে। শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে জামায়াত বহু

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও পেশাজীবী সংগঠন, সাংবাদিক, পেশাদার লবিস্ট ও রাজনীতিবিদদের ভাড়া করেছে। নাৎসিনেতা হিটলারের কুখ্যাত মন্ত্রী গোয়েবলস-এর তত্ত্ব অনুযায়ী বার বার একই মিথ্যা প্রচার করে মিথ্যাকে সত্যে রূপান্তরিত করতে চাইছে জামায়াত। জামায়াতের এই কদর্য মিথ্যাচার মাহমুদুর রহমান তার মালিকানাধীন পত্রিকা এবং জামায়াত বিএনপির মালিকানাধীন অন্যান্য পত্রিকা কীভাবে প্রচার করেছে সে সম্পর্কে দেশবাসীকে এবং বিশ্ববাসীকেও সম্প্রতি অবহিত করেছে মাহমুদুর রহমানের পক্ষে বিবৃতিদাতা ১৫ সম্পাদকের অন্যতম মাহফুজ আনামের 'ডেইলি স্টার'। জামায়াতের দুষ্কর্ম সম্পর্কে বহু বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন 'ডেইলি স্টার', 'প্রথম আলো', 'কালের কণ্ঠ', 'সমকাল', 'যুগান্তর' ও 'সংবাদ'-এ ছাপা হয়েছে যা অনেক সময় আমাদের বিভিন্ন লেখায় উদ্ধৃত করেছি।

দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মতো একজন গণহত্যাকারীকে 'ইসলামী চিন্তাবিদ', 'আল্লামা' 'ওলামা' প্রভৃতি বিশেষণে আখ্যায়িত করে মাহমুদুর রহমান গত ৬ জানুয়ারি 'দৈনিক আমার দেশ'- এর অনলাইন সংস্করণে মক্কায় কাবা শরিফের গিলাফ পরিবর্তনের ছবিকে সাঈদীর মুক্তির দাবিতে কাবা শরিফের ইমামদের প্রতিবাদ হিসেবে ছেপে মিথ্যাচারের যে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে জামায়াতে ইসলামীকে ইসলামের সমার্থক হিসেবে মহিমান্বিত করা, '৭১-এর গণহত্যার পক্ষে সাফাই গাওয়া এবং গণহত্যাকারীদের বিচার প্রশ্নবিদ্ধ ও বানচাল করা।

শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের জন্ম হয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের চরম শাস্তি এবং তাদের প্রধান রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী নিষিদ্ধকরণের দাবিতে। যেহেতু একনিষ্ঠ জামায়াত কর্মীর মতো মাহমুদুর রহমানও মনে করেন জামায়াতের বিরোধিতার অর্থ হচ্ছে ইসলামবিরোধিতা— অতএব গণজাগরণ মঞ্চ হচ্ছে নাস্তিক, মুরতাদ, কাফের, ইসলামের দুষমন, নষ্টদের বেলেল্লাপনার জায়গা। শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে দিনের পর পর দিন হাজার হাজার মানুষের চালমান মহাসমাবেশের কর্মসূচী যখন বিশ্বগণমাধ্যমে আলোচিত ও প্রশংসিত হচ্ছে তখন মাহমুদুর রহমান ও জামায়াত-বিএনপির পত্রিকাগুলো এর প্রতি কুৎসিৎ ভাষায় বিষোদগার অব্যাহত রেখেছে। জামায়াত-বিএনপির পৃষ্ঠপোষকতায় হাটহাজারি মাদ্রাসার হেফাজতে ইসলামের মতো একটি কাগুজে সংগঠনের দানবীয় উত্থানের প্রধান স্থপতি 'উত্তরা ষড়যন্ত্র' সহ বহু ষড়যন্ত্রের নায়ক মাহমুদুর রহমান। বিএনপি-জামায়াতের সব কটি পত্রিকায় হেফাজতের আমীর শাহ আহমদ শফীর বিশাল খোলা চিঠি ছাপা হয়েছে অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে, যেখানে জাগরণ মঞ্চের প্রতি বিষোদগারের পাশাপাশি একে সমর্থনের জন্য বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, অধ্যাপক অজয় রায়, লেখক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল ও আমাকে 'নাস্তিক', 'মুশরিক', 'মুরতাদ' 'কাফের' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যার সরল অর্থ হচ্ছে এরা হত্যার যোগ্য, বা এদের হত্যা করতে হবে। জাফর ইকবাল শুধু গণজাগরণ মঞ্চের সমর্থক নয়, 'প্রথম আলোর'ও একজন নিয়মিত লেখক।

গত ৫ মে ঢাকা অবরোধের নামে জামায়াত-বিএনপির প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে হেফাজতে ইসলাম মহাজোট সরকারকে উৎখাত করে মুনতাসীর মামুনের ভাষায় 'হেজাবি' (হেফাজত-জামায়াত-বিএনপি) সরকার গঠনের মহাষড়যন্ত্র করেছিল। এর আগের দিন ৪ মে বেগম খালেদা জিয়া একই জায়গায় আয়োজিত বিএনপির মহাসমাবেশ থেকে মহাজোট সরকারকে আটচল্লিশ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন— তাদের দাবি না মানলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পালাবার পথ খুঁজে পাবেন না। পরদিন শাপলা চত্বরের মহাসমাবেশ থেকে হেফাজতের নেতারা একই ভাষায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামকে বলেছেন, তিনিও নাকি পরদিন পালাবার পথ খুঁজে পাবেন না। সেদিন ঢাকার প্রাণকেন্দ্র যখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল, হেজাবিদের নজিরবিহীন তান্ডবে সারা দেশ যখন স্তম্ভিত, বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির নেতাকর্মীও ঢাকাবাসীকে বললেন হেফাজতিদের পাশে দাঁড়াবার জন্য। মাহমুদুর রহমানকে হেফাজত-জামায়াত সম্পৃক্তি অথবা ৫ মে'র মহাষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্তির জন্য কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি না আমি জানি না, কিন্তু আমার মতো মামুলি কলাম লেখক মাহমুদুর রহমানের দুর্বৃত্তপনা, দুষ্কর্ম, রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র ও গণবিরোধী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যা জানে আমাদের বিজ্ঞ সম্পাদকরা তা জানেন না এমনটি বিশ্বাস করা কঠিন।

'স্বাধীনতা' ও 'পেশাগত' স্বার্থ উর্ধ্বে তুলে ধরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষের সম্পাদকরা এক মঞ্চে সমবেত হয়েছেন— এটি আমার তরুণ সাংবাদিক বন্ধুদের আশান্বিত করেছে। অনুজপ্রতিম সাংবাদিক প্রভাষ আমিন ও মনজুরুল আহসান বুলবুল ১৫ সম্পাদকের এই অভূতপূর্ব ঐক্যের প্রশংসা করেছেন পেশাগত অবস্থান থেকে। এই ঐক্যকে আমি জেনেবুঝেই 'অভূতপূর্ব' বলছি। ভিন্নমতের সম্পাদকদের এমন ঐক্য আমরা দেখেছিলাম পাকিস্তান আমলে, যখন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী, আবদুস সালাম, শহীদুল্লা কায়সার ও রণেশ দাশগুপ্তের মতো ডাকসাইটে সম্পাদকরা 'পূর্ববাংলা রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেছিলেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে। ১৯৬৪ সালের চেয়েও ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ২০০১ সালে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। এ বিষয়ে লেখার জন্য সেলিম সামাদ, প্রিসিলা, এনামুল ও আমার মতো অনেক ছাপোষা সাংবাদিকের সঙ্গে মুনতাসীর মামুনের মত জাঁদরেল কলামিস্টকেও জেলে যেতে হয়েছিল। জামায়াতের সন্ত্রাসীরা বোমা মেরে মাণিক সাহার মতো সাংবাদিকের মুণ্ডু উড়িয়ে দিয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদ করলেও বাংলাদেশের নমস্য সম্পাদকদের এহেন যুক্ত বিবৃতি তখন নজরে পড়েনি। তখন কেন, অতীতে কোনও জাতীয় দুর্যোগে মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক সম্পাদকদের সঙ্গে রাজাকার-আলবদর-জামায়াতের সমর্থক সম্পাদকদের এহেন যুক্ত বিবৃতি আমরা দেখিনি।

এই বিবৃতির পক্ষে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সম্পাদকরা বলেছেন মাহমুদুর রহমান অপরাধ করেছেন যে বিষয়ে তারা নিঃসংশয় হলেও যে

প্রক্রিয়ায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা সমর্থনযোগ্য নয়। গ্রেফতারযোগ্য অপরাধ যিনিই করুন তাকেই গ্রেফতার করতে হবে— পৃথিবীর যে কোন দেশের সংবিধান এবং আইনের শাসন সংক্রান্ত ধারণা এই বলে। আমাদের মতো ছাপোষা সাংবাদিকদের গ্রেফতার করলে, কারাগারে নিয়ে নির্যাতন করলে, এমনকি হত্যা করলেও যুক্তবিবৃতি দেয়া যাবে না, শুধু মাহমুদুর রহমানের মতো দুর্বৃত্ত অপরাধী মালিক-সম্পাদক গ্রেফতার হলে তার পক্ষে দল বেঁধে একাট্টা হয়ে দাঁড়াতে হবে— এই মানসিকতা হচ্ছে অপরাধ থেকে দায়মুক্তির সেই অপসংস্কৃতি যা বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান এদেশে চালু করেছিলেন। শৈশবে বাল্যশিক্ষায় পড়েছি— 'কানাকে কানা বলিও না', এখন বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে এসে নতুনভাবে শিখছি— মালিক সম্পাদক অপরাধী হলে তাকে গ্রেফতার করা যাবে না। এর শানে নজুল আমার মতো অজ্ঞজনদেরও বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

জামায়াত জানে মাহমুদুর রহমানের গ্রেফতার এবং 'আমার দেশ'-এর অবর্তমানে প্রচারযুদ্ধে তাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা আরও জানে তাদের নিজেদের পত্রিকা দৈনিক 'সংগ্রাম' ও 'নয়াদিগন্তে'র বিশ্বাসযোগ্যতা শূন্যের কোঠায়। তাই তারা ভর করেছে 'প্রথম আলো'র কাঁধে। মাহমুদুর রহমানকে মহিমান্বিত করার অর্থ হচ্ছে জামায়াত-হেফাজতের রাজনীতি মহিমান্বিত করা। মাহমুদুর রহমানের যাবতীয় কর্মকাণ্ড গত কয়েক মাসের জামায়াত-হেফাজতের যাবতীয় তাণ্ডব, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, হত্যা ও ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্র তৈরি করেছে, প্ররোচনা জুগিয়েছে যা দেশের প্রচলিত আইনে জামিন অযোগ্য অপরাধ। এসব অপরাধ যে কোনও পেশার মানুষই করতে পারে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের কথা বলে অপরাধের পক্ষে দাঁড়ানো কোনও বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। যাদের আমরা জাতির বিবেক বিবেচনা করি তাদের পক্ষে তো কখনোই নয়।

'প্রথম আলো' এ বছরের শুরুতে (৫ জানুয়ারি ২০১৩) একটি পাঠক জরিপ করেছিল। যেখানে বলা হয়েছিল দেশের ৫৮% মানুষ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের পক্ষে। তখনও গণজাগরণ মঞ্চ হয়নি, সাঈদীর মামলার রায় ঘোষিত হয়নি, জামায়াতের ভয়াবহ তাণ্ডব এবং জামায়াতের প্রতি জনঘৃণা তখনও এত তীব্র হয়নি। 'প্রথম আলো'র জরিপ সম্পর্কে তখন আমি মন্তব্য করেছিলাম, এই জরিপে যদি 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ' না বলে শুধু 'জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ' করার কথা বলা হত আমার ধারণা শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ জামায়াতের বিরুদ্ধে মত দিতেন। (জনকণ্ঠ, ১৯ জানুয়ারি ২০১৩)

৫ মে'র তাণ্ডব ও সন্ত্রাসের পর যখন জামায়াতের যাবতীয় গণবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্ত সবার কাছে ধরা পড়ে গেছে, যখন জামায়াত অতীতের যে কোনও সময়ের তুলনায় কোণঠাসা অবস্থায়— ঠিক তখনই 'প্রথম আলো'র ১১ মে'র জনমত জরিপে আমরা জানলাম দেশের ৬৪.৮% মানুষ জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে এবং দেশের ৫৭.৫% মানুষ গণজাগরণ মঞ্চের বিপক্ষে। এ বিস্ময়কর জরিপ নিয়েও সমালোচনা কম হয়নি। জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে এটুকু

বলতে পারি শুধু আওয়ামী লীগ, মহাজোট বা মহাজোটের বাইরের বাম দলগুলো নয়, অধিকাংশ ধর্মভিত্তিক দল এবং বিএনপিরও একটি বড় অংশ নিজ নিজ অবস্থান থেকে জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের পক্ষে। জামায়াত নিষিদ্ধকরণের প্রক্রিয়া মন্থর হওয়ার নেপথ্যে বিএনপির নিরব আগ্রহ একটি বড় কারণ বলে মনে করেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকে। জামায়াতের এই চরম সংকট মুহূর্তে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন 'প্রথম আলোর' আলোকিত সম্পাদক মতিউর রহমান, যার ক্ষমতা ও প্রভাব সম্পর্কে জামায়াতও বিলক্ষণ অবগত রয়েছে। যে কারণে জামায়াতের মনে হয়েছে মাহমুদুর রহমানের অসমাপ্ত কাজ মতিউর রহমানের পক্ষে আরও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব। আমি নিশ্চিত জানি মাহমুদুর রহমানের মুক্তিকে কেন্দ্র করে ভিন্নমতের সম্পাদকদের এক মঞ্চে সমবেত করা 'সংগাম', 'নয়া দিগন্ত' বা 'ইনকিলাব'-এর পক্ষে সম্ভব নয়। এ কাজ বাংলাদেশে একজনই করতে পারেন এবং তিনি আমাদের সবার প্রিয় মতি ভাই, বাংলাদেশের সবচেয়ে জাঁদরেল সম্পাদক অঘটনঘটনপটিয়সী মতিউর রহমান।

পনের সম্পাদকের যুক্ত বিবৃতি তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে বিস্মিত করলেও পরে যখন অন্য সম্পাদকদের সঙ্গে কথা বলেছি, জামায়াতের রণকৌশল বোঝার চেষ্টা করেছি, তখন বিস্ময় কেটে গেছে। জামায়াত যদি 'ইকোনমিস্ট', 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'আল জাজিরা', 'বিবিসি', 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' আর 'ইন্টারন্যাশনাল বার এসোসিয়েশনের মতো গণমাধ্যম, মানবাধিকার সংগঠন ও পেশাজীবী সংগঠনকে প্রভাবিত করে তাদের পক্ষে ব্যবহার করতে পারে, 'প্রথম আলো'কে কেন পারবে না? টাইম ম্যাগাজিনে বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে অ্যালেক্স পেরীর রূপকথা আমরা ভুলে যাইনি।

মতি ভাই জামায়াতের টাকা খেয়ে এমন কাজ করেছেন আমি তা বলছি না। হয়ত বেগম জিয়া কিংবা তার চেয়েও প্রভাবশালী কোনও মহল থেকে তাকে অনুরোধ করা হয়েছে মাহমুদুর রহমানের পক্ষে বিবৃতি প্রদান ও আয়োজন করবার জন্য। কারণ বিবেকের তাড়ানায় স্বতস্ফূর্ত হয়ে কেউ এমন কাজ করতে পারেন না। মাহমুদুর রহমান এবং তার পত্রিকা হেফাজত-জামায়াত-বিএনপির অশুভ ত্র্যহস্পর্শের মুখপত্র। মাহমুদুর রহমান শুধু বাংলাদেশের ফৌজদারি আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ করেননি। তিনি 'এথনিক, ক্লেনজিং'-এর রাজনৈতিক ও আদর্শিক ক্ষেত্র তৈরি করে আন্তর্জাতিক আইনেও দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন। তার পক্ষে দাঁড়ানোর অর্থ হচ্ছে— মিথ্যাচারের পক্ষে দাঁড়ানো, '৭১-এর গণহত্যাকারীদের পক্ষে দাঁড়ানো, ফ্যাসিবাদের পক্ষে দাঁড়ানো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। '৭১-এর মতো কেউ ইসলামের দোহাই দিয়ে আরেকটি গণহত্যার ক্ষেত্র তৈরি করবেন— বাংলাদেশে কেন, পৃথিবীর কোন দেশেই তা কাম্য হতে পারে না। আশা করব আমাদের বরেণ্য সম্পাদকরা ভবিষ্যতে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের পক্ষে না দাঁড়িয়ে মানবতার পক্ষে দাঁড়াবেন।

মাহমুদুর রহমানের গ্রেফতারের দাবি প্রথম জানিয়েছিল গণজাগরণ মঞ্চ, তাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক মিথ্যাচারের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং জঙ্গী

মৌলবাদকে উস্কানি প্রদানের জন্য। জাগরণ মঞ্চ এ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মারকপত্রও দিয়েছিল। মাহমুদুর রহমান যে অপরাধ করেছেন তার জন্য আরো আগেই তাকে গ্রেফতার করা উচিৎ ছিল। কারণ তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবে সমাজে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হানাহানির জমিন তৈরি করছিলেন।

আমরা একুশ বছর ধরে জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের জন্য আন্দোলন করছি। ট্রাইবুনাল গঠনের পর থেকে সরকারকে বলছি '৭১-এর গণহত্যা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য ব্যক্তির পাশাপাশি দলেরও বিচার করতে হবে। সরকার আমাদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করেনি। শাহবাগের চত্বরে ছাত্রজনতার মহাজাগরণের দাবির পর সরকার সংগঠনের বিচার করবার জন্য ট্রাইবুনালের আইন সংশোধন করেছে। ৫ মে'র হেজাবিদের সরকার উৎখাতের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন হেফাজত ও জামায়াতকে আর ছাড় দেয়া হবে না। ৬ মে হেফাজতিদের শাপলা চত্বর থেকে বিদায় করবার পাশাপাশি পুলিশ শাহবাগে গণজাগরণ মঞ্চ ভেঙে গোটা রাস্তা সাফ করে দিয়েছে। গণজাগরণ মঞ্চ ভাঙার সংবাদে হেজাবিরা নিশ্চয় খুশি হয়েছে, আমরা বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছি। মহাজোট সরকারের নেতা ও নীতিনির্ধারকরা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ শক্তির দ্বৈরথে সরকার নিরপেক্ষ থাকবে এটা কখনও আমাদের কাম্য নয়।

ট্রাইবুনালে এখন ধরাছোঁয়ার বাইরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে— জামায়াত, রাজাকার, আলবদররের বিচার কেন হচ্ছে না এটাও আমাদের বোধগম্য নয়। হেফাজত ও জামায়াতের প্রতি সরকার সদয় হলেও হেজাবিরা ৫ মে'র চেয়েও মহাষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করছে। যে সব সংবাদপত্র নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করতাম সে সবের সম্পাদকরা দেশ ও জাতির আসন্ন মহাদুর্যোগে কোন পক্ষে থাকবেন আমরা জানি না। তাদের কয়েকজন কমরেড ৫ মে শেষ রাতে শাপলা চত্বরে '৭১-এর চেয়েও ভয়াবহ গণহত্যার বিবরণ দিয়েছেন তাদের সংবাদপত্রে। ৫ মে যদি শাপলা চত্বরে '৭১-এর গণহত্যা হয় আগামীতে আমরা বাংলাদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হলোকস্ট-এর আশংকা করছি। জাতির বিবেক যদি লুসিফারের কাছে বন্ধক থাকে সে জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শংকা প্রকাশের যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

২৮ মে ২০১৩

জামায়াতের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ঃ বিপন্ন ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী যখন '৭১-এর গণহত্যাকারী, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগে গ্রহণ করেছে তখন থেকে এই বিচার সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এটি বানচালের জন্য জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের সহযোগীরা দেশে ও বিদেশে বহুমাত্রিক চক্রান্ত করছে। বহুবার আমরা এসব চক্রান্ত সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করেছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল মেয়াদ শেষ হতে চলেছে— এখনও সরকারি পর্যায়ে এসব চক্রান্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও কূটনৈতিকভাবে মোকাবেলা করবার কোন উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়।

গত চার বছরে '৭১-এর গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বলবার জন্য দুই ডজনেরও বেশি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে আমাকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। কয়েকটি সেমিনারে ও শুনানিতে 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র অন্যান্য নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। কদাচিৎ আমরা সরকার কিংবা সরকারি দলের কোনও প্রতিনিধিকে এসব সম্মেলন বা শুনানিতে অংশ নিতে দেখেছি। গত ২-৮ জুলাই লন্ডনে এবং ৯-১৯ জুলাই ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারায় প্রায় দুই ডজন সেমিনার, দ্বিপাক্ষিক মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছে, যার মূল বিষয় ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব, বিভ্রান্তি নিরসন, বিচারের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সঙ্গে বর্তমান বিশ্বে ইসলামের নামে জঙ্গী মৌলবাদের উত্থান।

৪ জুলাই লন্ডনে 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং শাহবাগ আন্দোলন' বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল ডাচ এনজিও 'ইন্টারন্যাশনাল কমিটি ফর ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ' এবং 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র যুক্তরাজ্য শাখা। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদ্যোক্তারা বলেছেন, (১) যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামী এবং সহযোগীদের মিথ্যা প্রচারণার স্বরূপ উন্মোচন, (২) বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর সাম্প্রতিক হামলা প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ এবং (৩) যুদ্ধাপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চকে সমর্থন। লন্ডন সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের প্রথম দুটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মিশ্র সমর্থন থাকলেও শেষোক্তটি অধিকাংশের জন্যই ছিল বিব্রতকর, কারণ ইউরোপের ক্ষমতাধর দেশগুলো মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে না।

লন্ডন সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এডভোকেট সুলতানা কামাল, গণজাগরণ মঞ্চের একজন প্রতিনিধি ও আমাকে। দেরিতে আমন্ত্রণপত্র আসার জন্য ভিসা না পাওয়ায় গণজাগরণ মঞ্চের প্রতিনিধি

সম্মেলনে অংশ নিতে পারেননি। সুলতানা কামাল ও আমি মানবাধিকার কর্মী ছাড়াও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের আসামী জামায়াত নেতা গোলাম আযম ও আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে মামলার অন্যতম সাক্ষী। নেদারল্যান্ড থেকে এসেছিলেন উদ্যোক্তা সংগঠনের ডঃ পিটার কাস্টার্স ও বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া। লন্ডন থেকে ছিলেন গণহত্যা বিশেষজ্ঞ ডেভিড রাসেল ও যুক্তরাজ্য নির্মূল কমিটির নেতা আনসার আহমদউল্লাহ। নির্ধারিত বক্তৃতার বাইরে রাখা হয়েছিল শ্রোতাদর্শকদের জন্য অত্যন্ত প্রাণবন্ত মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর।

আমার বক্তব্যের বিষয় ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে পশ্চিমে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও বিভ্রান্তির জবাব এবং বিচারের প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিকতা। গত বছর ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এক শুনানিতেও এসব বিষয়ে বলতে হয়েছে। গতবার লন্ডনে যুক্তরাজ্যের লর্ড সভার সদস্য এবং বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম উপদেষ্টা লর্ড কার্লাইলের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ঢাকার আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে কেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনের কোন বিচারক রাখা হয়নি, কেন বৃটিশ আইনজীবীকে ট্রাইবুনালে অভিযুক্ত তার মক্কেলের জন্য ওকালতি করতে দেয়া হয়নি। প্রশ্নেই বোঝা যায় লর্ড কার্লাইল কীভাবে জামায়াতের মিথ্যা প্রচারণার শিকার হয়েছেন। তাকে বলেছিলাম, ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল কোন আন্তর্জাতিক আদালত নয়। আমাদের দেশীয় আইনের অধীনে গঠিত সম্পূর্ণভাবে একটি দেশীয় আদালত। লর্ড কার্লাইল জানতে চেয়েছিলেন, তাহলে আমরা আদালতের নামের সঙ্গে আন্তর্জাতিক শব্দটি কেন যুক্ত করেছি। তাকে বলেছি, গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ আন্তর্জাতিক আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। বাংলাদেশের মাটিতে সংঘটিত এ ধরনের আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালে আমাদের সরকার 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন' প্রণয়ন করেছিল। আইনে এই অপরাধগুলো সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়েছে বাংলাদেশ এর বিচার কীভাবে করবে। ঢাকার ট্রাইবুনাল হচ্ছে কতিপয় আন্তর্জাতিক অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচারের জন্য গঠিত একটি দেশীয় আদালত। লর্ড কার্লাইলকে আরও বলেছিলাম, প্রত্যেক দেশের বিচার ব্যবস্থা সে দেশের মানুষের সভ্যতার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সামাজিক মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত। আমি আমার সংস্কৃতি ও জীবনবোধ যেমন অন্য দেশ ও সমাজের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না, একইভাবে আমরা আশা করি অন্যরা আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন।

এ সব কথা এবারও বলতে হয়েছে লন্ডন সম্মেলনে এবং সম্মেলনের পর ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইন প্রণেতাদের সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠকে। লন্ডনের আয়োজকরা আগে থেকেই এসব বৈঠকের দিনক্ষণ নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। ৫ জুলাই প্রথম বৈঠক ছিল প্রভাবশালী বৃটিশ এমপি সাইমন হিউজের সঙ্গে। আমাদের দলে ছিলেন এডভোকেট সুলতানা কামাল, ডঃ পিটার কাস্টার্স, বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া, আনসার আহমদউল্লা ও মিহির সরকার। সাইমন আমাদের কথা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে শুনেছেন। জামায়াতের জঙ্গী সম্পৃক্তি এবং উগ্র মৌলবাদী হেফাজতে ইসলামের উত্থান

সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেননি। বিচারের যৌক্তিকতা সম্পর্কে তিনি সহমত পোষণ করলেও শাস্তি সম্পর্কে তার অবস্থান অন্য সবার মতোই অনড়— বৃটেন মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে না।

লন্ডনে অবস্থানকারী অভিযুক্ত গণহত্যাকারী চৌধুরী মঈনুদ্দিনের বিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সুলতানা কামাল তাকে বলেছেন, মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকার জন্য আপনি বলছেন চৌধুরী মঈনউদ্দিনকে আপনারা বাংলাদেশের হাতে প্রত্যার্পণ করবেন না। আমরা আপনাদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বাংলাদেশের ট্রাইবুনালে যদি মঈনুদ্দিনের অপরাধ প্রমাণিত হয় বৃটেনের আদালতে কি আপনারা তার বিচার করবেন?

সাইমন হিউজ বলেছেন, বৃটেনে এ ধরনের বিচারের কোন নজির নেই। আমি বললাম, '৭১-এ চৌধুরী মঈনুদ্দিনের বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পর্কে চ্যানেল ফোরে যখন 'ওয়ার ক্রাইমস ফাইল' প্রদর্শিত হয় তখন এ নিয়ে বৃটিশ পার্লামেন্টেও আলোচনা হয়েছিল। লেবার পার্টির এমপি উনা কিং তখন বলেছিলেন, বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত কিছু ব্যক্তি বৃটেনে এসে আশ্রয় নিয়েছে, যাদের প্রচলিত আইনে বিচার করা যায় এবং করা উচিৎ। তার এই বক্তব্য পার্লামেন্টের ধারাবিবরণী থেকে আমার একাধিক লেখায় উল্লেখ করেছি। এ বিষয়ে সাইমন কোন মন্তব্য করেননি।

প্রাক্তন লেবারমন্ত্রী এবং আরেক প্রভাবশালী এমপি জিম ফ্রিজপ্যাট্রিক যখন মন্ত্রী ছিলেন, বৃটিশ প্রশাসনে মুসলিম মৌলবাদীদের অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। গত বছর আমরা তাকে হিজবুত তাহরীর-এর কর্মকাণ্ড এবং লন্ডনে বসে বাংলাদেশে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বলেছিলাম। বিষয়টি তিনি পার্লামেন্টে উত্থাপন করেছিলেন। এবার জিম বললেন, আপনাদের আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। আপত্তি শুধু অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড প্রদানের দাবি সম্পর্কে। শাহবাগে আপনারা যেভাবে মৃত্যুদণ্ডের দাবি করছেন এটা সমর্থনযোগ্য নয়। এতে ট্রাইবুনালের উপর চাপ দেয়া হচ্ছে।

তাকে বললাম, শাহবাগের তরুণরা মুক্তিযোদ্ধাদের এবং '৭১-এর শহীদদের সন্তান। মৃত্যুদণ্ডের বিধান যেহেতু আমাদের বিচার ব্যবস্থায় আছে— ভিকটিমদের পক্ষ থেকে তারা গণহত্যাকারীদের চরম শাস্তি দাবি করতেই পারে। অপরদিকে জামায়াত বলছে— এই ট্রাইবুনাল ও আইন তারা মানে না, বিচারকরা পক্ষপাতদুষ্ট। সাক্ষীদের তারা ভয়ভীতি দেখাচ্ছে, বিদেশে অপপ্রচার চালাচ্ছে। বিচার বন্ধের জন্য শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে তারা লবিস্ট নিয়োগ করেছে। বরং জামায়াতই ট্রাইবুনালকে প্রচণ্ড চাপের ভেতর রেখেছে। কিন্তু ট্রাইবুনাল সকল চাপ উপেক্ষা করে বিচার কার্যক্রম অব্যহত রেখেছে। জিম বললেন, জামায়াত ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে তিনি সব সময় পাশে থাকবেন।

জামায়াতের জঙ্গী সম্পৃক্তি এবং বিশ্বব্যাপী জঙ্গী মৌলবাদের সাম্প্রতিক উত্থান সম্পর্কে আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ডঃ চার্লস ট্যানক। এ বিষয়ে তাকে আমাদের প্রকাশনা ও প্রামাণ্যচিত্রগুলো প্রদান করেছি। তাকে আরও বলেছি, ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার।

তুরস্ক থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মুসলমানপ্রধান দেশগুলার সর্বত্র মৌলবাদীরা কিংবা মৌলবাদের প্রতি সহানুভূতিশীলরা ক্ষমতায়। ওআইসির দেশগুলোর ভেতর বাংলাদেশ হচ্ছে একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে এখনও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তি ক্ষমতায় রয়েছে। মৌলবাদের জঙ্গী সন্ত্রাস থেকে ইউরোপকে মুক্ত রাখতে হলে যে সব দেশে মৌলবাদীরা শক্তিশালী ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচিৎ সে সব দেশের মৌলবাদবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীদের সমর্থন করা।

চার্লাস ট্যানক আনসার, বিকাশ ও পিটারকে বললেন, এ বিষয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের কোন কোন সদস্যের সঙ্গে তাদের আলোচনা করতে হবে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টে আমাদের আরও ব্যাপক ও কার্যকর লবিং-এর কথা বললেন তিনি।

বৃটিশ আইনসভার প্রবীণ সদস্য লর্ড এরিক এভবরি বাংলাদেশের মানবাধিকার সম্পর্কে সর্বদা উচ্চকণ্ঠ। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের উপর যে নজিরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছিল তখন আমাদের অনুরোধে লন্ডনে তিনি তিনটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করে এর প্রতিবাদ করেছিলেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আরম্ভ হওয়ার পর বিলেতে জামায়াতের বৃটিশ আইনজীবী ও ভাড়াকরা মানবাধিকার কর্মীরা লর্ড এভবরিকে এমনই প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত করেছে গতবার তাকে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলাম, আপনি সব সময় গণহত্যার প্রতিবাদ করেছেন। আমার 'ওয়ার ক্রাইমস সেভেন্টি ওয়ান' ছবিতে বলিষ্ঠভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে বলেছেন। আমি জানি না কী কারণে এখন ভিকটিমদের চেয়ে গণহত্যাকারীদের মানবাধিকারের বিষয়টি আপনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আমার উপর বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদ করেছেন লর্ড এভবরি। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন। তাকে কেউ জামায়াতের সমর্থক বললে আমারও গায়ে লাগে। তবে আইসিটি সম্পর্কে তার ভ্রান্ত ধারণা আমরা দূর করতে পারিনি। এবার তার সঙ্গে বৈঠকে এডভোকেট সুলতানা কামাল থাকাতে আমাদের সুবিধে হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক কমিশনের চেয়ারম্যান ও কো-চেয়ার হচ্ছেন লর্ড এভবরি ও সুলতানা কামাল। আমরা তাকে হেফাজতের সাম্প্রতিক উত্থান এবং হেফাজতের জামায়াত সম্পৃক্তির যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করে বললাম, জামায়াত কীভাবে বাংলাদেশে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ফিরিয়ে আনতে চায়। হেফাজতের ১৩ দফার অন্যতম লক্ষ্য পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীরা— এটি জেনে লর্ড এভবরি খুবই বিব্রত হলেন। সুলতানা কামাল হেফাজতের নারীবিদ্বেষী অবস্থানের কথাও বললেন।

এবারই প্রথম জামায়াত সম্পর্কে লর্ড এভবরিকে উদ্বিগ্ন মনে হল। তিনি বলেছেন, ওদের হেইট ক্যাম্পেইনগুলো কি তোমরা সূত্র সহ আমাকে দিতে পারবে? সুলতানা কামাল বললেন, শাহরিয়ারদের কাছে সব তথ্য আছে। আমি বললাম, আমরা হেফাজতে ইসলাম সম্পর্কে শিগগরিই একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করব। আপনি যা চাইছেন সবই ওতে পাবেন।

বৃটিশ আইনপ্রণেতা ও ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও এবার লন্ডন সম্মেলনে বাংলাদেশী বিভিন্ন মানবাধিকার ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও আমাদের মতবিনিময় হয়েছে। হেফাজতের সাম্প্রতিক উত্থান এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের নমনীয় মনোভাবে সবাই উদ্বিগ্ন। আমি তাদের বলেছি, যদি কোনওভাবে হেফাজত-জামায়াত-বিএনপি ক্ষমতায় আসতে পারে— ২০০১ সালে তারা যা করেছিল এবার তার শতগুণ করবে। আওয়ামী লীগ অনেক সমালোচনার কাজ করেছে। কিন্তু গত চার বছরে অর্থনীতি, শিক্ষা, সামাজিক উন্নয়ন, কৃষি, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ সরকার যে সাফল্য প্রদর্শন করেছে এর আগে কোন সরকার তা করতে পারেনি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করতে হলেও মহাজোটকে আবার ক্ষমতায় আসতে হবে। হেফাজত ও জামায়াত সম্পর্কে ৬ মে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এদের আর ছাড় দেয়া হবে না। সরকার এ ক্ষেত্রে অনমনীয় হলে মহাজোট অবশ্যই ক্ষমতায় আসবে। হেফাজত-জামায়াতের সঙ্গ না ছাড়লে বিএনপিকে মানুষ বিজয়ী করবে না।

লণ্ডন সম্মেলনের সফল উদ্যোক্তাদের সঙ্গে তাদের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সম্মেলনে গণজাগরণ মঞ্চের কেউ অংশ নিতে পারেননি এটি তাদের কিছুটা হতাশ করেছে। তাদের বলেছি আপনারা এ বছরের শেষে বাংলাদেশের শাহবাগ চত্বর, মিশরের তাহরির এবং তুরস্কের তাকসিম স্কয়ারের তরুণ নেতাদের নিয়ে একটি সম্মেলন করতে পারেন।

বিকাশ ও পিটার নীতিগতভাবে আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন। তারা জানতে চেয়েছেন মিশর ও তুরস্ক থেকে কারা আসবেন। গত মাসে মিশর সফরকালে তাহরির স্কয়ারের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তুরস্কে তাকসিমের নেতাদের সঙ্গে কথা হবে।

তরুণরা সব দেশে সব সময়ে সমাজবিপ্লবে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করেছে, নেতৃত্ব দিয়েছে। শাহবাগ, তাহরির ও তাকসিমের তরুণরা মৌলবাদীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, অকাতরে জীবন দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির উচিৎ এদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। এই তরুণরাই আগামী দিনে মুসলিম বিশ্বের মৌলবাদীকরণের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে। এরাই আমাদের স্বপ্ন, আমাদের ভবিষ্যৎ।

দুই

লন্ডনে ১৩ জুলাই পর্যন্ত নির্ধারিত কয়েকটি বৈঠক সুলতানা কামালের জন্য রেখে ৯ জুলাই আমি প্রথমে ইস্তাম্বুল এবং পরে আঙ্কারা গিয়েছি প্রধানতঃ সরকারি কাজে। ২০০৯ সালে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশের যেসব বিশিষ্ট নাগরিক, সরকার ও প্রতিষ্ঠান আমাদের সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিল তাদের সম্মাননা প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ দীপু মনিকে প্রধান করে যে জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে আমি তার একজন সদস্য। কমিটির গত বৈঠকে আমি বলেছিলাম, জামায়াত ওআইসির বিভিন্ন দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে ব্যাপক অপপ্রচার চালাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এসব দেশের সরকার পাকিস্তানি

সামরিক জান্তার গণহত্যা সমর্থন করলেও সেখানকার ধর্মনিরপেক্ষ প্রগগতিবাদী শক্তি নিশ্চয় তাদের সরকারের বাংলাদেশবিরোধী অবস্থান সমর্থন করেনি। তখন পাকিস্তানেও এমন কিছু বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার নেতা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমরা জানি গণহত্যার প্রতিবাদ করে যারা কারানির্যাতন সহ নানা ধরনের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শিকার হয়েছিলেন। তাদের কয়েকজনকে গত ২৫ মার্চের সম্মাননাপ্রদান অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মিশর ও তুরস্কে জামায়াতের সমমনারা ক্ষমতায়। তুরস্কের রাষ্ট্রপতি গত বছর ডিসেম্বরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিরুদ্ধে তার মনোভাব ব্যক্ত করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখেছিলেন। এরপর সেখানকার সরকার সমর্থক কিছু আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী ঢাকায় এসে বিনা অনুমতিতে ট্রাইবুনাল পরিদর্শন করে, গোলাম আযম ও তার আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে দেশে ফিরে অত্যন্ত নেতিবাচক ও উস্কানিমূলক বিবৃতি দিয়েছেন, যা জামায়াতের কাগজে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। আমার প্রস্তাব ছিল এ সব দেশে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করা দরকার। যারা তাদের দেশে জামায়াতের এসব অপতৎপরতার জবাব দিতে পারবেন। মূলতঃ এ উদ্দেশ্যেই আমার সাম্প্রতিক মিশর ও তুরস্ক সফর।

তুরস্কে যাওয়ার আগেই আমাদের রাষ্ট্রদূত জুলফিকার রহমান '৭১-এর দৈনিক পত্রিকা ঘেঁটে বাংলাদেশ সম্পর্কে তখন যে সব খবর বেরিয়েছে সেগুলো ইংরেজি অনুবাদ সহ সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সময়সূচি তৈরি করে রেখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় 'বিশ্বশান্তি পরিষদ' বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সংগঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আমি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আবুল কাশেমের মাধ্যমে গত মাসে তুরস্কের শান্তি পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। ১০ জুলাই ইস্তাম্বুলে আমার সঙ্গে প্রথম বৈঠক হয়েছিল তুরস্কের শান্তি পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ নেতা আয়েদিমির গুলেরের সঙ্গে।

আয়েদিমির আগেই জানিয়েছিলেন '৭১-এ তুরস্কে এক ধরনের গৃহযুদ্ধ চলছিল। প্রগতিশীল শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক জান্তার ধারবাহিক হামলা ও নির্যাতনের কারণে অন্য দেশে কী ঘটছে সে বিষয়ে শান্তি পরিষদের কিছু জানবার বা করবার সুযোগ ছিল না। তাছাড়া তখন তুরস্কের শান্তি পরিষদ সাংগঠনিকভাবেও খুব একটা শক্তিশালী ছিল না।

আয়েদিমির আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন নাজিম হিকমত কালচারাল সেন্টারে। দেড়শ বছরের পুরোনো জমিদার বাড়িতে বিরাট আঙ্গিনায় ইস্তাম্বুলের বামপন্থী ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক, শিল্পী, চলচ্চিত্রনির্মাতা, থিয়েটারকর্মী, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদদের বিশাল মেলা। আঙ্গিনা জুড়ে বহু টেবিল চেয়ার পাতা, পাশে রেস্তোঁরা। চা আর কফির সঙ্গে সধুম আড্ডায় আমিও শরিক হলাম। আমাকে ঘিরে ধরলেন সেন্টারের পরিচালক সহ তাকসিম স্কয়ারের তরুণ নেতারা। ইস্তাম্বুল যাওয়ার আগেই আমি আয়েদিমিরকে জানিয়েছিলাম ঢাকার শাহবাগ ও মিশরের তাহরির স্কয়ারের

আদলে গত মাসে (জুন ২০১৩) গড়ে ওঠা ইস্তাম্বুলের তাকসিম স্কয়ারে তারুণ্যের অভ্যুত্থান সম্পর্কে আমি জানতে চাই এবং নেতাদের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করতে চাই। আয়েদিমির আমার জন্য এইচডি ক্যামেরা সহ ক্যামেরাম্যান উমুত সেলিককে বলে রেখেছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, তুরস্ক ও বাংলাদেশে ধর্মীয় মৌলবাদের সাম্প্রতিক উত্থান এবং তাদের গ্লোবাল নেটওয়ার্ক, দেশে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ মানবাধিকারের সংগ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে তুরস্কের ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারায় যাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তাদের ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন রিপাবলিকান পিপল্স পার্টির ডেপুটি চেয়ারম্যান ওসমান ফারুক লাগোগলু, মানবাধিকার নেত্রী ভাসফিয়ে জামান, টার্কিশ পেন সেন্টারের সভাপতি তারিক গুনেরসেল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, তুরস্কের সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি তুর্গে ওলচেটো সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, রাইটার্স সিন্ডিকেটের সভাপতি মুস্তফা কোজ ও অন্যান্য লেখক, বিলগি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়াজি দালিয়ানজি, প্রবীণ লেখক, সাংবাদিক ও জাতিসংঘের সাবেক আমলা ডঃ হিফজি টপুয সহ সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, মওলানা জালালউদ্দিন রুমীর মাজার ও কালচারাল সেন্টারের কর্মকর্তাবৃন্দ। এ ছাড়া অন্যতম প্রধান দৈনিক সোল, দৈনিক ইয়েনিগুণ, দৈনিক এভরেনসেল ও হায়াৎ টেলিভিশন আমার বিশেষ সাক্ষাৎকার সহ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন ছেপেছে। ১৫ জুলাই কোনিয়ার দৈনিক ইয়েনিগুণ-এর প্রথম পাতার প্রধান সংবাদ শিরোনাম ছিল আমার তুরস্ক সফর সহ বাংলাদেশ ও তুরস্কের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য।

প্রধান বিরোধী দল কামাল আতাতুর্কের অনুসারী রিপাবলিকান পিপলস পার্টির ডেপুটি চেয়ারম্যান ওসমান ফারুক পেশায় কূটনীতিক। ১৯৭৭ সালে ঢাকায় তুরস্কের প্রথম রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছেন। অবসরের আগে যুক্তরাষ্ট্রে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। অবসরের পর রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক তুরস্কের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠ, ক্ষমতাসীন জাস্টিস এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (এ. কে.) পার্টির কঠোর সমালোচক। বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে তুরস্কের রাষ্ট্রপতির চিঠির বিষয়ে ওসমান ফারুক বললেন, আমরা পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্টের এই অনভিপ্রেত কাজের কঠোর সমালোচনা করেছি। আমি বলেছি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ নিয়ে কোন মন্তব্য করা, বিচারের সমালোচনা করে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে চিঠি লেখা আমাদের প্রেসিডেন্টের উচিৎ হয়নি।

আমি জানতে চেয়েছিলাম— আপনার এই বক্তব্য কি কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে?

ওসমান ফারুক বললেন, পত্রিকায় নিশ্চয় ছাপা হয়েছে। আপনি চাইলে আমি পার্লামেন্টের ধারাবিবরণীর কপি পাঠিয়ে দেব। এরপর তিনি সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে বললেন— তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষতা এখন বড় ধরনের হুমকির মুখে। রাজনীতি ও সমাজে ব্যাপকভাবে ইসলামীকরণ আরম্ভ হয়েছে। ক্ষমতাসীনরা তুরস্ককে অতীতের ইসলামী ধারায় নিয়ে যেতে চাইছেন। পাঠ্যসূচিতে ধর্মশিক্ষা ও কোরান বাধ্যতামূলক

করা হয়েছে। টেলিভিশনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বেড়েছে। অধিকাংশ টেলিভিশন ও সংবাদপত্র সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে। সরকারের সমালোচনা করলে সন্ত্রাসের অভিযোগে গ্রেফতার করা হচ্ছে। এ. কে. পার্টির হাইব্রিড ইসলাম তুরস্ককে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ভেবে আমি অত্যন্ত শঙ্কিত। আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে নই, তবে আমি মনে করি রাজনীতিতে ধর্মের কোনও জায়গা থাকা উচিৎ নয়।

ওসমান ফারুক এ কথাও বললেন, আধুনিক তুরস্কে তিন প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশে। ১৯২৭ সালে কামাল আতাতুর্ক রাষ্ট্রের অন্যতম নীতি হিসেবে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজন করে সকল ধর্মভিত্তিক সংগঠন নিষিদ্ধ করেছিলেন। পরে তুরস্ক কামাল আতাতুর্কের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তিনি আরও জানালেন, বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামী কিংবা মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে তুরস্কের ক্ষমতাসীন এ. কে. পার্টির সম্পর্ক ও ভালবাসা গোপন কোন বিষয় নয়। গত বছর জামায়াতে ইসলামীর নেতারা তুরস্ক সফর করে এ. কে. পার্টির নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। দুদিন আগে মিশরের ক্ষমতাচ্যুত মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এরদোগান বলেছেন, মুরসি আমার প্রেসিডেন্ট। এই বলে হা হা করে হাসলেন ওসমান ফারুক।

আমি মন্তব্য করলাম, আমরা তো জানি তুরস্ক একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। মিশরের প্রেসিডেন্ট কীভাবে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর প্রেসিডেন্ট হন? শুনে তিনি দ্বিগুণ হাসলেন।

তুরস্কে সাংবাদিক নির্যাতনের কথা বিস্তারিতভাবে বলেছেন সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট তুর্গে ওলচেটো ও প্রবীণ সাংবাদিক অধ্যাপক নিয়াজী দালিয়ানজি। ইস্তাম্বুলের কাওয়াললুতে সাংবাদিক ইউনিয়নের বিশাল কার্যালয়। বর্তমানে ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা ৩৬০০। এটি ছাড়া বামদের ছোট ছোট কয়েকটি ইউনিয়ন আছে, তবে মূল ইউনিয়নে সব মতের সাংবাদিকরাই সদস্য। তুরস্কে ১৯৬১ সালে সংবিধান সংশোধন করে সাংবাদিকদের কিছু অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, তার ভেতর আইডেন্টিটি কার্ড প্রদান একটি। কার্ড থাকলে সাংবাদিকদের অনেক সুযোগ সুবিধা দিতে হবে— সেজন্য এখন সাংবাদিকদের খণ্ডকালীন বা কর্মনবীশ করে রেখে দেয়া হয়, স্থায়ী করা হয় না। সরকারের সমালোচনা করলে সাংবাদিকদের চাকরি চলে যায়, নইলে জেলে যেতে হয়। ওলচেটো জানালেন, এখন কেউ চাকরি হারাতে বা জেলে যেতে চায় না। বহু সিনিয়র সাংবাদিক জেলে। তাকসিম স্কয়ারের ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে ৬০ জন সাংবাদিক পুলিশের দ্বারা নিগৃহীত ও নির্যাতিত হয়েছেন। ফ্রিডম রেডিওর সাংবাদিক ফুসুন আরদোয়ান সাত বছর ধরে জেলে, এখন পর্যন্ত চার্জশিট দেয়া হয়নি, মামলাও শুরু হয়নি। তুরস্কের সাংবাদিকদের অবস্থা চীন ও রাশিয়ার চেয়েও খারাপ।

সাংবাদিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতার ও নির্যাতনের কথা বললেন রাইটার্স সিন্ডিকেটের প্রেসিডেন্ট মুস্তফা কোজ। লেখকদের অনেকেই ছিলেন বৈঠকে, ইংরেজি বুঝলেও বলতে পারেন না। বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কে তুরস্কের রাষ্ট্রপতির অনাকাঙ্ক্ষিত মন্তব্যের কঠোর সমালোচনা করলেন রাইটার্স সিন্ডিকেটের শীর্ষ

নেতারা। ইসলামের নামে '৭১-এ বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে জেনে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলেন তারা। বললেন, বাংলাদেশের লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করতে চান তারা। তাদের বললাম, দেশে ফিরে আমি সরকারকে বলব তুরস্ক ও মিশর থেকে লেখক, শিল্পী, সাংবাদিকদের দুটি দল বাংলাদেশ সফরে আমন্ত্রণের জন্য। বিশ্বের সব দেশের ধর্মনিরপেক্ষ মানবতায় বিশ্বাসী শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম গঠন জরুরি হয়ে উঠেছে। দেশে দেশে আমরা মৌলবাদীদের দ্বারা ক্রমাগত আক্রান্ত হব, নিহত হব, কারাগারে যাব কিংবা তাদের হুমকির কারণে দেশান্তরি হব— এমনটি চলতে পারে না। মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমাদের একজোট হয়ে লড়তে হবে। '৭১-এ না পারলেও এখন থেকে আমরা একে অপরের বিপদে পাশে যেন দাঁড়াতে পারি সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

আমেরিকা কীভাবে মুসলমানপ্রধান দেশগুলোতে মৌলবাদকে মদদ দিচ্ছে এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য তারা সমর্থন করলেন। বললেন, অন্যান্য দেশের প্রগতিশীল লেখকদের নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন করা যায় কি না। বললাম, এ বিষয়ে মিশরের লেখক ইউনিয়নের সভাপতি মোহামেদ সালমাওয়ের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে। তাদের বিশাল অবকাঠামোগত সুবিধে রয়েছে। মিশরের লেখক ইউনিয়ন আমাকে লিখিত প্রস্তাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছে। একই ধরনের আলোচনা হয়েছে লেখকদের অপর সংগঠন টার্কিশ পেন ক্লাবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে। পরদিন তাদের বুলেটিনে আমার সঙ্গে বৈঠকের সচিত্র প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে। তারা বলেছেন পেন-এর আগামী সম্মেলনে আমাকে আমন্ত্রণ জানাবেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে নিজেদের অজ্ঞতায় তারা লজ্জিত হলেন।

ইস্তাম্বুলে শেষ দিন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল সংখ্যালঘু আলাভী মুসলিমদের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। সুন্নী ও শিয়াদের মতো কোরাণে বর্ণিত মুসলমানদের ৭৩টি ফেরকার মধ্যে একটি হচ্ছে আলাভী। শিয়াদের মতো আলাভীরা মনে করেন হযরত আলীর (রাঃ) যোগ্যতা ছিল নবী হওয়ার। আলাভীরা হযরত মহম্মদ (সাঃ) ও তাঁর জামাতা হযরত আলীকে (রাঃ) সমপর্যায়ের মনে করেন। যে কারণে অটোমান খলিফাদের যুগ থেকে আলাভীদের তুরস্কের সুন্নীরা মুসলমান বলে গণ্য করেন না। আলাভীরা তুরস্কের মোট জনসংখ্যার ১৫-২০%। সুন্নী মৌলবাদীরা সুযোগ পেলেই আলাভীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৯৩ সালে আলাভীদের একটি সম্মেলনে হোটেলে আগুন ধরিয়ে মৌলবাদীরা ৩৫ জন আলাভীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছে। তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতির আন্দোলনে প্রধান শক্তি হচ্ছে আলাভীরা। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, তুরস্কে আলাভীদের উপর ধারাবাহিক নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' বা 'এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালে'র মতো মানবাধিকার সংগঠনগুলো কখনও উচ্চকণ্ঠ হয়নি, অথচ বাংলাদেশে গণহত্যাকারীদের বিচার সম্পর্কে তারা প্রতিনিয়ত উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

মিশর ও তুরস্ক সফরের সময় যখন বলেছি বর্তমান মুসলিম বিশ্বে শুধু বাংলাদেশেই ধর্মনিরপেক্ষ দল ক্ষমতায় আছে— জেনে তারা চমৎকৃত হয়েছেন।

বাংলাদেশের মৌলবাদীরা কীভাবে এসব দেশের মৌলবাদীদের সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করছে এ বিষয়ে সর্বত্র মতবিনিময় করেছি।

মুসলমানপ্রধান দেশগুলোতে তুরস্ক প্রথম ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ করছিল। তবে কামাল আতাতুর্কের ইউরোপীয় মডেলের কঠিন সেক্যুলারিজম গ্রামের সাধারণ মানুষ পছন্দ করেনি, যারা ছিল সাড়ে ছয়শ বছর ধরে ইসলামের খলিফাদের রাজত্বে। ধর্মীয় সংগঠন নিষিদ্ধ করতে গিয়ে আতাতুর্ক সুফী ঐতিহ্যও বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন। কোনিয়ায় মানবতাবাদী সুফী সাধক জালালউদ্দীন রুমীর মাজার পরিদর্শন করে সেখানকার কর্মকর্তাদের বলেছি, তুরস্কে সুফীবাদ এখন পর্যটক আকর্ষণের পণ্যে পরিণত হয়েছে। দরবেশী নাচ ও সুভেনির ছাড়া সুফী ঐতিহ্যের অন্য কোন অভিব্যক্তি কোথাও চোখে পড়েনি।

কোনিয়া ও ইস্তাম্বুলের সাংবাদিকদের বলেছি তুরস্কে না থাকলেও রুমীর মানবিক দর্শন কীভাবে সজীব রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে। রুমীর জন্ম ইরানে, তবে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন তুরস্কে। আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি রুমীর ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার দর্শন পরবর্তীকালে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে তুরস্ক, ইরাক, সিরিয়া, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের সুফী সাধকদের। প্রায় আটশ বছর আগে রুমী লিখেছেন, 'হে মুসলিম, আমি তো জানি না নিজেকে/ আমি তো নই খৃষ্টান, ইহুদি, হিন্দু, নই মুসলিম/ আমি প্রাচ্যের নই, পাশ্চাত্যেরও নই, আমি জলের নই, স্থলেরও নই/ আমি ভারতের নই, চীনের নই, বুলগেরিয়া, সাকসিনেরও নই/ আমি ইহলোকের নই, পরলোকের নই, স্বর্গের নই, নরকেরও নই।...'

এর সঙ্গে অদ্ভুত মিল খুঁজে পেয়েছি পাকিস্তানের বুল্লে শাহ, ভারতের কবীর আর বাংলাদেশের লালনের। লালন তো রুমীরই প্রতিধ্বনি করেন যখন তিনি বলেন— 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে/ লালন কয় জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে।' কিংবা 'সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন।/ লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান।'

কোনিয়ার সাংবাদিকদের বলেছি, রুমী মৃত্যুবরণ করেছেন তুরস্কে, কিন্তু তাঁর দর্শন মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়া হয়ে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। রুমীর প্রত্যক্ষ শিষ্য হযরত শাহজালাল কোনিয়া থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য। রুমীর মানবতাবাদের শেষ উত্তরাধিকারী বাংলাদেশের লালন ফকির। আমি তুরস্ক ও বাংলাদেশের সরকারের কাছে প্রস্তাব করব কোনিয়া ও কুষ্টিয়াকে 'জমজ নগর' ঘোষণার জন্য। জঙ্গী মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে সুফী ইসলামের সাম্য ও মানবিকতার দর্শন অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে। যে কারণে মৌলবাদীরা সুযোগ পেলেই সুফীদের মাজারে হামলা করছে। ধর্মের মানবিক অভিব্যক্তি সবসময় তারা ধ্বংস করতে চেয়েছে।

মৌলবাদীদের দৌরাত্ম্যের কারণে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে রোজার মাসে সব রেস্তোরাঁ, খাবার দোকান বন্ধ থাকে। অথচ তুরস্কের প্রধান শহরগুলোতে ইফতারের বিশাল আয়োজন ছাড়া অন্য সময়ে বোঝার উপায় নেই এটা রোজার মাস, যদিও

সেখানে ক্ষমতায় রয়েছে জামায়াতবান্ধব এ. কে. পার্টি। ইস্তাম্বুলে বোরখা আর মিনি স্কার্ট পরা মেয়েদের নিঃসঙ্কোচে রাস্তায় হাঁটতে দেখেছি। ঐতিহাসিক সুলতানআহমেত মসজিদের ভেতরে দেখেছি ইসলামের ইতিহাসের অনন্যসাধারণ স্থাপত্য নিদর্শন দেখবার জন্যে দেশী-বিদেশী নারী-পুরুষের বিপুল সমাগম। শুধুমাত্র মসজিদের ভেতর স্কার্ট বা শর্টস পরে প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু মসজিদের প্রাঙ্গনে খোলামেলা পোশাকের পর্যটকদের অবস্থান সম্পর্কে কারো কোন মাথাব্যথা নেই। নারীদের সম্পর্কে হেফাজতের শফী সাহেব যা বলেছেন তুরস্কের মৌলবাদীরা শুনলে কানে আঙ্গুল দেবেন। কামাল আতাতুর্ক সমন জারী করে মেয়েদের বোরকা পরা ও মাথায় হেজাব বাঁধা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এখন আবার বোরকা ও হেজাব ফিরে এসেছে। এ নিয়ে কেউ জবরদস্তি করেনি। রোজার মাসে সেখানে খোলামেলা বেলি ড্যান্স হতেও দেখেছি— আমাদের দেশে হলে হাটহাজারীর হুজুররা কেয়ামত বাঁধিয়ে দিতেন। তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম স্বমহিমায় স্ব স্ব অবস্থানে রয়েছে। তারপরও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তুরস্কের চেয়ে বাংলাদেশে বেশি বলতে হবে। আতাতুর্কের জমানায়ও তুরস্কে ধর্মীয় সংখ্যালঘু আলাভী নির্যাতন অব্যাহত ছিল।

তুরস্কের মৌলবাদীরা বহু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের চেয়ে মার্জিত। তারা মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে স্বাস্থ্যগত কারণের কথা বলে। তারা একথা বলছে না— মদ্যপান ইসলামসম্মত নয়। যে কামাল আতাতুর্ক তুরস্ক থেকে ধর্মকে নির্বাসনে পাঠাতে চেয়েছিলেন তার প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতির পিতার সম্মান জানাতে সে দেশের মৌলবাদীরা বিব্রত বোধ করে না। কেউ এমন কথা বলে না— মোস্তফা কামাল নয়, মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ), যেমনটি বলা হয় বাংলাদেশে। সাড়ে ছয়শ বছর ধরে ইসলামের সদর দুর্গ তুরস্কে মাওলানা একজনই আছেন, তিনি জালালউদ্দিন রুমী। আমাদের মত পাড়ায় পাড়ায় মাওলানার ছড়াছড়ি তুরস্ক কেন, আরববিশ্বের কোথাও নেই। তুরস্কের মৌলবাদীরা মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী, কমিউনিস্ট ও সংখ্যালঘু আলাভীদের উপর নির্যাতন করলেও '৭১-এর মতো গণহত্যা সংঘটনের রেকর্ড তাদের নেই। কামাল আতাতুর্ক এমনই প্রবল জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছিলেন যে, ওহাবিবাদ এখনও তুরস্কে শেকড় গাড়তে পারেনি আরবে উদ্ভুত হওয়ার কারণে। চরিত্রগতভাবে তুর্কিরা আরববিদ্বেষী। এখনও গ্রামের অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আরবের নন, তিনি তুর্কী। ইসলাম সম্পর্কে বলা হয়— কোরান নাজেল হয়েছে আরবে, লেখা ও প্রচার হয়েছে তুরস্কে। মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুড ক্ষমতায় আসার প্রথম বছরে সব এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নিজেদের পতন ডেকে এনেছে। তুরস্কের মৌলবাদীরা এগুচ্ছে ধীরে, তবে সবারই আক্রমণের মূল লক্ষ্য নিঃসন্দেহে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ।

কামাল আতাতুর্কের চেয়ে বঙ্গবন্ধুর সেকুলারিজম অনেক বেশি যুগোপযোগী এ কথা তুরস্কের বন্ধুরাও স্বীকার করেছেন। বঙ্গবন্ধুর সেকুলারিজমে ধর্মের স্পেস ছিল, যা আতাতুর্কের তুরস্কে ছিল না। বঙ্গবন্ধু যেমনটি বলেছিলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়'— তুরস্ক সেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে যায়নি। যার ফলে গত ১২

বছর ধরে ইসলামপন্থীরা তুরস্কে ক্ষমতায়। এ বিষয়ে তুরস্কে ও মিশরে আমরা সবাই একমত হয়েছি— ধর্মনিরপেক্ষতার ভেতর ধর্মের জায়গা থাকতে হবে। মানুষ ধর্ম পালন করবে, প্রচারও করবে, কিন্তু রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে সব সময় ধর্ম থেকে দূরে রাখতে হবে। ধর্ম আর রাজনীতি যুক্ত হলে কী হয় আমরা '৭১-এ দেখেছি, এখনও দেখছি। আমাদের মতো একই অভিজ্ঞতা তুরস্ক, মিশর, তিউনেশিয়া, আলজেরিয়া, সুদান, পাকিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তানে। দেশে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নিরন্তর চর্চাই আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজকে বাঁচাতে পারে।

আমার 'চূড়ান্ত জিহাদ' ছবিতে দেখিয়েছি বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের 'জামায়াতে ইসলামী', মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার 'মুসলিম ব্রাদারহুড' এবং তুরস্কের মৌলবাদী 'জাস্টিস এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি' একই পথের পথিক, একই নৌকার যাত্রী। প্রয়োজনে মৌলবাদীরা যদি একে অপরের পাশে দাঁড়াতে পারে, অভিষ্ট লক্ষ্যের জন্য জীবন দিতে পারে— প্রগতির আন্দোলনে যারা যুক্ত একইভাবে তাদেরও পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে হবে। সকল দেশের ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী শক্তিকে এক মঞ্চে সমবেত হতে হবে। মৌলবাদের তামসিকতা থেকে মুক্ত করতে হবে সমগ্র বিশ্বকে।

আমি আগেই ঠিক করেছিলাম আমার 'চূড়ান্ত জিহাদ' শুরু করব ৯/১১-এ নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের দৃশ্য দিয়ে। কায়রো ও ইস্তাম্বুল থেকে ফিরে ঠিক করেছি এ ছবির শেষ দৃশ্য হবে তাহরির, শাহবাগ ও তাকসিমে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী তরুণদের নবজাগরণ। তিন দেশের তরুণদেরই প্রিয় গান 'উই শ্যাল ওভারকাম...', 'আমরা করব জয়'। বিশ্বব্যাপী ধর্মান্ধতা, ধর্মের নামে হত্যা, সন্ত্রাস ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে এই তরুণরাই আমাদের ভবিষ্যৎ।

২৫ জুলাই ২০১৩

জামায়াতের বিরুদ্ধে মওদুদিপুত্র হায়দার ফারুকের জেহাদ

গত সপ্তাহে বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঢাকা এসে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবুল আলা মওদুদির পুত্র হায়দার ফারুক মওদুদি রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে আলোচনার ঝড় তুলেছেন। ঢাকার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়েছে জামায়াত সম্পর্কে তার তোপের মতো মন্তব্য। ১২ অক্টোবর (২০১৩), দৈনিক সমকালে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী হায়দার ফারুক সম্পর্কে তাঁর লেখার শিরোনাম দিয়েছেন 'মওদুদিপুত্র কি জামায়াতের দৈত্যকূলে প্রহ্লাদ?'

মওলানা মওদুদির জামায়াতে ইসলামী শুধু বাংলাদেশে নয়, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম ব্রাদারহুড এবং আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের তালেবান ও আলকায়দার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জঙ্গী মৌলবাদের আন্তর্জাতিক বলয় সৃষ্টি করেছে। জামায়াত ও ব্রাদারহুডের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মওদুদি ও হাসান আল বান্না সাম্প্রতিক বিশ্বে যে রাজনৈতিক ইসলামের জন্ম দিয়েছেন তার মূল কথা হচ্ছে ধর্মের নামে ক্ষমতায় যাওয়া বা থাকার জন্য যে কোনও ধরনের হত্যা, নির্যাতন ও সন্ত্রাস ইসলামসম্মত।

এ হেন মওদুদির মধ্যম পুত্র হায়দার ফারুক ঢাকায় এসে বলেছেন, তার পিতা বিশ্বাস করতেন জামায়াতে ইসলামী একটি সন্ত্রাসী সংগঠন, যে কারণে তার নয় সন্তানের কাউকেও এ দলের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেননি। তিনি বাংলাদেশের জামায়াত সম্পর্কে বলেছেন, যে দল বাংলাদেশের জন্মের বিরোধিতা করেছে সে দলের এ দেশে রাজনীতি করার কোনও অধিকার নেই, সে দলকে রাজনীতি করতে দেয়া উচিত নয়। বাংলাদেশের জামায়াতকে তিনি পরামর্শ দিয়েছেন— '৭১-এর গণহত্যার জন্য ক্ষমা চেয়ে রাজনীতি ছেড়ে তাদের উচিত এ দেশের মানুষের সেবামূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করা।

গত ৪ ও ৫ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী'র সম্মেলন ও গণবক্তৃতার বিষয় ছিল দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্ম ও রাজনীতি। সংগঠনের আহ্বায়ক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন গত তিন মাস ধরে এ সম্মেলন সফল করার জন্য তার সহকর্মী, বন্ধু ও ছাত্রদের নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করেছেন। ইতিহাসবিদ না হওয়া সত্ত্বেও আমার ইতিহাসপ্রীতির কারণে মামুন আয়োজকদের নামের তালিকায় আমাকেও রেখেছিলেন। সম্মেলনের প্রতিনিধি তালিকা প্রস্তুত করার সময় তিনি জানতে চেয়েছিলেন পাকিস্তান থেকে এ বিষয়ে বলার জন্য কাদের আমন্ত্রণ করা যায়। গত বছর আমি 'সীমানাহীন জেহাদ' নামে পাকিস্তানে জঙ্গী মৌলবাদের উত্থান এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলাম। এ ছবিতে পাকিস্তানের সমাজ রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব ও বিস্তার সম্পর্কে সেখানকার কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মত রয়েছে, যাদের অন্যতম হায়দার ফারুক মওদুদি।

২০১০ সালে 'সীমানাহীন জেহাদ'-এর প্রথম শুটিং-এর সময় লাহোরে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। এর আগে জানতাম মওদুদির দুই পুত্র পিতার রাজনীতির কট্টর সমালোচক। লাহোরে আমার বন্ধু সাংবাদিক সাঈদ আহমেদ ষাটের দশকে জহির রায়হানের সহকারী ছিলেন। আমি যখন তার কাছে মওদুদির বিদ্রোহী পুত্রদের সন্ধান জানতে চাইলাম তিনি বলেছিলেন, জ্যেষ্ঠপুত্র আমেরিকায় থাকেন, মধ্যমটি থাকেন লাহোরে। সাঈদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও সামান্য পরিচয় ছিল হায়দার ফারুকের। আমার তরুণ ক্যামেরাম্যান রাণা শাহরিয়ার বলল, ও মওদুদিদের বাড়ি চেনে, একবার লাহোরের এক টেলিভিশন চ্যানেলের জন্য হায়দার ফারুকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। রাণার কাছ থেকে টেলিফোন নম্বর নিয়ে সাঈদ কথা বলেছিলেন হায়দারের সঙ্গে। বিকেলেই আমাদের চায়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি।

লাহোরের হায়দারপোরায় মওলানা মওদুদির পুরনো বাড়ির একভাগে থাকেন হায়দার ফারুক স্ত্রী, কন্যা ও দুই পুত্রকে নিয়ে। প্রতিদিন বিকেলে নানা বয়সী দর্শনার্থীরা আসেন তার কথা শোনার জন্য। মওলানা মওদুদির লাইব্রেরিতে কয়েকটি তক্তপোষ বিছানো। হায়দার ফারুক ভক্ত ও দর্শনার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে নিজের অভিমত জানান, তাদের প্রশ্নের জবাব দেন। দেখে মনে হচ্ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আহমদ শরীফের আড্ডা।

হায়দার ফারুকের কৌতুকবোধ প্রখর। ছবির জন্য এক ঘণ্টার সাক্ষাৎকার রেকর্ড করলেও ব্যবহার করেছি মাত্র আড়াই মিনিট। পাকিস্তানের ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, যে দেশের জন্ম হয়েছে ধর্মের নামে সে দেশে তো মোল্লা মৌলবিদেরই গুন্ডামি বদমায়শি চলবে। অন্য কিছু তো আপনারা আশা করতে পারেন না। জামায়াতকে পাকিস্তানের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই নিয়মিত টাকা দেয় এ তথ্য হায়দার ফারুকও দিয়েছেন। বলেছেন ধর্মের নামে গুন্ডামি, বদমাইশি যেমন জায়েজ, আইএসআই-র কাছ থেকে টাকা নেয়াও জায়েজ বলে মনে করে জামায়াত।

জামায়াতের আমীরদের সম্পর্কেও অনেক মজার মন্তব্য করেছেন। আফগান যুদ্ধের পর জামায়াতের আমীর মিয়া তোফায়েল আহমেদ এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আমেরিকা আমাদের কীভাবে ব্যবহার করেছে টেরও পাইনি। হায়দারের মন্তব্যঃ টের পাবেন কী করে! তখন আমেরিকার ডলার তার চোখ আর মুখ দুটোই বন্ধ করে রেখেছিল। মিয়া তোফায়েলের পর জামায়াতের আমীর ছিলেন কাজী হুসেন আহমেদ। সোয়াতের এক কলেজে ভূগোল পড়াতেন। এক ছেলের উপর বলাৎকারের জন্য তাকে সেই কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এরপর তিনি দুবার পাগলা গারদেও ছিলেন। হায়দারের কলামে বিষয়টা জানতে পেরে তখনকার প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফ তাকে ফোন করেছিলেন। ছাত্র জীবনে জেনারেল মোশাররফের সহপাঠী হায়দার ফারুক আমাকে বললেন, টেলিফোন পেয়ে ওকে আমি বলেছি বিশ্বাস না হলে পাগলা গারদের রেকর্ড দেখতে পারো। জেনারেল মোশাররফ তাই করেছিলেন। এরপর সর্বদলীয় এক বৈঠকে জামায়াতের এই আমীর একবার বেশি বক

বক করছিলেন। জেনারেল মোশাররফ তাকে বলেছেন, আপনি দুবার পাগলা গারদে ছিলেন। বেশি কথা বললে আবার সেখানে পাঠিয়ে দেব। এরপর থেকে হুসেন আহমদ একদম খামোশ হয়ে গেছেন।

পিতার রাজনৈতিক শঠতা সম্পর্কে হায়দার বলেছেন, তিনি ভাল করেই জানতেন জামায়াত যারা করে তারা সব গুন্ডা, বদমাশ, দাগী অপরাধী। সে কারণে প্রথম থেকে আমাদের জামায়াত বা জমিয়ত (পাকিস্তানি জামায়াতের ছাত্র সংগঠন) থেকে দূরে রেখেছেন। ঠিক যেভাবে ড্রাগ বিক্রেতা বাড়িতে ঢোকার সময় ড্রাগের ঝোলা বাইরে রেখে আসে। কখনও যদি আমাদের ভাইদের কাউকে দূর থেকে জামায়াতের কোনও সমাবেশে দেখেছেন সঙ্গে সঙ্গে ডেকে বলেছেন, তোমরা কেন মিটিঙে গেছ? মিটিং মিছিলে তোমাদের কোন কাজ নেই। আমাদের নয় ভাই-বোনকে সব সময় জামায়াতের রাজনীতি থেকে তিনি দূরে রেখেছেন। পড়িয়েছেন ইংরেজি স্কুলে।

তাকে বলেছিলাম, পাকিস্তানি বা বাংলাদেশী জামায়াত কখনও স্বীকার করে না যে আইএসআই-এর সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক আছে। হায়দার বলেছেন, জামায়াত তো এ কথাও স্বীকার করে না জমিয়ত যে তাদের দলের ছাত্র সংগঠন। আমাদের কি এসব কথা বিশ্বাস করতে হবে? জামায়াত আইএসআই-র কাছ থেকে টাকা নেয় এ কথা সবাই জানে।

মওলানা মওদুদি ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী গঠন করেছিলেন। সেই সময় এ দল গঠন সম্পর্কে উপমহাদেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতারা এবং উলেমারাও তাকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। মওদুদি ছিলেন কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদের ভক্তবিশেষ। জামায়াতের গঠনতন্ত্র পড়ে মওলানা আজাদ তখন মওদুদিকে বলেছিলেন, তুমি যে দল করতে যাচ্ছ এটা একটা ফ্যাসিস্ট দল হবে। সাপ বিচ্ছুকে তুমি একসঙ্গে রাখতে পারবে। ধর্মের নামে মানুষদের কখনও এক দলে জড় করতে পারবে না। মওদুদি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। মওদুদি সে সময় পশ্চিমা গণতন্ত্রকে কুফরি মতবাদ আখ্যা দিয়ে হিটলার ও মুসোলিনির নাৎসিবাদ ও ফ্যাসিবাদের পক্ষে বিস্তর লিখেছেন।

পাকিস্তান আন্দোলন ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোর বিরোধী ছিলেন মওদুদি। হায়দার বলেছেন, আমার পিতা পাকিস্তান আন্দোলনকে বলতেন 'নাপাকিস্তান'। জিন্নাহ সম্পর্কে তার মন্তব্য ছিল— যে ব্যক্তি তার ছয় ফুট দীর্ঘ দেহে ধর্ম কায়েম করতে পারেন না, তিনি কীভাবে একটি দেশে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন? অথচ ১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি বললেন, পাকিস্তান তো প্রতিষ্ঠা করেছি আমরা তিনজন। জিন্নাহ, ইকবাল আর আমি। মওদুদির শঠতা ও দ্বৈত আচরণের কারণে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকেই দল ছেড়ে চলে গেছেন। হায়দারের মতে, থেকে গেছেন হুসেন আহমেদ আর গোলাম আযমের মতো বদমাশরা। এ প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিলেন মতিউর রহমান নিজামী এখন কোথায়? আমি বলেছি, কারাগারে। হায়দার মন্তব্য করেছেন, কারাগারই ওদের উপযুক্ত জায়গা।

জমিয়ত ও জামায়াতের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সমালোচনার জন্য হায়দার ফারুকের উপর কয়েক দফা হামলা হয়েছে। শেষবার ২০১২ সালের জানুয়ারিতে তার বাড়িতে

বোমা হামলা করেছিল জামায়াতের সন্ত্রাসীরা। তিনি থানায় গিয়েছিলেন অভিযোগ জানাতে। স্থানীয় থানা তার অভিযোগ গ্রহণ করেনি। বলেছে, আইএসআই-র নির্দেশ হচ্ছে জামায়াতের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ গ্রহণ করা যাবে না।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জামায়াত কীভাবে আইএসআই-র সঙ্গে একজোট হয়ে কাজ করে এ বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন তিনি। পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান 'তেহরিক-এ ইশতেকলাল' দলের প্রতিষ্ঠাতা এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান দু বছর আগে রাজনৈতিক দলকে টাকা দেয়ার জন্য আইএসআই-র বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। এসব দলের তালিকায় জামায়াত ছাড়াও আমাদের বিএনপির নামও ছিল। এ নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করায় হায়দার আমাকে বলেছিলেন, আপনারা বিএনপিকে বাংলাদেশের মনে করতে পারেন, আইএসআই মনে করে বিএনপি তাদের দল। হায়দারের মতে বাংলাদেশে জামায়াত সহ ধর্মভিত্তিক সব রাজনৈতিক দলের প্রধান মদদদাতা হচ্ছে বিএনপি। তিনি বলেছেন, জামায়াতের যে সব নেতার নতুন জামা কেনার সামর্থ ছিল না, পুরনো কাপড় পরত চেয়েচিন্তে, তারা এখন আইএসআই-এর বদৌলত কোটি কোটি টাকার মালিক।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জামায়াতের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগও রয়েছে হায়দার ফারুকের। মওদুদির গ্রন্থসংখ্যা শতাধিক। তার মৃত্যুর পর দুই দেশেই জামায়াতিরা তার পিতার বই সমানে প্রকাশ করছে, মওদুদির পরিবারকে এক পয়সাও রয়েলটি দেয় না।

মওলানা মওদুদির বিশাল লাইব্রেরি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন হায়দার ফারুক। সেখানেই তার লেখাপড়া এবং দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা। পাশের ছোট ঘরে তার স্টুডিও। অবসর সময়ে ছবি আঁকেন হায়দার ফারুক। ছবি আঁকা নিছক শখ, কখনও প্রদর্শনীর কথা ভাবেন নি। স্টুডিওতে মওলানা মওদুদির বিশাল সাদাকালো আলোকচিত্র। পিতা ও পুত্রের রাজনৈতিক অবস্থান উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে। মওলানা মওদুদির তৈরি করা জামায়াতের একটি পরিচিত শ্লোগান হচ্ছে— 'পাকিস্তান কা মতলব কেয়া/লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তিনি জেহাদ বাধ্যতামূলক করেছেন, জেহাদের নামে গণহত্যাকে বৈধতা দিয়েছেন। জামায়তিরা জেহাদ ঘোষণা করেছে মানবসভ্যতার যাবতীয় অর্জনের বিরুদ্ধে।

মওলানা মওদুদির পুত্র বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ইসলামের ইতিহাস সংক্রান্ত তিনটি গ্রন্থের প্রণেতা। হায়দার ফারুক ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। তার মতে ধর্মনিরপেক্ষতা কখনও ধর্মহীনতা নয়। তিনি মনে করেন ধর্মকে রাজনীতির বাইরে না রাখলে ধর্মের নামে রাজনীতি পাকিস্তানের ধ্বংসের কারণ হবে এবং সেই দিন বেশি দূরে নয়। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, এ কারণেই পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হয়েছে, তবু এদের শিক্ষা হয়নি।

মওদুদিপুত্র হায়দার ফারুক গত তিন দশক ধরে জামায়াতের নষ্টভ্রষ্ট রাজনীতির বিরুদ্ধে তার জেহাদ অব্যাহত রেখেছেন।

১২ অক্টোবর ২০১৩

গণহত্যাকারীদের দন্ড এবং ঈদের উৎসব

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ করেছিল তাদের বিচার চলছে। গত দশ মাসে জামায়াতে ইসলামীর প্রধান নেতা গোলাম আযম সহ শীর্ষস্থানীয় আট জন গণহত্যাকারীর বিচার শেষ হয়েছে, যাদের ভেতর পাঁচজন মৃত্যুদন্ড এবং তিনজনকে যাবজ্জীবন ও আমৃত্যু কারাদন্ডে প্রদান করেছে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল' । যাবজ্জীবন দন্ডপ্রাপ্ত কাদের মোল্লার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ ও আসামীপক্ষ সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করেছিল। সুপ্রিম কোর্টের আপিলে কাদের মোল্লাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে, যদিও অজ্ঞাত কারণে পূর্ণাঙ্গ রায়ের কপি জেলে না পাঠানোর কারণে তার দন্ড কার্যকর করা যাচ্ছে না।

গত শতাব্দীতে বিশ্বে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সহ অর্ধশতাধিক গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে, যেখানে সর্বনিম্ন লক্ষাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এসব গণহত্যার এক পঞ্চমাংশেরও বিচার হয়নি, যার ফলে বিভিন্নভাবে বিশ্বব্যাপী গণহত্যা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশেও ১৯৭১-এ সংঘটিত গণহত্যার বিচার আরম্ভ হয়েছে চল্লিশ বছর পর, যে বিচার বানচাল করার জন্য গণহত্যাকারীদের প্রধান দল জামায়াতে ইসলামী এবং তাদের দেশী-বিদেশী সহযোগী ও প্রভুরা শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে সর্বাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছে। গত শতাব্দীতে গণহত্যার একটি রায়ে এই নৃশংসতম অপরাধের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা পর্যালোচনা করে বলা হয়েছিল গণহত্যাকারীদের সর্বনিম্ন শাস্তি হওয়া উচিত মৃত্যুদন্ড। যদি মৃত্যুদন্ডের অধিক কোনও শাস্তির বিধান থাকত তাহলে গণহত্যাকারীদের সেই শাস্তিই প্রাপ্য ছিল। বাংলাদেশের আদালতে গণহত্যার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ার পরও গোলাম আযম ও আবদুল আলীমকে বয়স ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে দীর্ঘমেয়াদী বা আমৃত্যু কারাদন্ড দেয়া হয়েছে।

অত্যন্ত সীমিত রসদ, প্রতিকূল পরিবেশ, জামায়াতিদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের সঙ্গে যুক্ত তদন্ত সংস্থা, প্রসিকিউশন এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারিরা যে কঠোর পরিশ্রম করে সাড়ে তিন বছরে আটজনের বিচার সম্পন্ন করতে পেরেছেন তার জন্য সমগ্র জাতি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু কিছু বিষয়ে জাতির হতাশা ও ক্ষোভও বিবেচনায় রাখতে হবে।

১৯৭৩-এ প্রণীত 'আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালসমূহ) আইন'-এর অধীনে '৭১-এর গণহত্যাকারী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিচার চলছে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে'। '৭৩-এর এই আইনটি হচ্ছে কতগুলো আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারের জন্য দেশীয় আইন। দেশীয় আইন ও দেশীয় আদালতে গণহত্যা, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচার করে আমরা নিঃসন্দেহে গণহত্যার বিচারবঞ্চিত দেশ ও জাতিসমূহের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি। প্রচলিত দেশীয় আইনে এ ধরনের ভয়াবহ অপরাধের বিচার সম্ভব নয় বলেই বঙ্গবন্ধুর সরকার

১৯৭৩ সালে সংবিধান সংশোধন করে এই বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছিল, যার মূল কথা হচ্ছে এই আইনের অধীনে বিচারাধীন ব্যক্তিদের জন্য সংবিধানে বর্ণিত মানবাধিকারসমূহ প্রযোজ্য হবে না এবং গণহত্যাকারীদের বিচারের ক্ষেত্রে প্রচলিত সাক্ষ্য আইনও প্রযোজ্য হবে না।

আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি আইসিটির যে সব রায়ে গণহত্যাকারীদের মৃত্যুদন্ড থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে সেখানে '৭৩-এর আইনের মূল চেতনা থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে। সাক্ষ্য আইন মুখ্য বিষয় না হলেও কাদের মোল্লার রায়ের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে এবং গোলাম আযম ও আবদুল আলীমের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পরও ট্রাইবুনাল শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে যে অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন '৭৩-এর বিশেষ আইন তা অনুমোদন করে না। ১৯৭৩-এর আইনে আছে অপরাধ প্রমাণিত হলে যে শাস্তি আসামীর প্রাপ্য তাকে সেই শাস্তিই দিতে হবে। বিশেষ বিবেচনায় অনুকম্পা প্রদর্শনের কোনও সুযোগ '৭৩-এর আইনে নেই। আবদুল আলীমের রায়ে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্য হলেও না দেয়ার ক্ষেত্রে আসামীর বয়স ও শারীরিক অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে যে অনুকম্পা প্রদর্শন করা হয়েছে এ বিষয়ে আসামী কখনও আদালতে অপরাধ স্বীকার করে অনুকম্পা প্রার্থনা করেনি। আইনে অনুকম্পার সুযোগ নেই, আসামীপক্ষ অনুকম্পা চায়নি— তারপরও যে অনুকম্পা প্রদর্শন করা হয়েছে তাতে শুধু গণহত্যার ভিকটিমরা নয়, সমগ্র জাতি ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়েছে।

আমরা জানি প্রচলিত আইনে পঙ্গু ব্যক্তিকে ফাঁসিতে ঝোলানো যায় না কিন্তু কথিত আসামী কি পঙ্গু না অসুস্থ? অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা আছে। বাতের ব্যথা বয়সের কারণে হয়, এটি পঙ্গুত্ব বা অসুস্থতা নয়। পঙ্গু ছিলেন বীরউত্তম মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের মহান অধিনায়ক কর্ণেল তাহের, যাঁকে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রহসনের বিচার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন। কর্ণেল তাহের মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে তাঁর পা হারিয়েছিলেন। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের একজন মহান অধিনায়ককে যদি পঙ্গু হওয়া সত্ত্বেও ফাঁসিতে ঝোলানো যায়, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী গণহত্যাকারীদের ক্ষেত্রে কেন এই আইনবহির্ভূত, মানবতাবর্জিত অনুকম্পা প্রদর্শন করা হবে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন সর্বোচ্চ আদালত। আমরা আশা করব সরকারপক্ষ দ্রুত সুপ্রিম কোর্টে আপিলের প্রস্তুতি নেবেন।

সংবাদপত্রে দেখেছি মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত বা যাবজ্জীবনপ্রাপ্তরা কারাগারে রাজার হালে আছেন। গোলাম আযম তো গ্রেফতারের পর থেকেই দেশের সেরা হাসপাতালে সেরা ব্যবস্থাপনায় পাঁচ তারকা সেবা পাচ্ছেন। কারাবিধি লংঘন করে তাকে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল হাসপাতালে বিশেষ কেবিনে রাখা হয়েছে, বাড়ি থেকে সব রকম খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে, এমনকি ১৬টি দৈনিক পত্রিকাও তাকে সরবরাহ করা হচ্ছে। সৌদি বাদশাহ ও আইএসআই-র কল্যাণে জামায়াত নেতাদের বিত্ত-ব্যসন-বিলাসের কথা সম্প্রতি ঢাকা সফরকালে আমাদের জানিয়েছেন এই দলের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবুল আলা মওদুদির পুত্র সৈয়দ হায়দার ফারুক মওদুদি। তারপরও নিজের বাড়িতে থেকে গোলাম আযম এতটা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারতেন না যা তিনি শীর্ষস্থানীয়

গণহত্যাকারী হিসেবে শাস্তিভোগের ক্ষেত্রে পাচ্ছেন। দন্ড ঘোষণার পর কারাবিধি অনুযায়ী তাকে কারাগারে নেয়ার কথা থাকলেও গোলাম আযমের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। কার নির্দেশে '৭১-এর এই শীর্ষ গণহত্যাকারী ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধীর জন্য এত শাহী আয়োজন এটি জানার অধিকার নিশ্চয় আমাদের রয়েছে।

'৭১-এর গণহত্যার ভুক্তভোগী এবং বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সহিংসতার শিকার হিসেবে আমি সরকারের সেই নীতি নির্ধারকদের— যাদের কল্যাণে গণহত্যাকারীরা রাজার হালে কারাভোগ করছেন, তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই গণহত্যাকারীদের দল যখন ক্ষমতায় ছিল তখন আমাদের প্রতি তারা কী আচরণ করেছে। ২০০১ সালে কারচুপির নির্বাচনে জয়ী হয়ে জামায়াত-বিএনপির জোট সরকার সারা দেশে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উপর নজিরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছিল। এই নির্যাতনের প্রতিবাদ করবার জন্য ক্ষমতায় আসার দেড় মাসের ভেতর আমাকে গ্রেফতার করে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ ছিল ৫৪ ধারার। অর্থাৎ 'সন্দেহজনক গতিবিধি', পরে এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ। সরকারের সন্ত্রাস-নির্যাতন-নিপীড়নের সমালোচনা যে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হতে পারে বাংলাদেশে বিএনপি-জামায়াতের বদৌলতেই আমরা প্রথম জেনেছি।

আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল জামায়াতবিরোধিতার কারণে। ২০০১ সালে ক্ষমতায় আসার পনের দিন আগেই জামায়াতের আমীর জনসভায় বলেছিলেন, তারা ক্ষমতায় এলে আমাকে এবং নির্মূল কমিটিকে দেখে নেবেন। ক্ষমতায় এসে তারা তাই করেছেন।

প্রথমবার আমাকে গ্রেফতারের পর দেশে-বিদেশে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। উচ্চতর আদালত থেকে আমাকে ডিভিশন প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। না, আমাকে ডিভিশন দেয়া হয়নি। রাখা হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণীর আসামীদের পংক্তিতে। থাকতে হয়েছে পুঁতিদুর্গন্ধময় অপরিসর সেল-এ, খেতে হয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদিদের অখাদ্য বস্তু।

গত ঈদে দেখেছি, '৭১-এর বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত গণহত্যাকারীরা কী শানশওকতের সঙ্গে কারাগারে ঈদের উৎসবে শামিল হন। দুদিন পর আবার ঈদ আসছে, আমার এখনও মনে পড়ে, ২০০১ সালে ঈদের দিন আমার স্ত্রী বাড়ি থেকে এক বাটি খাবার এনে ছোট ছেলে-মেয়ে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে চার ঘণ্টা জেল গেটে দাঁড়িয়েছিল। ঈদের দিন সবাইকে বাড়ি থেকে পাঠানো খাবার খেতে দেয়া হয়, আমাকে দেয়া হয়নি অদৃশ্য উপরওয়ালার নির্দেশে। আমার অসহায় স্ত্রীপুত্রকন্যাদের এই দুঃসহ অপেক্ষার সংবাদ তখন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে দেখেছি 'ডেইলি স্টার'-এর সম্পাদক মাহফুজ আনাম আমার প্রতি জামায়াত-বিএনপি জোট সরকারের এই অমানবিক আচরণের সমালোচনা করে প্রথম পাতায় সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। জেলখানায় আমাকে খবরের কাগজ থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে।

২০০১ সালের ডিসেম্বরে ঈদের দিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অশীতিপর বৃদ্ধ কয়েদি ওসমান দুপুর বেলা রান্নাঘর থেকে লুকিয়ে একটি পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা এনে দিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে আমি এক মুঠো ভাত খেতে পারি।

যেহেতু আমি জামায়াত-বিএনপির জোট সরকারের আমলে দুবার জেলে গিয়েছি, জেলের পরিবেশ এবং সুবিধাবঞ্চিত বন্দিদের প্রতি মানবেতর আচরণ প্রত্যক্ষ করেছি, আমি চাই সকল বন্দির প্রতি মানবিক আচরণ করা হোক। কিন্তু সবচেয়ে ঘৃণ্য অপরাধে দণ্ডিত বা বিচারাধীন আসামীরা অর্থ ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কারাগারে রাজার হালে থাকবে এটি কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।

২০০১-এর ডিসেম্বরে কারাগারে আমার ঈদ উদযাপনের একটি সুখময় স্মৃতিও আছে। ঈদের আগের রাতে আওয়ামী লীগের এক তরুণ কর্মী আমাকে একটি পাঞ্জাবী দিয়ে বলেছিল, নেত্রী আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি বিস্মিত হয়েছিলাম খালেদা-নিজামীদের অমানবিক কারাগারে বন্দি আমার প্রতি শেখ হাসিনার এই মানবিক আচরণে। আমি কখনও আওয়ামী লীগ করিনি, তারপরও তিনি আমার জন্য ঈদের উপহার পাঠিয়েছেন। শেখ হাসিনাকে তখন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা জননেত্রী আওয়ামী লীগের সভাপতি মনে হয়নি। সেই দুঃসহ অমানবিক পরিবেশে একটি সাধারণ পাঞ্জাবিকে মনে হয়েছিল এক মমতাময়ী বোনের অসামান্য উপহার। ঈদের দিন জেনেছি শুধু আমার জন্য নয়, শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জন্যও ঈদের উপহার পাঠিয়েছিলেন।

আমি যখন নবেম্বরের ২২ তারিখে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ঢুকি তখন বন্দির সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের নিচে। দু মাস পরে যখন উচ্চতর আদালতের নির্দেশে জামিনে বেরিয়ে আসি তখন বন্দির সংখ্যা এগারো হাজারেরও বেশি। এরা সবাই ছিল আওয়ামী লীগের কর্মী। রোজই দেখতাম হাত পা ভাঙা অবস্থায় বিধ্বস্ত বন্দিদের জেলখানার বিভিন্ন খাতায় ছুঁড়ে ফেলা হত।

আজ জামায়াত-বিএনপির নেতারা যখন আওয়ামী লীগ সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কথা বলেন তাদের অনুরোধ করব, ২০০১/২ সালের খবরের কাগজ পড়ুন। কারাগারে আমার সঙ্গে, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এবং আমাদের মতো আরও অনেকের সঙ্গে কী আচরণ করা হত তার কিছু সচিত্র বিবরণ তখনকার খবরের কাগজে পাওয়া যাবে।

গোলাম আযমদের দল ক্ষমতায় থাকাকালে কারাগারে আমাদের প্রতি যে নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ করেছিল আমি চাই না তাদের প্রতি কখনও সেরকম আচরণ করা হোক। কারাবিধি অনুযায়ী যার যা প্রাপ্য রাজনৈতিক পরিচয় বা বিত্তবৈভব নির্বিশেষে সকল বন্দিকে তা দেয়া হোক। ঈদের দিনে উন্নত খাবার কিংবা বাড়ি থেকে পাঠানো খাবার কারাবিধি অনুযায়ী বন্দিদের প্রাপ্য। সাজাপ্রাপ্ত বা বিচারাধীন গণহত্যাকারীদেরও ঈদের দিন বাড়ির খাবার থেকে বঞ্চিত করা হোক— না, আমি তা চাই না। তবে প্রতিদিন তারা কারাগারে ঈদের আনন্দ এবং পাঁচ তারকা সেবা উপভোগ করবেন গণহত্যাকারীদের দোসর ছাড়া এমনটি কারো কাম্য হতে পারে না।

১৩ অক্টোবর, ২০১৩

রাজাকারপ্রেমী খালেদা জিয়ার হিন্দুপ্রীতি ঃ ভূতের মুখে রামনাম

আমার বাড়িতে আর অফিসে রোজ এক ডজন দৈনিক পত্রিকা আসে। কিছু সৌজন্য সংখ্যা, কিছু কিনতে হয়। সবার আগে যে পত্রিকাটি হাতে তুলে নিই সেটি জনকণ্ঠ। এই পত্রিকাটির প্রতি দুর্বলতা প্রধানতঃ তোয়াব খানের কারণে। মুক্তিযুদ্ধের পর দৈনিক বাংলা এবং সাপ্তাহিক বিচিত্রায় যখন সাংবাদিকতার হাতেখড়ি— সম্পাদক তোয়াব ভাই শিখিয়েছেন আধুনিক সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাংবাদিকের নৈতিক ও সামাজিক দায় ও অঙ্গীকার কাকে বলে। ২০ বছর পর এই দায় ও অঙ্গীকারের কারণেই খালেদা জিয়ার সরকার বিনা নোটিসে সাপ্তাহিক বিচিত্রার নির্বাহী সম্পাদকের পদ থেকে আমাকে বরখাস্ত করেছিল।

এরপর তোয়াব ভাইর সঙ্গে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশেরও চেষ্টা করেছিলাম। খালেদা জিয়ার রোষানলের ভয়ে কোনও মালিক আমাকে নিয়ে বেশি আগ্রহ দেখান নি। এমন এক সময় ছিল তখন কোনও পত্রিকা আমার লেখা ছাপতেও আগ্রহী ছিল না। তোয়াব ভাই জনকণ্ঠে যোগ দেয়ার পর তাঁরই কারণে এই পত্রিকার প্রতি আমার আগ্রহ। জনকণ্ঠের সম্পাদক আতিকুল্লাহ খান মাসুদ ও উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খান শুধু মুক্তিযোদ্ধা নন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নিভু নিভু মশালটি তাঁরা যেভাবে জ্বালিয়ে রেখেছেন, সেই আলো মুক্তিযুদ্ধোত্তর নতুন প্রজন্মকে এখনও পথ দেখাচ্ছে, আলোকিত করছে। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়বার সাহস যোগাচ্ছে।

এর জন্য জনকণ্ঠকে মাশুলও কম দিতে হয়নি। খালেদা জিয়ার প্রথম আমলেই সম্ভবত ১৯৯৫ সালে তোয়াব ভাই, বোরহান ভাই ও শামসুদ্দিন ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছিল মৌলবাদীদের ফতোয়াবাজির বিরুদ্ধে লেখার জন্য। সম্পাদক আতিকুল্লাহ খান মাসুদ সেবার পালিয়ে গিয়ে গ্রেফতার এড়ালেও ২০০৭ সালে ঠিকই তাঁকে জেলে ঢোকানো হয়েছিল এবং ২২ মাস বিনা বিচারে কারানির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে।

২০০১ সালের অক্টোবরে বিএনপি-জামায়াতের জোট সরকার ক্ষমতায় এসে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হত্যা, নির্যাতন ও গণগ্রেফতার সহ সারা দেশে সন্ত্রাসের যে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল— মনে হয়েছিল গোটা বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য না করা পর্যন্ত এর অবসান ঘটবে না। জনকণ্ঠে তখন ধারাবাহিকভাবে এসব নির্যাতনের বিরুদ্ধে লিখেছি। এসব লেখার জন্যই ক্ষমতায় আসার পর পরই খালেদা-নিজামীদের সরকার আমাকে গ্রেফতার করেছিল। দেশে ও বিদেশে এই গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদও হয়েছিল। 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' যখন এই গ্রেফতারের নিন্দা করে আমাকে 'কারাবন্দি বিবেক' (Prisoner of Conscience) বলেছিল সেদিন জনকণ্ঠের প্রধান শিরোনাম ছিল সেটি। কারাগারে এক তরুণ বন্দি কোর্টে হাজিরা দিতে গিয়ে জনকণ্ঠের সেই সংখ্যাটি এনে

লুকিয়ে আমাকে দিয়েছিল। জনকণ্ঠ তখন কারাগারেও নিষিদ্ধ। খালেদা-নিজামীদের নির্মম কারাগারের দুঃসহ পরিবেশে জনকণ্ঠের সেই সংবাদ পড়ে অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি।

দু বছর পরে 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' তাদের ঘোষিত 'কারাবন্দি বিবেক'দের নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেছিল, যাদের তালিকায় নেলসন মেন্ডেলার মতো মহাজনদের পাশে আমার মতো অভাজনও ছিল। অ্যামনেস্টির প্রশ্নকর্তা জানতে চেয়েছিলেন আমি কখন কীভাবে জেনেছিলাম তারা যে আমাকে 'কারাবন্দি বিবেক' ঘোষণা করেছেন। আমি জনকণ্ঠের সেই সংবাদ শিরোনামের কথা বলেছিলাম।

খালেদা-নিজামীদের দুঃশাসনের অন্যতম বলী জনকণ্ঠ যখন টিকে থাকার জন্য হাঁসফাস করছে, যখন মাসের পর মাস বেতন না পেয়ে এবং সরকারের রোষানলের কারণে নামিদামি সাংবাদিকরা অন্য কাগজে চলে যাচ্ছেন, যখন নিয়মিত লেখকদের সম্মানী দেয়া বন্ধ হয়ে গেছে তখনও জনকণ্ঠ ছেড়ে চলে যাইনি। আমার বন্ধু মুনতাসীর মামুন, কলাম লিখিয়ে হিসেবে খ্যাতি তার গবেষক-ঐতিহাসিকের খ্যাতিকে ম্লান করে দিয়েছে, সেটাও জনকণ্ঠেরই কারণে। মাঝখানে মামুন অভিমান করে দু বছর জনকণ্ঠে লেখেননি। পাঠকদের চাপের কারণে আবার ওকে জনকণ্ঠে ফিরে আসতে হয়েছে। ২০০২ সালে আমার সঙ্গে মুনতাসীর মামুনকে গ্রেফতারের কারণ হিসেবে ময়মনসিংহের সিনেমা হলের বোমা হামলার কথা বলেছিল খালেদা-নিজামীদের সরকার— পাগলেও তা বিশ্বাস করেনি। মামুনকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল জনকণ্ঠে লেখার কারণে।

জনকণ্ঠে যেদিন আবদুল গাফফার চৌধুরী আর মুনতাসীর মামুনের লেখা ছাপা হয় অন্য সব খবর পড়ার আগে তাদের লেখা পড়ি। গাফফার ভাইকে বলা হয় না বটে, মামুনকে ফোন করে বলি কোন বিষয়টি আমার ভালো লেগেছে। ভুল কিছু থাকলে শুধরেও দিই। গতকাল ও আজ মামুন পর পর দুটো লেখা লিখেছেন জনকণ্ঠে। গতকাল ১৯ অক্টোবর মামুনের লেখার শিরোনাম ছিল 'এ দেশে কি সত্যিকারের বাঙালিরা বাস করে না'? বিষয় ছিল ইটালিতে এরিক প্রাইবেক নামের এক নাৎসি যুদ্ধাপরাধী মারা গেছে, কোথাও তার কবর হচ্ছে না। ইটালির মানুষ তাকে তাদের দেশে কবর দিতে দেবে না। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল আর্জেন্টিনা থেকে, সেখানেও তার কবর হবে না— সাফ জানিয়ে দিয়েছে সে দেশের সরকার। যুদ্ধাপরাধীর লাশ পড়ে আছে মর্গে, কেউ বলছে তাকে পুড়িয়ে ছাই এমন জায়গায় ফেলা হোক কেউ যাতে জানতে না পারে। কারণ কোথাও তার কবর হলে নব্য নাৎসিরা সেখানে মিলিত হয়ে ফুল দেয়ার সুযোগ পাবে। এরপর মামুন প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশে যে সব যুদ্ধাপরাধীর বিচার হচ্ছে— তাদের অনেকের ফাঁসিও হবে, তাদের কবর কোথায় হবে। তার লেখায় গোলাম আযমদের মানবতাবিরোধী অপরাধের নৃশংসতার কিছু উল্লেখ করে তাদের প্রতি মহানুভূতিশীলদের প্রতি যথারীতি বিদ্রুপাত্মক কিছু মন্তব্যও করেছেন। মামুন লিখেছেন—

‘গোলাম আযমদেরও মৃত্যু হবে। তখন কি হবে? যেহেতু যুদ্ধাপরাধ বিচারের পক্ষের সরকার, সেহেতু তাদের এ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে। জেনারেল জিয়া/এরশাদ/খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকলে এ প্রশ্ন উঠত না। তারা পারলে এদের কবরে স্মৃতিসৌধ তৈরি করতে কসুর করবেন না। আমেরিকা এ সব বিবেচনা করে বিন লাদেনের মৃতদেহ পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। বিন লাদেন এখন বিস্মৃত। কিন্তু, তার মরদেহ পাকিস্তানে থাকলে এখন আজমীরের মতো মাজার শরিফ বানিয়ে ফেলা হতো। আমাদের রাজাকার ও রাজাকারপন্থী পার্টিগুলো কিন্তু এখন থেকেই প্ল্যান ছকে রেখেছে, নবীনগরে গোলাম আযমের মাজার হবে, পিরোজপুরে সাঈদীর আর সাঁথিয়ায় নিজামীর। রাউজানে সাকার স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ হবে। যাতে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের কাছে যুদ্ধাপরাধ কোন বিষয় বলে পরিগণিত না হয়। এবং এক দশক পর হজরত শাহ্ গোলাম আযম পাকিস্তানীর নামে উরস হবে। যেভাবে জিয়াউর রহমানের কবর মাজারে পরিণত করা হয়েছে। এবং এখন খবরের কাগজ ও টিভি প্রতিবেদনে একে মাজার বলেও উল্লেখ করা হয় যদিও তা শরিয়তবিরোধী। এ গুলো হতে পারে, বাংলাদেশী তো। গোলাম আযমের প্রকাশ্য সমর্থনকারী যদি প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হন তাহলে সাকার স্মৃতিস্তম্ভ হতে দোষ কি! আর যাই হোক আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ তথাকথিত মওলানাদের আর যাই থাকুক ভ্যাটিকানের মওলানাদের মতো সাহস আর ধর্মবোধ নেই। তারা যে এরিকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অস্বীকৃতি জানিয়েছে তার কারণ নৈতিকতা, ধর্মবোধ ও মানবতা এবং সভ্যতা বোধ। একটা উপায় হতে পারে, যুদ্ধাপরাধীদের জন্য আলাদা ছোট গোরস্তান।’

মামুনের লেখা পড়ে বিশিষ্ট আলেম, সম্মিলিত ইসলামী জোটের চেয়ারম্যান হাফেজ মওলানা জিয়াউল হাসানকে ফোন করেছিলাম। তিনি জানালেন, ২০০৯ সালের ৩০ ডিসেম্বরে এ নিয়ে তিনি মুক্তাঙ্গনে গণ সমাবেশ করেছেন এবং পবিত্র কোরাণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধী ও গণহত্যাকারীরা আল্লাহ ও রসুলের দুষমন। তাদের জানাজাও পড়া যাবে না, কোন গোরস্থানে কবরও দেয়া যাবে না। মামুনের সঙ্গে তিনি একমত— ওদের জন্য নির্দিষ্ট গোরস্থান থাকতে হবে। তাঁর মতে খুলনার ডাকাতিয়া বিল রাজাকারদের গোরস্থানের উপযুক্ত স্থান। মওলানা জিয়াউল হাসান আরও জানালেন, মহানবীর (সাঃ) এক দুষমন, গণহত্যাকারী আবু জোহলের কবরকে গণশৌচাগারে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

১৯৯৭-এর ৪ ডিসেম্বর ‘একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি’ যুদ্ধাপরাধী এসএ সোলায়মানের লাশ মিরপুর শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের গোরস্থানে দাফন করতে দেয়নি। সোলায়মান যদিও এখানে আগে থেকে জমি কিনে রেখেছিলেন তারপরও নির্মূল কমিটির ২৪ ঘণ্টা অবরোধ অবস্থানের কারণে যুদ্ধাপরাধী সোলায়মানকে তার গ্রামের বাড়িতে দাফন করতে হয়েছে। নির্মূল কমিটির সেই অবরোধ কর্মসূচিতে বরেণ্য কবি শামসুর রাহমান, জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক সৈয়দ হাসান ইমাম, গণআদালতের অন্যতম বিচারক ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের

চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ আবদুল আহাদ চৌধুরী সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

জনকণ্ঠে ২০ অক্টোবর মুনতাসীর মামুনের লেখার শিরোনাম ছিল 'পাকিস্তানি জারজদের রাজনীতিও মানতে হবে?' এ লেখার শুরুতে মামুন চিলির আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অতীতে পিনোচেটের সরকারের নির্যাতনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, গণস্মৃতি বলি কিংবা 'কালেকটিভ মেমরি' বলি একে সব সময় জাগ্রত রাখতে হয়, নাহলে মানুষ অতীত ভুলে যায়। মামুন খালেদা জিয়ার রাজাকার-যুদ্ধাপরাধী-জামায়াতপ্রেমের উল্লেখ করেছেন। খালেদা জিয়ার জামায়াত ও রাজাকারপ্রেমের বোধগম্য কারণ আছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে এসে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা আবুল আলা মওদুদির পুত্র হায়দার ফারুক জানিয়েছেন যেহেতু জামায়াত ও খালেদার অর্থের উৎস ও গডফাদার অভিন্ন সেহেতু খালেদার পক্ষে কখনও জামায়াত বা জামায়াতের দোসরদের সঙ্গ পরিহার করা সম্ভব নয়।

বিএনপি-জামায়াত আবার ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশে যে ১৯৭১ বা ২০০১-এর চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এ বিষয়ে মুনতাসীর মামুন তার কলামে লিখেছেন, আমরা যারা ভুক্তভোগী ভাবতে গেলেও আতঙ্কবোধ করি। ২০০৬ সালে নির্মূল কমিটির পক্ষ থেকে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের জমানায় প্রথম ১৫০০ দিনের সংখ্যালঘু নির্যাতনের শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিলাম। প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠার এই শ্বেতপত্রে ধারাবাহিক সংখ্যালঘু নির্যাতনের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল— এসব নজিরবিহীন নৃশংস নির্যাতনের ঘটনার অস্বীকৃতি। প্রথম থেকেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী এসব নির্যাতনের ঘটনা অস্বীকার করে বলেছেন, 'পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক নির্যাতন সম্পর্কে অতিরঞ্জিত সংবাদ ছাপা হচ্ছে। পত্রিকার যা ছাপা হয়েছে তার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ অসত্য ও ভিত্তিহীন, কারণ পত্রিকার সংবাদের সঙ্গে জেলা প্রশাসকদের পাঠানো রিপোর্টের কোন মিল নেই।' (জনকণ্ঠ, ১৮ অক্টোবর ২০০১)

খালেদা-নিজামীদের জোট সরকারের নীতি ও লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে 'হিন্দুশূন্য' এবং 'আওয়ামী লীগশূন্য' করা। জেলা প্রশাসকদের কি ক্ষমতা ছিল জোট সরকারের এই নীতি ও লক্ষ্যের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবেদন প্রদানের? আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এর পুনরাবৃত্তি হবে না। খালেদা-নিজামীদের জোট সরকার কীভাবে সন্ত্রাসীদের মদদ দিয়েছে, প্ররোচিত করেছে, আশ্রয় দিয়েছে এর বহু বিবরণ নির্মূল কমিটির শ্বেতপত্রে রয়েছে।

তখনকার বহুল আলোচিত ঘটনা সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার পূর্ণিমা শীলকে গণধর্ষণের প্রতিবেদন যখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় তখন স্থানীয় প্রশাসন সাংবাদিকদের উপর খড়্গহস্ত হয়েছিল। ঘটনা ঘটেছিল ২০০১-এর ৮ অক্টোবর, পত্রিকায় এসেছে ১৬ অক্টোবরে। স্থানীয় সাংবাদিকদের অনুরোধে নির্মূল কমিটির প্রতিনিধি দল ১৯ অক্টোবর উল্লাপাড়া গিয়ে পূর্ণিমা ও তার পরিবারের সদস্যদের

জবানবন্দি রেকর্ড করেন। ২০ অক্টোবর পূর্ণিমাকে ঢাকায় এনে সংবাদ সম্মেলনে এই নৃশংস নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরা হয়। পূর্ণিমার মা বাসনারাণী যখন কান্নাভরা গলায় নির্যাতনের বিবরণ দিচ্ছিলেন উপস্থিত সাংবাদিকদের অনেকেই সেদিন অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। অথচ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন বলেছিলেন এটি সম্পূর্ণ সাজানো ঘটনা। পরে আদালতে প্রমাণ হয়েছে এটি কোনও সাজানো ঘটনা ছিল না। পূর্ণিমার ধর্ষণকারীরা সাজা পেয়েছে।

নির্মূল কমিটির শ্বেতপত্রে খালেদা নিজামীদের সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রথম ১৫০০ দিনে ২৭৮৬টি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ২০০১-এর এই অক্টোবর মাসে আমাদের শ্বেতপত্রের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ৩৬০টি ঘটনা ঘটেছিল। বর্তমান সরকারের আমলে গঠিত সাহাবুদ্দিন কমিশনের প্রতিবেদনে এর দ্বিগুণের বেশি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এসব নির্যাতনের জন্য দায়ী খালেদা জিয়ার সরকারকে কখনও কোথাও জবাবদিহি করতে হয়নি। যারা এই সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের প্রধান কুশিলব তাদের বিচার হয়নি। হয়নি বলেই সংখ্যালঘু নির্যাতন বাংলাদেশে এখনও বন্ধ হয়নি।

২০ অক্টোবর জনকণ্ঠে মুনতাসীর মামুনের কলাম শেষ করে প্রথম পাতায় দেখি দারুণ চমকপ্রদ এক সংবাদ, যার শিরোনাম— 'সংখ্যালঘুদের উপর আঘাত এলে প্রতিহত করব ॥ খালেদা জিয়া'। আগের দিন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি গ্রুপের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় ২০০১-২০০৬ সালের প্রধানমন্ত্রী, বর্তমানে বিরোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার এই অভাবনীয় উক্তি পড়ে অনেকগুলো বাংলা প্রবাদ এবং প্রবাদসম বাক্য মনে পড়ল— যার ভেতর বহুল প্রচলিততটি হচ্ছে 'ভূতের মুখে রামনাম'! আরেকটি উদ্ধৃতি দেয়া যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য থেকে— 'একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে!'

যে খালেদা জিয়ার জমানায় পিতা ও স্বামীকে বেঁধে রেখে তার চোখের সামনে মা ও মেয়েকে গণধর্ষণ করা হয়েছে, যার জমানায় এক অসহায় হিন্দু মা আগত ধর্ষকদের জোড়হাতে মিনতি করছেন— 'বাবারা তোমরা একজন একজন করে আসো, আমার মেয়েটা খুব ছোট', সেই খালেদা জিয়া বলছেন, 'সংখ্যালঘুদের ওপর আঘাত এলে প্রতিহত করব! প্রাচীন বাংলা নাটকের সেই বিখ্যাত উক্তিটি নিশ্চয় পাঠকদের মনে আছে— 'কী বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস!'

আজ ২০ অক্টোবর। বার বছর আগে এই দিন সকালে সিরাজগঞ্জ থেকে বিএনপির সন্ত্রাসীদের হাতে ধর্ষিতা পূর্ণিমা সপরিবারে এসে উঠেছিল আমার বাড়িতে। বিকেলে সংবাদ সম্মেলনে পূর্ণিমার মা তাদের গোটা পরিবারের উপর নির্যাতনের বিবরণ দেবেন। সন্ত্রাসীরা পূর্ণিমার উপর পাশবিক নির্যাতন করে ক্ষান্ত হয়নি, বাড়ির সব জিনিষপত্র লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। পূর্ণিমা এবং তার মার পরনে শতচ্ছিন্ন কাপড়। পূর্ণিমার বয়সী আমার কিশোরী কন্যা মুমু আর স্ত্রী ডানাকে বললাম ওদের পরার মতো কিছু কাপড় দিতে। একটু পরে মুমু আমার কাছে এসে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। বলল, বাবা, তুমি দেখেছ পূর্ণিমাকে ওরা কী করেছে? আমি জানি না কী করেছে। পূর্ণিমার তখন কিছু বলার ক্ষমতা ছিল না। আমার মেয়ে পূর্ণিমাকে জামা পরাতে গিয়ে

দেখেছে ওর সারা শরীরে খালেদা জিয়ার হিংস্র হায়নাদের কামড়ের দাগ, গায়ের মাংশ খুবলে নিয়েছে। মুমুর কান্না শুনে মনে হয়েছিল ওর ওপর যদি এমন অত্যাচার হতো আমি কী করতাম। পূর্ণিমাকে ডেকে বলেছি, এখন থেকে মুমুর মতো তুমিও আমার মেয়ে।

আমার পিতৃদায় মোচন করেছে নির্মূল কমিটির সহযোদ্ধারা। শেখ হাসিনা পূর্ণিমার পরিবারকে জমি দিয়েছেন, অর্থ সাহায্য করেছেন। খালেদা-নিজামীদের সন্ত্রাসীদের হাতে নির্যাতিত, নিহত, সম্পদহারা বহু পরিবারকে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেও সাহায্য করেছেন। এসব সাহায্যের কথা কখনও তিনি গণমাধ্যমকে জানাননি।

আজ খবরের কাগজে যখন দেখি হাজার হাজার হিন্দুনারী ধর্ষকদের গডমাদার খালেদা জিয়া বলছেন 'সংখ্যালঘুদের উপর আঘাত এলে প্রতিহত করব', তখন তাকে সবিনয়ে বলতে চাই— তিনি ও তার মন্ত্রীরা তখন যদি এসব ঘটনাকে 'অতিরঞ্জিত' ও 'বানোয়াট' সংবাদ না বলতেন, যদি প্রতিহত করার উদ্যোগ নিতেন তাহলে পূর্ণিমাদের মতো হাজার হাজার মেয়ে হামলা ও নির্যাতন থেকে বেঁচে যেত, তিন লক্ষাধিক হিন্দুকে দেশ ছাড়তে হত না। হিন্দুদের সমর্থন পেতে হলে খালেদা জিয়াকে সবার আগে পূর্ণিমাদের পা ধরে ক্ষমা চাইতে হবে।

জনকণ্ঠের খালেদা জিয়ার খবরে দেখলাম, তাকে বরণ করবার সময় আগত হিন্দুনারীরা উলুধ্বনি দিয়েছেন। ধারণা করতে পারি— এই উলুধ্বনি নিশ্চয় খালেদা জিয়ার কানে গলানো সিসা ঢেলে দিয়েছিল। কারণ '৯১ সাল থেকে শুনছি নির্বাচনী প্রচারণায় খালেদা জিয়ার একটি প্রিয় বাক্য হচ্ছে— আওয়ামী লীগকে ভোট দিলে মসজিদে মসজিদে আজানের বদলে উলুধ্বনি শোনা যাবে। মনে হয় শুভেচ্ছা বিনিময়ে আগত হিন্দু নারীরা এভাবেই উলুধ্বনি দিয়ে খালেদা জিয়ার হিন্দুবিদ্বেষের জবাব দিয়েছেন।

হিন্দু সম্প্রদায়ের যে নেতারা খালেদা জিয়ার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে গিয়েছিলেন তাদের দায় আমরা বুঝি। কদিন আগে কাগজে দেখেছি ভারতের গুজরাটে মুসলমানদের একটি দল নরেন্দ্র মোদীর জন্য ভোট চাইছেন। জামায়াত ও আইএসআইপ্রেমী খালেদা জিয়া যখন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলেন তখন প্রমথ নাথ বিশীর সরস গল্পের সেই বাক্যটি মনে পড়ে— 'বাঘে যখন ঘাস খায়, ডাক্তার যখন ভগবানের নাম নেয় তখন বুঝতে হবে সর্বনাশের আর বাকি নেই।'

২০ অক্টোবর ২০১৩

বাংলাদেশ কোথায় চলেছে

বাংলাদেশের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কীভাবে হবে, কারা নির্বাচিত হতে পারেন, নির্বাচনের পর কী হবে এসব বিষয়ে উত্তপ্ত আলোচনার ঝড় দেশের সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ছড়িয়ে পড়েছে। নিকট অতীতে অন্য কোনও দেশের নির্বাচন নিয়ে এত জল্পনা কল্পনা কোথাও এভাবে হতে দেখিনি যেমনটি দেখছি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। প্রতিদিন বিভিন্ন দেশের আইনপ্রণেতারা ঢাকা আসছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা আসছেন, সাংবাদিকরা আসছেন, সরকারি কর্মকর্তারা আসছেন, এমনকি নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী এনজিও প্রতিনিধিরাও আসা আরম্ভ করেছেন। তারা রাজনৈতিক দলের নেতা, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি— সবার সঙ্গে বৈঠক করছেন। প্রশ্ন একটাই— বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে।

গত ১০ নবেম্বর দিল্লী গিয়েছিলাম বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতি ও মানবাধিকার পরিস্থিতি সংক্রান্ত এক সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য। ১২ নবেম্বর ফিরে এসে তিনটি আমন্ত্রণপত্র পেলাম ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারত থেকে। সর্বত্র আলোচনার বিষয় এক— বাংলাদেশ কোন পথে? আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশে কারা জয়ী হবে, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তি না জঙ্গী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী?

বাংলাদেশ সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে আসা বিদেশী সাংবাদিকদের কেউ কেউ টেলিভিশনের টক শো-এর পরিচিত কিছু মুখের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের বাংলাদেশ সম্পর্কে সর্বজ্ঞ বিবেচনা করে দেশে ফিরে লেখেন বর্তমান সমস্যার মূল— 'দুই বেগম' বা 'দুই মহিলা'র বিরোধ বা ঝগড়া। তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন বুঝতে চাইছে দক্ষিণ এশিয়ার ১৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত, অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় দ্রুত অগ্রসরমান একটি রাষ্ট্র আগামী পাঁচ/দশ বছরে কোন লক্ষ্যে অনুগমণ করবে। মোটা দাগে বলতে গেলে ২০০১-২০০৬ বিএনপি-জামায়াত জোটের আমলে বাংলাদেশের যাত্রা যে লক্ষ্যে ছিল সেই পথে ফিরে যাবে, না ২০০৮-২০১৩ আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের আমলে যে পথে যাচ্ছে সে যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগের একটি বড় কারণ হচ্ছে— ২০০১-২০০৬ বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোটের শাসনামলে বাংলাদেশে জঙ্গী মৌলবাদের চাষ হয়েছে মাশরুমের মতো, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের রফতানি হয়েছে প্রতিবেশি ভারত থেকে আরম্ভ করে বার্মা, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায়। এ সময়ে বাংলাদেশ যুক্ত হচ্ছে আল কায়দা, তালেবান ও মুসলিম ব্রাদারহুডের আন্তর্জাতিক জিহাদী বলয়ের সঙ্গে। ইংল্যান্ড থেকে বাংলাদেশী যুবকরা আফগানিস্তানে জিহাদ করতে গিয়ে মার্কিন সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে বহুদিন

গুয়ানতানামোর কারাগারে বন্দিজীবন যাপন করেছে। জঙ্গী মৌলবাদীদের হামলায় তখন রাজনৈতিক দলের নেতা, মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী বা নিরীহ নাগরিকরা শুধু নিহত/আহত হননি, বৃটিশ রাষ্ট্রদূতও জঙ্গীদের বোমার আঘাতে আহত হয়েছিলেন সিলেটে হযরত শাহজালালের মাজারে। আক্রান্ত হয়েছে প্রেক্ষাগৃহ, যাত্রানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সমাবেশ ও সুফী সাধকদের মাজার। আক্রান্ত হয়েছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিশেষভাবে হিন্দু ও খৃস্টানরা। খালেদা-নিজামীদের জোট সরকারের প্রথম এক বছরে প্রায় তিন লক্ষ হিন্দু চোদ্দ পুরুষের পৈত্রিক ভিটার মায়া কাটিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় রাতের অন্ধকারে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। এদের অধিকাংশ পরে ফেরত এলেও অনেকে এখনও রাষ্ট্রহীন হওয়ার কারণে ভারতে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। এগুলো নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগের বিষয়।

এর পাশাপাশি আমরা যা লক্ষ্য করছি সেটাও কম উদ্বেগের নয়। আমেরিকা এতদিন আড়ালে আবডালে জামায়াতের পক্ষে কথা বলত, আবার তালেবান-আল কায়দারও বিরোধিতা করত। এখন তালেবানদের সঙ্গে কথা বলার জন্য যেমন পাকিস্তানকে চাপ দিচ্ছে তাদের ভাষায় 'মডারেট ইসলামী দল' জামায়াতকে নিষিদ্ধ না করে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য যত্রতত্র দৌড়ঝাঁপ করছে। বাংলাদেশে কীভাবে নির্বাচন হবে এ নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দিল্লী পর্যন্ত দৌড়নোকে কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সুনজরে দেখবেন না। সরকারিভাবেও এর সমালোচনাও করা হয়েছে।

গত সপ্তাহে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তারা বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। তারা অনেক রথী-মহারথীর সঙ্গে কথা বলেছেন, আবার আমার মতো অভাজনের বক্তব্যও শুনেছেন। গত দশ বছর ধরে যখনই ওয়াশিংটন যাই, স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্তাদের সঙ্গে কথা হয়। জামায়াতের সন্ত্রাসী চরিত্র এবং জঙ্গী জিহাদী রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের অবস্থানের সঙ্গে আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের অবস্থান ১৮০ ডিগ্রি বিপরীতে। বাংলাদেশে ও পাকিস্তানে আমার মতো রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা জানে যাবতীয় জঙ্গী মৌলবাদীদের গড ফাদার জামায়াত। জামায়াত ও ব্রাদারহুডের জিহাদী রাজনীতি তালেবান ও আল কায়দার মতো সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্ম দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে, দেশে দেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করছে, তারপরও বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামী এবং মিশরের মুসলিম ব্রাদারহুডকে আমেরিকা মনে করে মার্জিত ইসলামের প্রতিভু! আমেরিকার নীতিনির্ধারকরা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মুসলমানপ্রধান দেশগুলোতে যেভাবে জঙ্গী মৌলবাদীদের মদদ দিচ্ছে ভবিষ্যতে তা আমেরিকার জন্যও সমূহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে, বিপর্যস্ত হবে মানবসভ্যতার যাবতীয় অর্জন।

পাকিস্তানে ও আফগানিস্তানে আমেরিকা একদিকে তালেবানদের সঙ্গে সংলাপের কথা বলছে অন্যদিকে ড্রোন হামলা অব্যাহত রেখে তালেবানদের হত্যা করছে। এসব হামলায় যত না তালেবান নিহত হচ্ছে, তার দশগুণ হচ্ছে সাধারণ মানুষ। আমেরিকার

ড্রোন হামলায় জর্জরিত উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মানুষ দিন দিন তালেবানদের পক্ষে সহানুভূতিশীল হচ্ছে, পাশাপাশি আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষও তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। পাকিস্তান-আফগান সীমান্তে আফিম চাষের মতো আমেরিকা সর্বত্র জঙ্গী মৌলবাদ চাষ করছে। আধিপত্য বিস্তারের আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে আমেরিকা জামায়াতকে মার্জিত ইসলামের সনদ দিচ্ছে।

বাংলাদেশে কখনও যদি আরব্য উপন্যাসের সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো বিএনপির ঘাড়ে ভর করে জামায়াত আবার ক্ষমতায় আসে জঙ্গী জিহাদী চাষ আগের চেয়ে দশগুণ বৃদ্ধি পাবে। ৯/১১-এর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের মতো ঘটনাও দশগুণ বৃদ্ধি পাবে। ধর্মবর্ণবিত্ত নির্বিশেষে নিরীহ আমেরিকানের মৃত্যুর সংখ্যা হাজারের কোঠা অতিক্রম করে লাখের ঘরে পৌঁছবে। কিন্তু এর বিনিময়ে আমেরিকা বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ পাবে। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের দাপটের কারণে সম্ভব না হলেও এবার সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে ঘাঁটি গাঁড়বে। জঙ্গী দমনের নামে ড্রোন হামলায় জর্জরিত হবে বাংলাদেশ এবং অচিরেই পরিণত হবে পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানের মত একটি অভিশপ্ত জনপদে। এভাবেই পাকিস্তান ও আমেরিকা '৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে জামায়াতকে মিত্র বানিয়ে।

২০১৪ সালে ন্যাটোর সৈন্যবহর আফগানিস্তান থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। পাকিস্তানও ন্যাটোর জন্য বিপদজনক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে বিএনপির মত বড় দলকে জামায়াত সঙ্গী হিসেবে পেলেও পাকিস্তানে কোনও বড় দলই জামায়াতকে বিশ্বাস করে না। '৭১-এর গণহত্যার দায়ে জামায়াতের শীর্ষ নেতারা কারাগারে আটক কিংবা মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষায় থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশের জামায়াত সুবিধাজনক অবস্থানে আছে বিএনপি ও তথাকথিত সুশীল সমাজের কারণে। পাকিস্তানের সুশীলরা জামায়াত পছন্দ না করলেও বাংলাদেশের সুশীলরা গণহত্যাকারীদের বিচারে বহু অস্বচ্ছতা এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আবিষ্কার করেছেন জামায়াতের বিত্তভাণ্ডারে বশীভূত হওয়ার কারণে। আমার সাম্প্রতিক প্রমাণ্যচিত্র 'চূড়ান্ত জিহাদ'-এ সৌদি ইসলামী চিন্তাবিদ ও সন্ত্রাস বিশেষজ্ঞ ড. ইরফান আলাভী বলেছেন, ২০০৯ সালে সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো মুসলমানপ্রধান দেশসমূহে কর্মীদের প্রশিক্ষণ, প্রচারাভিযান এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ৫০ বিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ করেছে, যা ব্যয় হবে জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম ব্রাদারহুডের মাধ্যমে। অধ্যাপক আবুল বারকাতের গবেষণা থেকে আমরা জেনেছি বাংলাদেশে বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য ব্যবসা থেকে প্রতি বছর জামায়াতের নিট মুনাফা ২ হাজার কোটি টাকা, যার ১৫-২০ ভাগ তারা ব্যয় করে সাংগঠনিক কাছে। যে কারণে টেলিভিশনের 'টক শো'-এ, দৈনিকের কলামে কিংবা আন্তর্জাতিক সেমিনারে গণহত্যাকারী, জঙ্গী সন্ত্রাসী জামায়াতের পক্ষে কথা বলার মতো বায়সের অভাব হয় না। জামায়াত জানে দানা ছড়ালেই কাক আসে।

আমার মতো অভাজনের সঙ্গে গত দু সপ্তাহে বাংলাদেশ সফররত বেশ কয়েকজন সাংবাদিক, সন্ত্রাস বিশেষজ্ঞ, আইনপ্রণেতার কথা হয়েছে। তারা দুই নেত্রীর সংলাপে

যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সবাই টেলিফোন সংলাপের ব্যর্থতায় উদ্বিগ্ন। আমাদের পণ্ডিতদের কেউ কেউ বলেছেন শেখ হাসিনা বিএনপি-জামায়াতকে বাদ দিয়ে একদলীয় নির্বাচন করতে বদ্ধ পরিকর, যে কারণে তিনি আর খালেদা জিয়াকে ফোন করবেন না, তত্ত্বাবধায়ক সরকারও গঠন করবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কোন পণ্ডিত নই। সাধারণ জ্ঞানে এটুকু বুঝতে কারও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়— যে নির্বাচনে জামায়াত দলীয় পরিচয়ে দাঁড়াবার অযোগ্য বলে ঘোষিত হয়েছে উচ্চতর আদালত থেকে, সে নির্বাচনে বিএনপির দয়ার উপর দাঁড়িয়ে, বিএনপির প্রতীক নিয়ে কেন জামায়াত নির্বাচন করবে এবং কেনইবা এমন নির্বাচন বাংলাদেশে হতে দেবে? জামায়াত জানে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধন বাতিল হওয়ার পর দলীয় প্রতীক 'দাঁড়িপাল্লা' নিয়ে তারা নির্বাচন করতে পারবে না। বিএনপির বদান্যতায় দলের কেউ কেউ 'ধানের শীষ' প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন বটে তাতে জামায়াতের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিএনপির গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। ৫৬ বছর ধরে জামায়াত যে প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করছে সেটি বাদ দিয়ে অন্য প্রতীক নেয়া জামায়াতের জন্য আত্মহত্যার নামান্তর। জামায়াত আত্মহত্যা করতে চায় না বলে তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচালের মতো নির্বাচন বানচালের জন্য যা কিছু করা দরকার সবই করছে এবং ভবিষ্যতে এর মাত্রা আরও ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর হবে।

দুর্নীতির মামলায় খালেদা জিয়া, তারেক জিয়া এবং বিএনপির আরও অনেক নেতা জর্জরিত। সংগঠন বলতে বিএনপির কিছু নেই, আছে ভাড়াটে সন্ত্রাসী। জামায়াত লোকসমাগম না ঘটালে খালেদা জিয়ার সমাবেশকে মহাসমাবেশ বলা যাবে না। সর্বশেষ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের শো-ডাউনে উপস্থিত সাংবাদিকদের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে শতকরা ৮০ ভাগ ছিল জামায়াতের। বিএনপির ছাত্রদল যাও কিছু সমাগম করেছিল জামায়াতের ছাত্রশিবিরের ধাওয়া খেয়ে তাদের জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের তত্ত্ব জামায়াতের আবিষ্কার এ কথা আমরা '৯৬ সালেই বলেছিলাম। তখন আওয়ামী লীগের পক্ষে এ তত্ত্ব গলাধঃকরণ ছাড়া উপায় ছিল না, কারণ খালেদা জিয়ার বিএনপি মাগুরা মার্কা নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছিল দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কী ভয়ঙ্কর হতে পারে। এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। গত পাঁচ বছরে যাবতীয় নির্বাচনে অধিকাংশ আসনে সরকারবিরোধী প্রার্থী জয়ী হয়েছে। উচ্চতর আদালতের রায়ে সংবিধান সংশোধিত হয়েছে। নির্বাচনকালীন সরকারে বিএনপিকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে শেখ হাসিনা প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। বিএনপির নেতারা বক্তৃতা-বিবৃতিতে যেমন বলেন শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ তাদের পক্ষে তাহলে সর্বদলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচনে যেতে তাদের আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু বাধা হচ্ছে জামায়াত। যে নির্বাচনে জামায়াতের অস্তিত্ব থাকবে না সে নির্বাচন জামায়াত হতে দেবে না।

এ কথা আমরা বহুবার বলেছি জামায়াতের মতো হিংস্র হায়নাদের বেলাগাম ছেড়ে দিলে তারা গোটা বাংলাদেশ তছনছ করে ফেলবে। হরতালের পর হরতাল, হরতালের নামে নিরীহ মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা, যানবাহনে আগুন, রেল লাইন উপড়ে ফেলা

সব কিছু বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছে '৭১-এর দিকে। রাজধানীতে একের পর এক আবিষ্কার হচ্ছে জামায়াত শিবিরের বোমা বানাবার কারখানা।

'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠনের আগে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা ''৭১-এর যাত্রী' নামে একটি সংগঠন করেছিলেন। আমার ঘরে '৭১-এর যাত্রীর শেষ পোস্টারটি এখনও দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। পোস্টারে গণআদালতে শহীদজননী জাহানারা ইমামের বিজয়চিহ্ন দেখানো সেই কালজয়ী ছবি, নিচে তাঁর তিনটি উদ্ধৃতি— 'একাত্তরের ঘাতক দালাল যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা নেই', 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য আমৃত্যু লড়ে যাব', এবং 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলুন'। জাহানারা ইমাম সূচিত মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনের একুশ বছরে যে প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে তারা ঢাকার শাহবাগ থেকে আরম্ভ করে তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত তারুণ্যের মহাজাগরণ ঘটিয়েছে। যে তরুণ '৭১ দেখেনি, অনেকে জাহানারা ইমামকেও দেখেনি— তারা জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধকরণের দাবি থেকে এক চুলও নড়বে না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে তারা বদ্ধপরিকর।

আগামী নির্বাচনে প্রায় পাঁচ কোটি ভোটারের বয়স ৩৫-এর নিচে। নারী-ভোটার পাঁচ কোটির উপরে। সংখ্যালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সম্প্রদায়ের ভোটার এক কোটির কাছে। ভোটের হিসেবেও জামায়াত নিষিদ্ধ না করার বিকল্প নেই। আমেরিকা বাংলাদেশে এসে ভোট দেবে না। আইএসআই সন্ত্রাস করতে পারবে, তালিকা তৈরি করে '৭১-এর মতো হত্যাকাণ্ডও চালাতে পারবে, বাংলাদেশে এসে ভোট দিতে পারবে না। তাহলে কেন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে জামায়াত নিষিদ্ধ করা যাবে না? '৭১-এ যদি পাকিস্তান ও আমেরিকাকে পরাজিত করে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারি এখন কেন পারব না?

নির্বাচন কমিশন সেনা মোতায়েনের কথা বলেছেন। শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন নির্বাচনের স্বার্থে এখনই সেনা মোতায়েন প্রয়োজন। প্রতি সপ্তাহে ৩-৪ দিন হরতাল দিয়ে বার বার জননিরাপত্তা বিপন্ন হবে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে— এ পরিস্থিতি চলতে দেয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার দায় সশস্ত্র বাহিনীর।

বিদেশী পর্যবেক্ষকরা প্রশ্ন করতে পারেন বাংলাদেশ কোন পথে যাবে— উদার গণতন্ত্র না মৌলবাদী সন্ত্রাস, কিন্তু আমাদের তো এ নিয়ে সংশয় থাকা উচিত নয়। যে লক্ষ্যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে, ৩০ লক্ষ শহীদের জীবনের মূল্যে যে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে বাংলাদেশ সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাবে।

১৪ নবেম্বর ২০১৩

মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনে নাগরিক সমাজের ভূমিকা

বাংলাদেশের মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সমাজপ্রগতির আন্দোলনে রাজনৈতিক দলের বাইরে নাগরিক সমাজ সব সময় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। নাগরিক সমাজের আন্দোলন অনেক সময় রাজনৈতিক আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছে। দেশ ও সমাজের প্রতি শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের এই দায়বদ্ধতা দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশসমূহে বিরল। ১৯৪৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির পর বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যাগুরু মুসলমানদের ভেতর আত্মপরিচয়ের সংকট প্রবল ছিল। 'পাকিস্তানি', 'মুসলমান' আর 'বাঙালি' এই তিন পরিচয়ের ভেতর কোনটি বড়, বিরোধ বৈরি না অবৈরি— এ নিয়ে এ দেশের বিদ্বৎসমাজে অনেক বিতর্ক হয়েছে। এর সমাধানও করেছিলেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ।

১৯৪৮ সালে তৎকালীন পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় জিন্নাহ যখন সংখ্যালঘুর ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন— এ অঞ্চলের পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অনেক রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও বুদ্ধিজীবী আহত ও বঞ্চিত বোধ করেছিলেন। যারা এক সময় পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তান সম্পর্কে তাদের অনেকের মোহমুক্তি ঘটতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়নি। ১৯৪৮-১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা নবরূপে দৃশ্যমান হয়। শিক্ষিত সমাজের ভেতর ধর্ম ও নাগরিকত্বের চেয়ে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পরিচয় প্রবল হয়ে ওঠে। ষাটের দশকে সরকারিভাবে রবীন্দ্রবিরোধিতা ও বর্জন বাঙালিত্বের চেতনাকে আরও শাণিত করে। রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন বাঙালির প্রতিবাদ ও আন্দোলনের অন্যতম অবলম্বন।

১৯৭০-এর নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুসারী আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় এবং পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে বাংলার লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীদের অবদান অনস্বীকার্য। '৫০ ও '৬০-এর দশকের বিভিন্ন দৈনিক ও সাময়িকপত্রে এর সত্যতা পাওয়া যাবে। ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক চেতনা আরও প্রবল হয়েছে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে। এই মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি, আদিবাসী, মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, আস্তিক, নাস্তিক সবাইকে ধর্মনিরপেক্ষ মানবিকতার চেতনায় শাণিত করে ধর্মের নামে গণহত্যাকারী ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদ্দীপ্ত করেছিল। এ কারণেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল 'গণতন্ত্র', 'সমাজতন্ত্র', 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'জাতীয়তাবাদ'। তিরিশ

লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এই অনন্যসাধারণ সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করা হয়েছিল ধর্মের নামে হত্যা, নির্যাতন, বৈষম্যের অবসান ঘটাবার জন্য এবং একই সঙ্গে ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে গণহত্যা সহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী নৃশংস অপরাধে সহযোগিতা করেছিল জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দল। '৭২-এর সংবিধানে তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর বিভিন্ন মাধ্যমে তারা এর মূলনীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেছে, ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে ধর্মহীনতা এবং এটি ইসলামবিরোধী। যদিও ১৯৭২-এর সংবিধানপ্রণেতারা ধর্মকে রাষ্ট্র এবং রাজনীতি থেকে বিযুক্ত করলেও ব্যক্তিজীবনে ধর্মপালনের অধিকার বা ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতাকে খর্ব করেন নি।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ হচ্ছে প্রথম দেশ যেখানে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান গ্রহণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশে সেক্যুলারিজমের ধারণা পশ্চিমের চেয়ে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। বাংলাদেশে এবং ভারতেও সেক্যুলারিজম বলতে বোঝায় রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছিন্নতা (Separation of state from religion), ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা নয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তাতে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা আইন করে ধর্মকে নিষিদ্ধ করতে চাই না এবং করব না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের বাধা দিবার ক্ষমতা এই রাষ্ট্রের কারো নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কারো বাধা দিবার মত ক্ষমতা নেই। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম পালন করবে, খৃষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরী, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যাভিচার বাংলাদেশের মাটিতে চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিষ। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে— আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করেছি।" (গণপরিষদের ভাষণ, ৪ নবেম্বর ১৯৭২)

ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য '৭২-এর সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, যা সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বাইরে তুরস্ক ছাড়া কোন সেক্যুলার গণতান্ত্রিক দেশে সম্ভব হয়নি। এই সংবিধান কার্যকর থাকলে বাংলাদেশে বর্তমানে ধর্মের নামে রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস এবং জঙ্গী মৌলবাদের জেহাদী উন্মাদনা দেখতে হতো না।

'৭২-এর সংবিধানে সেক্যুলারিজমকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণের পর এটি দুই ধরনের সমালোচনা শিকার হয়। এক পক্ষ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, যারা ইসলামকে মনে করে পরিপূর্ণ জীবনবিধান, যা রাষ্ট্র-রাজনীতি-

অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতি-পরিবার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। অপরপক্ষ হচ্ছে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা, যারা পশ্চিমের প্রভাবে ধর্মকে ব্যক্তি ও সমাজজীবন থেকে নির্বাসনের পক্ষে। মৌলবাদীরা বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে আক্রমণ করেছেন এই বলে যে— ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে নাস্তিকতা, রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হলে মানুষের ধর্মপালন ও প্রচারের স্বাধীনতা থাকবে না। মৌলবাদী নয়, এমন দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনা ছিল— '৭২-এর সংবিধানপ্রণেতারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানে ঢুকিয়ে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও ধর্মের প্রতি অনুরাগের বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। শতকরা ৮৫% মুসলমানের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যদিও বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোগী যাঁরা '৭২-এর সংবিধান প্রণয়ন করেছেন তাঁরা ধর্মকে রাষ্ট্র ও রাজনীতি থেকে পৃথক করার কথা বললেও ব্যক্তিজীবনে ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বার বার তাঁদের বলতে হয়েছে— 'ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়'।

অপরদিকে বামপন্থীরা বঙ্গবন্ধুর সেক্যুলারিজম সম্পর্কিত ধারণাকে গোঁজামিল আখ্যা দিয়ে বলেছেন, সেক্যুলারিজমের অর্থ হচ্ছে ইহজাগতিকতা, রাষ্ট্র ও সমাজের কোথাও ধর্মের স্থান থাকবে না, কারণ ইহজগতের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যে ধর্মহীনতা নয় এটা প্রমাণের জন্য বঙ্গবন্ধুর সরকারের আমলে মদ্যপান ও ঘোড়দৌড় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠান আরম্ভ করা হতো সকল ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠের মাধ্যমে, ইসলামী ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছিল, বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্য সংস্থার সদস্য হয়েছিল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ভেঙে ফেলা সব মসজিদ পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল এবং মাদ্রাসার সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তারপরও বঙ্গবন্ধু এবং চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়েছিল যাঁরা ছিলেন '৭২-এর সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা।

১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধু এবং তার সহযোগীদের নৃশংস হত্যাকান্ডের পর ক্ষমতায় এসে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করে বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত সকল গণহত্যাকারীদের কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি '৭২-এর সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'সমাজতন্ত্র' ও 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' বাতিল করে, ধর্মের নামে রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে, সংবিধানের উপরে 'বিসমিল্লাহ...' এবং মুখবন্ধে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা...' সংযোজন করে বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজের 'ইসলামীকরণ' ও 'পাকিস্তানিকরণে'র সূচনা করেছিলেন। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ আলোকাভিসারী জাতিকে মধ্যযুগীয় তামসিকতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এর যৌক্তিক পরিণতি হচ্ছে '৭১-এর গণহত্যাকারী, মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক জামায়াতে ইসলামীর রাষ্ট্রক্ষমতায় অংশীদারত্ব, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে শতাধিক মৌলবাদী জঙ্গী সংগঠনের জন্ম ও বিস্তার, বাংলাদেশকে 'মুসলিম ব্রাদারহুড' ও 'আল কায়দা'র আন্তর্জাতিক জেহাদী বলয়ের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ এবং হেফাজতে ইসলাম-এর সাম্প্রতিক উত্থান।

দুই

মুক্তিযুদ্ধোত্তর ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটেছে প্রধানতঃ সরকারি পৃষ্ঠাপোষকতায়। ১৯৭২ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ৪১ বছরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল সাড়ে ১৩ বছর। বাকি সাড়ে ২৭ বছর ক্ষমতায় ছিল বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং বিএনপি-জামায়াত জোট। যখন বিএনপি ও জাতীয় পার্টি এককভাবে ক্ষমতায় ছিল তখনও জামায়াত নেপথ্যে থেকে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রভাবিত করেছে এবং সমাজ ও রাজনীতির 'ইসলামিকীকরণ' প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে।

পাকিস্তানের ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখা যাবে জামায়াত কখনও এককভাবে কেন্দ্রে বা প্রদেশে ক্ষমতায় যেতে পারেনি। জামায়াতের ভোটের পরিমাণ সেখানে ৬%-এর বেশি নয়। কিন্তু জামায়াত কখনও ক্ষমতার শরিক হয়ে এবং শরিক না হয়েও তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছে। ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জিন্নাহ পাকিস্তান সৃষ্টি করলেও তিনি একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন আনুষ্ঠানিকভাবে এ দেশের জন্মলাভের আগেই। ১৯৪৭-এর ১১ আগস্ট আইন সভার ভাষণে তিনি ধর্ম ও রাষ্ট্রের ভেতর বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছিলেন। জিন্নাহর মৃত্যুর পর পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র বানাবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন আবুল আলা মওদুদি এবং তার দল জামায়াতে ইসলামী। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পাকিস্তানে জামায়াতের প্ররোচনায় জুলফিকার আলী ভুট্টোর সরকার কাদিয়ানিদের সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। ভুট্টোকে উৎখাত করে জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতা দখল করে জামায়াতকে সঙ্গে নিয়েই সরকার গঠন করেছিলেন, যে সরকার পাকিস্তানে ব্লাসফেমি আইন সহ শরিয়া ও হুদুদ আইন প্রচলন করেছিল এবং চলচ্চিত্র শিল্পসহ যাবতীয় সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিল।

একইভাবে বাংলাদেশে জামায়াত জেনারেল জিয়াউর রহমানকে দিয়ে সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা', 'সমাজতন্ত্র' ও 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' বাদ দিয়েছে এবং জেনারেল এরশাদকে দিয়ে সংবিধানে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংযোজন করেছে, যেমনটি তারা করেছিল পাকিস্তানে। ১৯৫২ সাল থেকে জামায়াত পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলাবাহিনী এবং সিভিল প্রশাসনে পরিকল্পিতভাবে দলীয় কর্মীদের ঢুকিয়েছে এবং বাংলাদেশেও ১৯৭৫-এর পর থেকে তারা নিষ্ঠার সঙ্গে এ কাজটি করেছে। যার ফলে ক্ষমতায় না থাকলেও সরকারের নীতি নির্ধারণ এবং প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে জামায়াত সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আওয়ামী লীগ আমলেও মাদ্রাসা শিক্ষার বিস্তার, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, সরকারি প্রচার মাধ্যমে ধর্মের গুরুত্ব, এমনকি পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রেও এর প্রভাব দৃশ্যমান।

সরকার ও প্রশাসনের ছত্রছায়ায় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার যেমন ঘটেছে এর বিরুদ্ধে নাগরিক সমাজের প্রবল প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধও বাংলাদেশে কম শক্তিশালী নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক— লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা তাদের লেখালেখি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং রাজপথের আন্দোলনে মৌলবাদ ও

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, নির্দিষ্টভাবে জামায়াতে ইসলামীকে দল হিসেবে নিষিদ্ধ করা এবং '৭১-এর মানবতাবিরোধী অপরাধী ও গণহত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে সব সময় সোচ্চার রয়েছেন।

১৯৯২-এর জানুয়ারিতে শহীদজননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং জামায়াত-শিবির চক্রের মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে যে অভূতপূর্ব নাগরিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছে তার মূল লক্ষ্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভাস্বর ১৯৭২-এর সংবিধানের পুনঃপ্রবর্তন। জেনারেল জিয়া, জেনারেল এরশাদ এবং খালেদা জিয়ার সরকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনা মুছে ফেলে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় পাকিস্তান বানাতে চেয়েছে। এর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনকে বেগবান করেছে, কখনও নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে নাগরিক সমাজের আন্দোলন। জাহানারা ইমামের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বহু সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও আন্দোলনের জন্ম হয়েছে, যার সাম্প্রতিক উদাহরণ হচ্ছে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ।

প্রধানতঃ নাগরিক সমাজের এই আন্দোলনের প্রভাব ও ব্যাপকতায় ভীত হয়ে জামায়াত হেফাজতে ইসলাম এবং অন্যান্য জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনকে মাঠে নামিয়েছে। জামায়াত জানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে দলের শীর্ষ নেতাদের কেউ মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাবেন না এবং দল হিসেবে জামায়াতের অস্তিত্ব থাকবে না। সে কারণে তারা মরিয়া হয়ে যাবতীয় হত্যা, সন্ত্রাস, নাশকতা ও ধ্বংসের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। জামায়াতের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ২০১০ ও ২০১১-এ ঘটেছে বিক্ষিপ্তভাবে। কিন্তু ২০১২-এর শেষে কক্সবাজারের বৌদ্ধপল্লীতে ভয়াবহ হামলার পর থেকে সুপরিকল্পিতভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। জামায়াত যখনই সুযোগ পাচ্ছে তখনই তারা হরতাল ও অবরোধে জাতীয় সরকারবিরোধী আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে। জামায়াতের এই সন্ত্রাস এবং ধ্বংসযজ্ঞে সরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে আরম্ভ করে মানুষের জীবন-জীবিকা সব কিছু বিপন্ন। তারা আঘাত করছে বাংলাদেশের সংবিধান, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে। জামায়াতের এসব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের প্রধান অবলম্বন হচ্ছে বিএনপি।

তিন

উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও দাঙ্গার সোয়াশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে শতকরা নিরানব্বই ভাগ দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অতিরঞ্জিত, মিথ্যা সংবাদ এবং/অথবা গুজবকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশে গত এক বছরের সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সন্ত্রাসের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সুপরিকল্পিতভাবে মিথ্যাচার অথবা গুজবের আশ্রয় নেয়া হয়েছে এবং মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি দক্ষতার সঙ্গে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

অতীতে সংবাদপত্র বা ইশতেহার ছাড়া মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত সংবাদ বা গুজব প্রচারের অন্য কোন মাধ্যম ছিল না। কখনও লোকমুখে প্রচারিত হলেও সহিংসতার

ঘটনা নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরে ঘটত না। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় আবিষ্কার, ইন্টারনেটে ফেসবুক, ব্লগ, ওয়েবপেজ, টুইটার প্রভৃতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে আরব বসন্ত বা শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের মতো ইতিহাস সৃষ্টি করা যেমন সম্ভব, একইভাবে ফেসবুকে বা ওয়েবপেজ-এ বানোয়াট ছবি বা দৃশ্য তৈরি করে রামুর বৌদ্ধপল্লীতে হামলা কিংবা চাঁদে যুদ্ধাপরাধী সাঈদীর ছবি দেখা গেছে বলে যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায় তাদের উপর সশস্ত্র হামলা, হত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও ধ্বংসের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করা সম্ভব হয়েছে। ট্রাইবুনালে সাঈদীর মামলার রায় ঘোষণার দিনই সারা দেশে জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা এই বলে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে— 'তোদের সাক্ষীর কারণে সাঈদী হুজুরের ফাঁসি হয়েছে। বাংলাদেশে কোনও হিন্দু থাকতে পারবে না।'

৫ মে (২০১৩) হেফাজতের সমাবেশে হাজার হাজার আলেমকে হত্যা করা হয়েছে এমন গুজব ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে শুধু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নয়, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া সহ কিছু মানবাধিকার সংগঠনকেও ব্যবহার করা হয়েছে। যোগাযোগ ও প্রচার মাধ্যমের এই নেতিবাচক ও নিন্দনীয় কর্মকাণ্ড বন্ধের জন্য দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে সেটাকে সংবিধান স্বীকৃত মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর আঘাত বলে প্রচার করা হচ্ছে।

যে কোনও যুদ্ধে উভয় পক্ষ শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করা বা জয়ী হওয়ার জন্য অনেক সময় গুজবের আশ্রয় নেয়, যা যুদ্ধের আইনের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে নিন্দনীয় ও অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়েছে। গত এক বছরে জামায়াত ও হেফাজত তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সব মিথ্যাচার ও গুজবের আশ্রয় নিয়েছে তার প্রধান বাহন ছিল গণমাধ্যম। জামায়াত-বিএনপির মুখপত্র হিসেবে পরিচিত দৈনিক 'আমার দেশ', 'নয়াদিগন্ত', 'সংগ্রাম', 'দিগন্ত টেলিভিশন' ও 'ইসলামিক টিভি' রামুর বৌদ্ধপল্লীতে হামলা কিংবা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মামলার রায়ে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর সারা দেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার ক্ষেত্র তৈরি করেছে, প্রকৃত হামলাকারীদের আড়াল করে তাদের রক্ষা করেছে এবং হামলা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে নিয়ামক ভূমিকা পালন করেছে। একইভাবে ৫ মে হেফাজতের শাপলা চত্বরের সমাবেশে এক রাতে হাজার হাজার মানুষকে সরকারের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হত্যা করেছে এমন গুজব ছড়িয়ে মৌলবাদী সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটিয়েছে এবং বিদেশে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করেছে।

কতিপয় গণমাধ্যমের দায়িত্বজ্ঞানহীন ভয়ঙ্কর আচরণের বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিক সমাজ সব সময় সোচ্চার ছিল। প্রাক্তন বামপন্থী এবং হালের জঙ্গী মৌলবাদীদের মুখপাত্র এনজিও কর্মকর্তা ফরহাদ মাজহার বিভিন্ন গণমাধ্যমের কার্যালয়ে এবং সাংবাদিকদের উপর সন্ত্রাসী বোমা হামলার পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে বলেছেন, এরকম হামলা আরও চালানো উচিৎ। বিএনপি নেতা মাহমুদুর রহমানের মালিকানাধীন 'আমার দেশ' পত্রিকা কীভাবে কাবা শরিফের গিলাফ বদলানোর ছবিকে সাঈদীর পক্ষে

কাবার ইমামদের প্রতিবাদ বলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বানোয়াট সংবাদ ছেপেছে তার বিবরণ 'ডেইলি স্টার'-এ বিষদভাবে দেয়া হয়েছে। 'ডেইলি স্টার'কে সরকার সমর্থক পত্রিকা মনে করবার কোনও কারণ নেই। এই পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতারেরও নিন্দা করেছেন মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব করা হয়েছে বলে। এ বিষয়ে বিশিষ্ট লেখক, কলামিস্ট মুহম্মদ জাফর ইকবালের একটি লেখা (শিরোনাম ঃ মিথ্যা বলার অধিকার) ১৬ আগস্ট ২০১৩ ঢাকার ৪টি দৈনিক এবং কয়েকটি অনলাইন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, যেটি শ্বেতপত্রের দ্বিতীয় খণ্ডেও সংকলিত হয়েছে। জাফর ইকবাল লিখেছেন—

> 'কোনো একটা ছুটির পর শিক্ষকদের সাথে কথা বলছি, তখন হঠাৎ করে তাদের কাছ থেকে একটা বিচিত্র বিষয় জানতে পারলাম, তারা সবাই তাদের নিজেদের এলাকা থেকে ঘুরে এসেছে এবং সবাই বলছে যে তাদের এলাকার সাধারণ মানুষেরা জানে এবং বিশ্বাস করে মে মাসের পাঁচ তারিখ মতিঝিলে হেফাজতে ইসলামের কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। অনেক বড় একটা মিথ্যা কথাকে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টা এমনি এমনি ঘটেনি, এর জন্যে কাজ করতে হয়েছে, পরিশ্রম করতে হয়েছে, অর্থব্যয় করতে হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে সেই তথ্য প্রচার করা হলেও সেদিন যে অসংখ্য কোরান শরীফ পোড়ানো হয়েছিল সেই তথ্যটি কিন্তু প্রচার করা হয়নি। রাতের আকাশে ইউ.এফ.ও দেখা গেছে কিংবা একটা ছাগল মানুষের গলায় কথা বলে এরকম মিথ্যা প্রচারিত হলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু রাতের অন্ধকারে গোপনে কয়েক হাজার মুসল্লীকে হত্যা করা হয়েছে, এরকম একটি ভয়ংকর মিথ্যা প্রচার করা হলে সবদিক দিয়ে ক্ষতি হয়।
>
> 'কয়েক হাজার মুসল্লীকে হত্যা করা হয়েছে' সেটি প্রচারিত হয়েছে গোপনে। প্রকাশ্যে সর্বশেষ যে প্রচারণাটি ছিল সেটি হচ্ছে ৬১ জনের, "অধিকার" নামে একটি সংগঠন সেটি দেশ-বিদেশে প্রচার করেছে। কয়েক হাজার থেকে সংখ্যাটি ৬১ তে নেমে এসেছে, তাই সরকারের খুশী হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সরকার খুশী হয়নি, তারা ৬১ জনের নাম জানতে চেয়েছে, আমিও জানতে চাইতাম। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় অভিযোগ করলে তার প্রমাণ থাকতে হয়। "অধিকার" নামক সংগঠনটি নাম প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, কারণটি আমরা বুঝতে পারি, কারণ পুরো ঘটনাটি টেলিভিশনে দেখিয়েছে, সাংবাদিকেরা রিপোর্ট করেছে এবং কোথাও এত বড় একটি সংখ্যা কেউ দেখিনি। সরকার তখন মিথ্যা একটি তথ্য প্রচারের জন্যে "অধিকার" নামক সংগঠনের সম্পাদক আদিলুর রহমান খানকে গ্রেপ্তার করেছে।
>
> "আমার দেশ"-এর সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের পক্ষে যেরকম পনের জন সম্পাদক দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন, আদিলুর রহমান খানের পক্ষে এখন আরো বেশী মানুষ দাঁড়িয়ে গিয়েছেন। শুধু পত্রপত্রিকা নয়, বড় বড় মানবাধিকার সংগঠন, রাজনৈতিক দল, দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠান, এমনকি, আমাদের দেশের বড় বড় জ্ঞানী গুণী মানুষ। "অধিকার" সংগঠনটি যদি বলতো অনেক

মানুষ মারা গেছে এবং তখন তাকে যদি গ্রেপ্তার করা হতো, সেটাকে বাকস্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলা যেতো। কিন্তু যখন সংখ্যাটি অত্যন্ত নিখুঁত ৬১, তখন তাদেরকে এর ব্যাখ্যা দিতে হবে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির কাছে দেয়া হবে সেটি মোটেও বিশ্বাসযোগ্য কিছু নয়, ২১ আগস্ট ঘটনার পর বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টের কথা কেউ কি ভুলে গেছে?

'এই দেশের যে সকল সুধীজন মে মাসের ৫ তারিখে মতিঝিলের "গণহত্যার" একজন প্রবক্তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাদের কাছে আমার শুধু ছোট একটি প্রশ্ন, তথ্যটি যদি মিথ্যা হয় তাহলেও কি আপনি তার পাশে এসে দাঁড়াবেন? বাকস্বাধীনতা চমৎকার বিষয়, আমি কয়েকজন সম্পাদকের বিরুদ্ধে কথা বলেছি, তারপরেও যদি এই লেখাটি সেই পত্রিকায় ছাপা হয় সেটি বাকস্বাধীনতা। কিন্তু একটা মিথ্যা তথ্য যদি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়, তখন সেই তথ্য প্রচার করার অধিকার বাকস্বাধীনতা নয়, তখন সেই অধিকার হচ্ছে মিথ্যা কথা বলার অধিকার।'

জাফর ইকবালের এই বক্তব্য তার একার নয়। বাংলাদেশের বহু সাংবাদিক ও লেখক বিভিন্ন দৈনিকে তাদের লেখায় জননিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুর অধিকার, সংবিধানের মর্যাদা, রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি, এমনকি ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্যও এসব মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। একইভাবে দলীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেও কঠোরতম পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনায় বহু জায়গায় জামায়াত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাকর্মীদেরও ব্যবহার করেছে।

জঙ্গী মৌলবাদী সন্ত্রাস এবং সাম্প্রদায়িক সহিংসতা একই রাজনীতির অন্তর্গত। এই রাজনীতি হচ্ছে জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদির জেহাদী ইসলাম বা রাজনৈতিক ইসলাম। এই রাজনীতি দলীয় আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়োজনে যে কোন ধরনের হত্যা, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞকে বৈধতা দেয়, যেমনটি দিয়েছিল '৭১-এর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সময়ে। জেহাদের নামে হত্যা, সন্ত্রাস ও ধ্বংসের রাজনীতি ক্রীয়াশীল থাকলে গণতন্ত্র, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পাশাপাশি আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও বিশ্বশান্তি সমূহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

৩০ নবেম্বর ২০১৩

২০১৪ সালে আমরা কোথায় যেতে চাই

বাংলাদেশে ২০১৪ সাল আরম্ভ হয়েছে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, যুদ্ধাপরাধী ও গণহত্যাকারীদের সমন্বয়ে গঠিত ১৮ দলীয় জোটের অনির্দিষ্টকালীন অবরোধ কর্মসূচির মাধ্যমে, যে অবরোধের ডাক দিয়েছেন এই জোটের নেতা বেগম খালেদা জিয়া। বছরের প্রথম দিন দেশের ও বিদেশের বহু বন্ধু আমাকে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন। এক শুভাকাঙ্ক্ষী ইন্টারনেটে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, যার ভাষা হচ্ছে 'শুভ অবরোধ বর্ষ ২০১৪ ...। পেট্রোল বোমা ও ককটেলের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকুন এই কামনায়।' যে মহাসংকটে বাংলাদেশ নিমজ্জিত এর চেয়ে উপযোগী শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের ভাষা এই নববর্ষে আর কিছু হতে পারে না।

১৯৭১-এ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি যে বিজয় অর্জন করেছে, বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে এর নজির খুব কমই আছে। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর ৯০ হাজারের বেশি সদস্য বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর। বাঙালির পাঁচ হাজার বছরের লিখিত অলিখিত ইতিহাসে এত বড় সাফল্যের ঘটনা কখনও ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটবার সম্ভাবনাও নেই। বাংলাদেশ ও ভারতে ১৬ ডিসেম্বর উদযাপিত হয় 'বিজয় দিবস' হিসেবে পাকিস্তানে এই দিনটি স্মরণ করা হয় 'ঢাকা পতন দিবস' বা পরাজয়ের দিন হিসেবে।

বাঙালির পক্ষে এ বিজয়ের গৌরব যেমন ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়, পাকিস্তানি চেতনার অনুসারীদের পক্ষেও পরাজয়ের এই গ্লানি ও অপমান ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী জামায়াতে ইসলামী বা মুসলিম লীগের জন্য এ পরাজয় নিছক সামরিক বা রাজনৈতিক নয়, আদর্শিক পরাজয়ও বটে। '৭১-এ বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের সমাধি রচিত হয়েছে। ধর্ম যদি রাষ্ট্রগঠনের প্রধান উপাদান হত তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের এক ডজনেরও অধিক স্বাধীন সার্বভৌম দেশ অবস্থান করত না। জিন্নাহ রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করেছেন, বলেছেন ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুটি আলাদা জাতি, তারা এক দেশে থাকতে পারে না, ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ দরকার। অথচ আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের আগেই জিন্নাহ ঘোষণা করেছিলেন, পাকিস্তান কোনও ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না, রাষ্ট্র ধর্ম থেকে পৃথক থাকবে। জিন্নাহর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার এই ঘোষণারও মৃত্যু হয়েছিল। ধর্মকে ব্যবহার করে পাকিস্তান যাবতীয় শোষণ, পীড়ন এমনকি '৭১-এর নজিরবিহীন গণহত্যা এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকে বৈধতা প্রদানের অপচেষ্টা করেছে।

বাঙালি কখনও পাকিস্তানের অন্যায়, অত্যাচার মেনে নেয়নি। ১৯৪৮-এ সূচিত ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন ও

সংগ্রামকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নির্মমভাবে দমন করতে চেয়েছে ইসলাম ও পাকিস্তানের ঐক্য/অস্তিত্বের দোহাই দিয়ে। একইভাবে এসব আন্দোলন ও সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বিকশিত হয়েছে বাঙালিত্বের চেতনা ও ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ। বাঙালির প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের ঔপনিবেশিক আচরণ এবং এর বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিরোধের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালিকে সর্বোচ্চ মূল্য দিতে হয়েছে। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

পাকিস্তান এবং তাদের বাংলাদেশীয় দোসররা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকেই বাংলাদেশকে '৭১ পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার যে চক্রান্ত আরম্ভ করেছে ৪২ বছর পরও তা অব্যাহত আছে। ১৯৭৫-এ স্বাধীন বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বপ্রদানকারী তাঁর সহযোগীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, সংবিধান থেকে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ মুছে ফেলা, সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক দলকে আবার রাজনীতি করবার সুযোগ দেয়া, পাকিস্তানের আশীর্বাদে পুষ্ট হয়ে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী ও গণহত্যাকারীদের সমন্বয়ে বিএনপির মতো রাজনৈতিক দল গঠন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সংবিধানের 'ইসলামীকরণ' ও 'পাকিস্তানিকরণ', বিদ্রোহ দমনের নামে সশস্ত্র বাহিনীর হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা, ২০০১ সালে জামায়াতকে ক্ষমতার শরিক বানিয়ে বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য ও আওয়ামী লীগশূন্য করবার জন্য নজিরবিহীন হত্যা, নির্যাতন সংঘটন, শতাধিক জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের জন্মদান, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস প্রভৃতি বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো সন্ত্রাসী ও মনোলিথিক মুসলিম রাষ্ট্রে রূপান্তরের বিভিন্ন অভিব্যক্তি।

১৯৭১-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে গণহত্যায় সহযোগিতা করবার জন্য, বিশেষভাবে তালিকা প্রস্তুত করে বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের হত্যার জন্য জামায়াতে ইসলামী হিটলারের ঘাতক 'এসএস' বাহিনীর মতো গঠন করেছিল আলবদর বাহিনী। লাহোর থেকে প্রকাশিত আলবদরের দলীয় ইতিহাসে বাংলাদেশের আলবদরের অধিনায়করা দাবি করেছে— '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী অস্ত্রসমর্পণ করলেও আলবদরের সদস্যরা তা করে নি। তারা সক্রিয় ছিল '৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেয়া তাদেরই অবদান বলে দাবি করেছে আলবদর।

জামায়াত ও আলবদরের আদর্শ ও লক্ষ্য হচ্ছে মওদুদিবাদ। জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদি এবং তার সমসাময়িক মিশরের 'মুসলিম ব্রাদারহুড'-এর প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্না মধ্যযুগের কট্টরপন্থী ইসলামী দার্শনিক ইবনে তাইমিয়ার (খৃঃ ১২৬৩-১৩২৮) জিহাদী দর্শনে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে রাজনৈতিক ইসলামের জন্ম দিয়েছেন তার সার কথা হচ্ছে মানবরচিত আইন, সংবিধান সব বাতিল করে কোরাণ ও সুন্নাহর আইনে দেশ শাসন করতে হবে এবং যারা তা করবে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। তাইমিয়া ইসলাম-পূর্ব

সকল দর্শন ও ধর্মীয় বিশ্বাস নাকচ করে বলেছিলেন, এসব উৎস থেকে কোনও জ্ঞান আহরণ করা যাবে না। তাইমিয়ার আগে ইবনে রুশদ ও অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদরা প্রাচীন গ্রীক, রোমান, ভারতীয় ও সুমেরিয় সভ্যতার জ্ঞানভান্ডার থেকে মূল্যবান মণিমুক্তা আহরণ করে যেভাবে ইসলামী দর্শন সমৃদ্ধ করেছিলেন ইমাম ইবনে হাম্বলের রক্ষণশীল মতবাদের অনুসারী ইবনে তাইমিয়া সেসব বাতিল করে সালাফী বা কট্টরপন্থী ইসলামী দর্শনের জন্ম দিয়েছিলেন।

তাইমিয়ার ভাবশিষ্য আবুল আলা মওদুদির জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকলে বাংলাদেশে বর্তমানে বিরোধী দলের তথাকথিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের নামে যে সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিদিন সংঘটিত হচ্ছে তার কারণ ও লক্ষ্য উপলব্ধি করা যাবে না। টেলিভিশনের 'টক শো'-এ সুশীল পণ্ডিতরা যেমন বলেন— শেখ হাসিনার গোঁয়ার্তুমির কারণে বাংলাদেশ রসাতলে যাচ্ছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি মেনে নিয়ে শেখ হাসিনা পদত্যাগ করলেই সব সমস্যা ভোজবাজির মতো মিলিয়ে যাবে; তাদের জামায়াতের রাজনীতি এবং বিএনপি কীভাবে জামায়াতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে সে বিষয়ে হয় কোনও ধারণা নেই, নয় তারা জামায়াতের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

২০০১ সালে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় ছিলেন। সংবিধান অনুযায়ী বিচারপতি লতিফুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল। পাকিস্তানের আইএসআই জামায়াত-বিএনপির জোটকে ক্ষমতায় আনার জন্য কীভাবে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করেছে তার বিবরণ সে সময়ে পাকিস্তানের খবরের কাগজেও ছাপা হয়েছে। নির্বাচনের আগে থেকেই জামায়াতের সন্ত্রাসীরা হিন্দুনিধনযজ্ঞ আরম্ভ করেছিল, যা বিস্তৃত হয়েছে নির্বাচনের দিন থেকে, অব্যাহত ছিল ২০০৫ সাল পর্যন্ত। এর বিন্দুবৎ বিবরণ 'আমাদের বাঁচতে দাও' প্রামাণ্যচিত্রে এবং নির্মূল কমিটির প্রায় তিন হাজার পৃষ্ঠার শ্বেতপত্রে পাওয়া যাবে। সেবার বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কোনও কোনও জায়গায় জামায়াত-বিএনপিকে ভোট দিয়েও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অসারতার কারণে ২০০৬ সালে এর প্রধান হওয়ার মতো কাউকে খুঁজে না পাওয়ায় যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল— পরিত্রাণের জন্য ২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে মেনে নিতে হয়েছিল। সংবিধান লংঘন করে এই সরকার দু বছর ক্ষমতায় থেকে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করলেও তার মাশুল জামায়াত ছাড়া বিএনপি ও আওয়ামী লীগ দুই প্রধান দলকেই দিতে হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন যে গণতন্ত্রের মূল চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক এ বিষয়ে আলোচনা/ সমালোচনা আরম্ভ হয়েছে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে, যা ব্যাপকতা লাভ করেছে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়। পাঁচ বছরের জন্য যারা সরকার পরিচালনা করবেন সেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা একটি জাতীয় নির্বাচন আয়োজন করতে পারবেন না, তা করবেন বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ এবং

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীরা, যাদের অধিকাংশেরই দেশ ও জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা নেই, মেয়াদ শেষে আবার বিদেশে পাড়ি দেন— এতে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী উৎফুল্ল হতে পারে, বাংলাদেশের মানুষের কোনও মঙ্গল নেই।

যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব থাকে নির্বাচন কমিশনের উপর। গত পাঁচ বছরে নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার থেকে আরম্ভ করে জাতীয় সংসদের উপনির্বাচন পর্যন্ত পাঁচ হাজারেরও বেশি নির্বাচন আয়োজন করেছে। এসব নির্বাচনে কোনও কারচুপি হয়েছে— বিএনপি, নির্বাচন পর্যবেক্ষক বা গণমাধ্যম কখনও এমন অভিযোগ করেনি। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হয়েছে, যা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা গণতন্ত্রের পরিপন্থী বিবেচনা করে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। এই সংবিধান পরিবর্তন করতে হলে বিএনপিকে ক্ষমতায় যেতে হবে অথবা সরকারের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হবে। জামায়াতের প্ররোচনায় সমঝোতার পথ পরিহার করে বিএনপি লাগাতার অবরোধ ও হরতালের নামে যে সন্ত্রাস, অন্তর্ঘাত ও ধ্বংসের পথ বেছে নিয়েছে তা জামায়াতের মূল এজেন্ডার অন্তর্গত— ১) '৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা, ২) জামায়াতের অংশগ্রহণ ছাড়া নির্বাচন হতে না দেয়া এবং ৩) যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করা। বিএনপি যেভাবে জামায়াতের সকল দুষ্কর্ম ও দুরভিসন্ধির দায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছে তার বিরুদ্ধে দলের তৃণমূলে বিক্ষোভ ক্রমশঃ দৃশ্যমান হচ্ছে। অবরোধের ডাকে এখন বিএনপির কর্মীরা সাড়া দিচ্ছে না।

৫ জানুয়ারির ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের ১৮ দলীয় জোট, জাতীয় পার্টির একাংশ এবং কয়েকটি বাম দল অংশগ্রহণ না করায় ১৫৪ জন প্রার্থী ইতিমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়ে গেছেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এত বেশি প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা অতীতে এ দেশে কখনও ঘটেনি। অর্ধেকের বেশি নির্বাচক তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এটি বিজয়ীদের জন্যেও দুর্ভাগ্যজনক। জামায়াতের এজেন্ডা বাদ দিয়ে বিএনপি এবার যদি স্বাধীনভাবে নিজেদের এজেন্ডা নিয়ে সংঘাতের পরিবর্তে সমঝোতার পথ বেছে নিত এই নির্বাচনে তাদের পক্ষে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বিএনপিকে জামায়াত সংঘাত ও সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিয়েছে। জামায়াতের সঙ্গ পরিহার না করলে বিএনপি শুধু জনবিচ্ছিন্ন নয়, তৃণমূলেরও সমর্থন হারাবে। দু সপ্তাহ আগে নীলফামারীর একটি উপজেলায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির তৃণমূল নেতাকর্মীরা জামায়াতের বিরুদ্ধে মানববন্ধন করেছে।

দৈনিক কালের কণ্ঠে গত সপ্তাহে (২৯ ডিসেম্বর ২০১৩) একটি প্রতিবেদন বেরিয়েছে। 'শিবিরে 'সর্বস্বান্ত' ছাত্রদল' শিরোনামের এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আশির দশক থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রশিবিরের হাতে খুন হয়েছে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। এ দলটির বহু নেতার হাতপায়ের রগ কেটে দিয়েছে শিবির। অনেকের কবজি কাটা গেছে।' কালের কণ্ঠে-এ দিন জামায়াতের নৃশংসতার উপর কয়েকটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। বিএনপির রাজশাহীর এক কর্মী

মাহবুবুল আলম ফরহাদের হাতের কব্জি কেটে দিয়েছিল জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা। কালের কণ্ঠে প্রকাশিত তার সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল— 'কবজি কেটে আমার মুখে পুরে দেয় শিবির।' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে— 'বর্তমানে তৃণমূল বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেও ফরহাদ স্বপ্ন দেখেন এমন এক সময়ের যেদিন মানুষ জামায়াত-শিবিরকে প্রতিহত করবে। তরুণ প্রজন্মের এই আবেদন বিএনপি বুঝবে বলেও মনে করেন ফরহাদ। আদর্শের এ জায়গা থেকেই ফরহাদ বিএনপির প্রার্থী হিসেবে সংসদ নির্বাচনে লড়াতে চান।'

ফরহাদের মতো এরকম হাজার হাজার কর্মী রয়েছে বিএনপির যাদের আবেদন খালেদা জিয়ার কানে ততদিন পৌঁছবে না যতদিন তিনি পাকিস্তান ও জামায়াতপ্রেমে মাতোয়ারা থাকবেন। গত ১৬ ডিসেম্বর (২০১৩) আমাদের বিজয়ের দিন পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে গণহত্যাকারী কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রতিবাদে বাংলাদেশের সমালোচনা করে যে প্রস্তাব নেয়া হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করেছে বাংলাদেশ। 'গণজাগরণ মঞ্চ' ও 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' সহ নাগরিকরদের শতাধিক সংগঠন পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবার দাবি জানিয়েছে। এমনকি পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং নির্মূল কমিটির পাকিস্তান শাখাও এর প্রতিবাদ করলেও খালেদা জিয়া বা তার দল এর নিন্দা বা প্রতিবাদ করে নি। সাংবাদিকদের চাপের মুখে খালেদা জিয়া বলেছেন, তিনি শুধু 'মর্মাহত' হয়েছেন। বন্ধু মুনতাসীর মামুন এ নিয়ে টেলিভিশনের এক 'টক শো'- এ মন্তব্য করেছেন, 'প্রেমিক চলে গেলেও প্রেমিকা মর্মাহত হয়, খালেদা জিয়া নিন্দা বা প্রতিবাদ করেন নি।' খালেদাতনয় তারেক রহমান ছাত্র শিবিরের এক সম্মেলনে ঘোষণা দিয়েছিলেন, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির একই মায়ের গর্ভজাত সহোদর ভ্রাতা। শিবিরের হাতে ছাত্রদলের নিহতদের স্বজনদের বা ফরহাদের মতো আহতদের এখন রুখে দাঁড়াবার সময় এসেছে— শুধু জামায়াত-শিবির নয়, বিএনপির যে নেতারা জামায়াতের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবার জন্য বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চাইছে তাদেরও প্রতিহত করতে হবে।

আওয়ামী লীগকে মনে রাখতে হবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হতে হলে দ্রুত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারণ করে জামায়াতকে সন্ত্রাসী ও রাষ্ট্রদ্রোহী দল হিসেবে নিষিদ্ধ করতে হবে। প্রশাসন জামায়াতমুক্ত করতে হবে, জামায়াত ও জঙ্গীবাদের অর্থ ও অস্ত্রের উৎস বন্ধ করতে হবে। প্রশাসন ও দলের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। স্বচ্ছতা আনতে হবে সর্বক্ষেত্রে।

সরকার ও বিরোধী দলকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বাংলাদেশে তারাই রাজনীতি করবেন যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করেন। স্বাধীনতাবিরোধী, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক সকল অপশক্তি নির্মূলন এবং জনগণের জীবন-জীবিকার অবরোধমুক্তির বছর হোক ২০১৪ সাল— এই প্রত্যাশা এদেশের গণতন্ত্র ও শান্তিকামী প্রতিটি মানুষের। ইতিহাস সাক্ষী— বাঙালি কখনও পরাভব মানে নি।

২ জানুয়ারি ২০১৪

১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ
শান্তির জন্য সিতারা বেগমদের ভোট ও হাহাকার

বাংলাদেশের ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ৫ জানুয়ারি ২০১৪। বিএনপি জামায়াতে ইসলামীর ১৮ দলীয় জোট এই নির্বাচন বয়কট করায় জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের ভেতর ১৫৩টি আসনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোটের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। অবশিষ্ট ১৪৭টি আসনের নির্বাচন প্রতিহত করবার জন্য বিএনপি-জামায়াত চক্র যে সন্ত্রাস, হত্যা, ধ্বংস ও তাণ্ডব করেছে বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজির নেই।

২৫ নবেম্বর (২০১৩) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪২ দিনের ভেতর বিএনপি-জামায়াতের মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, যুদ্ধাপরাধী অধ্যুষিত জোটের আহ্বানে ৩০ দিন হরতাল ও অবরোধ হয়েছে। নির্বাচনের দিন সহ গত ৪২ দিনের বিরোধী দলের ধ্বংসাত্মক কর্মসূচির বলি হয়েছে ১৫০ জন মানবসন্তান, যাদের সিংহভাগই নিরীহ পথচারী, বাসযাত্রী, পুলিশ, স্কুলগামী শিশু ও শ্রমজীবী মানুষ। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে বিএনপি জামায়াতের কিছু সন্ত্রাসীও নিহত হয়েছে, যারা চলন্ত বাসে ও ট্রাকে পেট্রল বোমা ছুঁড়ে জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে মেরেছে এরা নির্বাচনের দিন দায়িত্বপালনরত নির্বাচনী কর্মকর্তাকে পর্যন্ত পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

বিএনপি-জামায়াত জোটের এই নজিরবিহীন সন্ত্রাস ও সহিংসতার বাহ্যিক কারণ হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি। বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া এক সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ১৯৯১ সালে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে জামায়াতের সমর্থন নিয়ে বিএনপি যে সরকার গঠন করেছিল তখন যতগুলো নির্বাচন হয়েছে প্রায় সব কটি জালিয়াতি ও ভোট ডাকাতির রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। এই জালিয়াতি বন্ধের জন্য আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-এ ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানায়। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার এই দাবি অগ্রাহ্য করে ১৯৯৬-এর ১৫ ফেব্রয়ারি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করলে আওয়ামী লীগ ও অধিকাংশ বিরোধী দল তা বর্জন করে। ফলে বিএনপির ৪৭ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে ভোটদাতার সংখ্যা ছিল মোট ভোটারের শতকরা ২৬ ভাগেরও কম। বেগম খালেদা জিয়া ২৫ ভাগ ভোট পেয়ে সরকার গঠন করেছিলেন, যে সরকার বিরোধী দলের আন্দোলনের চাপে জাতীয় সংসদে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করে। বিধান অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যারা ৯৬-এর ১৫ জুন ৭ম জাতীয়

সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে এবং ২০০১ সালের জুলাইয়ে বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ১৩জন সচিবকে বদলি করে গোটা প্রশাসন আওয়ামী লীগবিরোধীও পাকিস্তানপন্থী কর্মকর্তাদের দ্বারা ঢেলে সাজিয়েছে, যার চরম মাশুল দিতে হয়েছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়, বিশেষভাবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের।

পাকিস্তানপ্রেমী বিএনপি-জামায়াত জন্মগতভাবে ভারত ও হিন্দুবিদ্বেষী। লতিফুর রহমানের তত্ত্বধায়ক সরকার এবং ২০০১-এর নির্বাচনে বিজয়ী বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর যে নৃশংস হামলা চালিয়েছিল যেভাবে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ঘর-বাড়ি-মন্দির ধ্বংস সহ প্রায় তিন লক্ষ হিন্দুকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করেছে— স্বাধীন বাংলাদেশে এমনটি ঘটতে পারে তা ছিল কল্পনার অতীত। এমনকি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনেও তখন এই সম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপন করা হয়েছিল। এর প্রতিবাদ করবার জন্য অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন ও আমার মতো মানবাধিকার কর্মীদেরও গ্রেফতার ও নির্যাতন করা হয়েছে। বাঙালির স্মৃতি দুর্বল হওয়ার কারণে ১২/১৩ বছর আগের এ ঘটনা মনে করিয়ে দেয়া দরকার। বিএনপি-জামায়াতের পছন্দের তত্ত্বধায়ক সরকার কী ভয়ঙ্কর হতে পারে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কখনও তা ভুলতে পারবে না।

এই সময়ের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের উপর 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' ২০০৬ সালে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছিল। তিন খণ্ডে প্রকাশিত প্রায় ৩ হাজার পৃষ্ঠার এই শ্বেতপত্রে সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ২৭৮৬টি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছিল। এ সব ঘটনার বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে সরজমিনে তদন্ত করে, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন এবং জাতীয় দৈনিকের প্রকাশিত সংবাদ থেকে। সেই সময়ের এক অসহায় মায়ের মিনতি এখনও আমাদের চাবুকের মতো কশাঘাত করে— যে মা জামায়াত-বিএনপির ধর্ষকদের করজোড়ে বলছেন, 'বাবারা, তোমরা একজন একজন করে আসো, আমার মেয়েটা খুব ছোট।' বাংলাদেশকে পাকিস্তানের মতো সন্ত্রাসী মুসলিম রাষ্ট্র বানাবার জন্য জামায়াত-বিএনপি তখন এই হিন্দুনিধনযজ্ঞে মেতেছিল। সাত বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে ষাট বছরের বৃদ্ধা— কেউই এই পশুদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। শুধুমাত্র নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য তখন হাজার হাজার হিন্দু পরিবার রাতের অন্ধকারে ঘরবাড়ি ফেলে একবস্ত্রে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত জামায়াত-বিএনপির সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের পাশাপাশি জঙ্গী মৌলবাদের ভয়াবহ উত্থানও আমরা দেখেছি। সারা দেশের ৬৩টি জেলায় এক যোগে ৫০০ বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জামায়াত আমাদের জানিয়ে দিয়েছিল তাদের আন্ডারগ্রাউন্ড জঙ্গী নেটওয়ার্ক কতটা শক্তিশালী। জামায়াতের পোষ্য জঙ্গীদের গ্রেণেড-বোমা হামলা থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী, মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আদালতের বিচারক, আইনজীবী, পুলিশ, সংস্কৃতিকর্মী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এমনকি সুফীসাধকদের মাজারও

রেহাই পায়নি। ঢাকায় নিযুক্ত বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের উপর হামলা হয়েছিল যখন তিনি সিলেটে হযরত শাহজালালের মাজারে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশ এবং প্রতিবেশী ভারতের জঙ্গী সন্ত্রাসীদের জন্য জাহাজভর্তি অস্ত্র এসেছে পাকিস্তান থেকে দশ ট্রাকের একটি চালান ধরা পড়ায় এ নিয়ে তখন দেশেবিদেশে তুমুল হইচইও হয়েছে। জঙ্গী নেতা আবদুর রহমান ও বাংলা ভাইরা রাজশাহীর বাঘমারায় শরিয়া আদালতে বিচার করে আওয়ামী লীগ ও বাম রাজনৈতিক সংগঠনের ৬৪ জন কর্মীর মৃত্যুদণ্ড কীভাবে কার্যকর করেছে তার প্রমাণ তখনকার সংবাদপত্রে আছে। আমার প্রামাণ্যচিত্র 'জিহাদের প্রতিকৃতি'তে ভুক্তভোগীদের পাশাপাশি জঙ্গীদের জবানবন্দিও আছে। হরকতুল জিহাদের কমান্ডার মুফতি হান্নান আমার প্রামাণ্যচিত্রে বলেছেন ২০০৪ সালের ২১ আগস্টের আগে বিএনপির সহ সভাপতি খালেদাতনয় তারেক রহমান, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবর ও বিএনপি-জামায়াত-ফ্রিডম পার্টির শীর্ষ নেতারা কীভাবে শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিলেন। ২১ আগস্ট শেখ হাসিনার সমাবেশে হরকতুল জিহাদ ও জামায়াতের ঘাতকদের গ্রেণেড-বোমা হামলায় কেন্দ্রীয় নেত্রী আইভী রহমান সহ ২৪ জন নেতাকর্মী নিহত হয়েছিলেন। আহত হয়েছিলেন শেখ হাসিনা সহ প্রায় ৫০০ নেতাকর্মী।

বরেণ্য অধ্যাপক ও প্রথাবিরোধী লেখক হুমায়ূন আজাদকে বাংলা একাডেমীর বাইরে জামায়াতের ঘাতকরা তলোয়ার ও চাপাতি দিয়ে আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। এই হামলার দু সপ্তাহ আগে জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী জাতীয় সংসদে হুংকার দিয়ে বলেছিলেন, হুমায়ূন আজাদের মতো নাস্তিকদের সাজা দেয়ার জন্য ব্লাসফেমি আইন প্রণয়ন করতে হবে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের এসব সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন দু বছর আগে দশ হাজার পৃষ্ঠার প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।

জামায়াত-বিএনপির গণতন্ত্র ও মানবাধিকার কী বস্তু তাদের শাসনামলে এদেশের মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। যে কারণে ২০০৮-এর ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট তিন চতুর্থাংশেরও বেশি আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছে। এই নির্বাচন হয়েছিল ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবাধায়ক সরকারের অধীনে। ২০০৮-এর ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হলেও সেনাসমর্থিত ড. ফখরুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিন মাসের পরিবর্তে দু বছর ক্ষমতায় ছিল এবং জামায়াতকে তোয়াজ করে, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গ্রেফতারের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের গ্রেফতার করে নিন্দিতও হয়েছিল। বিএনপি ১৯৯৬-এর মতো ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনকে কারচুপির দায়ে অভিযুক্ত করেছে। আওয়ামী লীগ ২০০১-এর নির্বাচনকে কারচুপি ও ভোট ডাকাতির নির্বাচন বলেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দুই প্রধান জোটের কাছে অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণেই ৯ম জাতীয় সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর দ্বারা এই বিধান বাতিল করা হয়েছে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মূল বিষয় ছিল— বাংলাদেশের আদি সংবিধানের চার মূলনীতির যে দুটি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়াউর রহমান বাতিল করেছিলেন— 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' পুনঃসংযোজন এবং সামরিক শাসনকে অবৈধ ঘোষণা করা। এই সংশোধনী অনুমোদনের আগে সরকার জাতীয় সংসদে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করেছিল সংশোধনীর খসড়া প্রণয়নের জন্য। এই কমিটি নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দের কয়েক দফা বৈঠক করে এই খসড়া প্রণয়ন করে, যা অতীতে সংবিধানের অন্য কোন সংশোধনীর ক্ষেত্রে কখনও করা হয়নি। পঞ্চদশ সংশোধনীর খসড়া প্রণয়ন কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যের নাম চাওয়া হলেও বিএনপি কোনও নাম দেয়নি এবং এ নিয়ে সংসদে আলোচনাও বর্জন করে। ফলে বিএনপি-জামায়াতের অনুপস্থিতিতে সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী গৃহীত হয় এবং বিএনপি যথারীতি জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের আন্দোলনে নামে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর বিরুদ্ধে বিএনপি-জামায়াতের আক্রোশের প্রধান কারণ হচ্ছে এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বহুলাংশে সংবিধানে ফিরে এসেছে যা বাংলাদেশকে পাকিস্তানে রূপান্তরের অন্তরায়। একই সঙ্গে সামরিক শাসন অবৈধ হলে জেনারেল জিয়ার ক্ষমতাদখল এবং ক্যান্টনমেন্টে সেনাছাউনিতে বসে প্রাক্তন জেনারেল ও আমলাদের নিয়ে বিএনপি গঠনও অবৈধ হয়ে যায়। বিএনপি-জামায়াতের যাবতীয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশকে জেনারেল জিয়াউল হকের পাকিস্তান ও মোল্লা উমর ও বিন লাদেনের আফগানিস্তানের মতো সন্ত্রাসী ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তর— এই সত্য যারা অনুধাবন করতে পারবেন না তারা কখনও বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি বুঝতে পারবেন না।

১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের জন্য বিএনপি-জামায়াত এবং গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো হেফাজতে ইসলাম গত এক বছর ধরে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে যেভাবে হরতাল অবরোধের নামে নিরীহ মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারাকে প্রাত্যহিক বিষয়ে পরিণত করেছে, যেভাবে বার বার জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার উপর আঘাত করছে, যেভাবে অর্থনীতির কোমর ভেঙে দিচ্ছে— সব কিছু বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বানাবার চক্রান্তের অন্তর্গত। গত ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এক সেমিনারে সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক আবুল বারকাত বলেছেন, গত এক বছরে জামায়াত বিএনপির হরতাল-অবরোধের কারণে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ এক লক্ষ কোটি টাকা। পোষাক শিল্পের মালিকরা বলেছেন, প্রতিদিনের হরতালে শুধু তাদের খাতে ক্ষতির পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ধ্বংসসাধন কিংবা নিরীহ মানুষকে জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে মারার সঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন প্রতিহত করতে গিয়ে জামায়াত-বিএনপির সন্ত্রাসীদের হামলায় দুই দিনে নিহতের সংখ্যা ২৭ জন, যা আরও বাড়বে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটে শতাধিক অগ্নিদগ্ধ আদমসন্তান এবং তাদের পরিবারের ভবিষ্যত ধ্বংস হয়ে গেছে। যাদের কারণে বৃদ্ধ পথচারী ও বাসযাত্রী থেকে আরম্ভ করে নিরীহ শিশু নিহত বা আহত

হয়ে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছে সেই ঘাতকদের বেগম খালেদা জিয়া ও তার সুযোগ্য পুত্র বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি তারেক রহমান ধন্যবাদ জানিয়ে 'আন্দোলন' অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের তথাকথিত সুশীল সমাজ টেলিভিশনের 'টক-শো'-এ এবং খবরের কাগজের কলামে মাতম করছেন— ৫ জানুয়ারির নির্বাচন অবৈধ, এক্ষুণি সরকারকে এ নির্বাচন বাতিল করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি মেনে নিতে হবে, না হলে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। গৃহযুদ্ধের হুমকি দেড় বছর আগেই জামায়াত দিয়েছে। '৭১-এর গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে গ্রেফতারকৃত জামায়াত নেতাদের বিচার সম্পর্কে দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জামায়াতের কোন নেতার কিছু হলে সারা দেশে আগুন জ্বলবে, গৃহযুদ্ধ হবে। জামায়াত স্বপ্ন দেখছে মিশরে তাদের জ্ঞাতি ভাই মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো গণঅভ্যুত্থান করে তারা ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানিয়ে '৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবে। দল হিসেবে বিএনপি ও হেফাজত পাশে থাকলেও বাংলাদেশের মানুষ যে জামায়াতের পক্ষে নেই ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে তা আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

১৮ দলীয় জোটের নামে বিএনপি 'সর্বাত্মক' হরতাল/অবরোধের কর্মসূচি দিলেও মাঠে বিএনপির নেতাকর্মীরা থাকেন না বললেই চলে। সন্ত্রাসের মাধ্যমে হরতাল অবরোধ সফল করে জামায়াত শিবিরের জঙ্গী ক্যাডাররা। গত নবেম্বরে ৭১ টেলিভিশনের ফারজানা রূপার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জামায়াত রাজধানী ঢাকায় বোমা বানাবার জন্য চারশ কারখানা বানিয়েছে। ককটেল ও হাতবোমা বানাবার কারখানা কুটির শিল্পের মতো গড়ে উঠেছে জামায়াত-বিএনপির নিয়ন্ত্রণাধীন পাড়ায় পাড়ায়। প্রতিবেদক একজন বোমা কারিগরকে প্রশ্ন করেছিলেন, এসব বোমার হামলায় নিরীহ মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে, তার কি এতে খারাপ লাগে না। কারিগরের বক্তব্য— তারা এ কাজ করছে নেতার নির্দেশে, আদর্শের জন্য। জামায়াতের রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দলীয় আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য যাবতীয় সন্ত্রাসকে বৈধতা প্রদান। জামায়াত মনে করে তারা যা করছে তা ইসলামের জন্য এবং এর জন্য জীবন নেয়া ও জীবন দেয়া দুটোই জায়েজ। এভাবে জামায়াত ৭১-এর নৃশংসতম গণহত্যা ও নারীধর্ষণকেও ইসলামের নামে বৈধতা দিয়েছে এবং এভাবেই জামায়াত শান্তির ধর্ম ইসলামকে পরিণত করেছে সন্ত্রাসের সমার্থক শব্দে।

বিএনপি জামায়াত-নির্বাচন প্রতিহত করতে গিয়ে যেভাবে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে সহিংসতার শিকারে পরিণত করেছে— আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে '৭১ ও ২০০১-এর নারকীয় দিনগুলো। গত কয়েক মাস ধরে দেশের প্রধান দৈনিকগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই সাম্প্রদায়িক সহিংসতার খবর ছাপা হচ্ছে। আজ যখন এই লেখাটি লিখছি আমার সামনে দৈনিক জনকণ্ঠ (৭ জানুয়ারি ২০১৪), প্রথম পাতার প্রধান শিরোনাম 'সন্ত্রাস কঠোর হাতে দমন' হচ্ছে ৬ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য। প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের কথা বলেছেন। জনকণ্ঠের দ্বিতীয় শিরোনাম হচ্ছে— 'ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার

অপরাধে (!) হিন্দুদের ওপর হামলা জামায়াত শিবিরের।' দেশের বিভিন্ন হিন্দু অধ্যুষিত জনপদে নৃশংস হামলা চালিয়ে তাদের শুধু ভোটকেন্দ্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখা হয়নি, ঘর বাড়ি দোকানপাট জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়া হয়েছে, সর্বস্ব কেড়ে নেয়া হয়েছে। জনকণ্ঠের প্রথম পাতা ও ভেতরের পাতার অনেকগুলো ছবি এই সহিংসতার সাক্ষর বহন করছে। ৩-এর পাতায় ছাপা হয়েছে ঠাকুরগাঁওয়ে ও দিনাজপুরের আতঙ্কিত শত শত হিন্দু নাগরিক ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন। বিপন্ন মানুষ ঘরবাড়ি ফেলে এলাকা ত্যাগ করছেন।

নির্বাচনের দিন সময় টেলিভিশনে দেখেছি জামায়াত-বিএনপির সন্ত্রাসীরা ভোটকেন্দ্র দখল করে শ্লোগান দিচ্ছে— 'ভোট দিতে আসবে যারা/লাশ হয়ে ফিরবে তারা।' জামায়াত-বিএনপির নজিরবিহীন তাণ্ডবে পাঁচ শতাধিক কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত হয়েছে, কয়েকটি কেন্দ্রে একজন ভোটারও যায়নি। তারপরও প্রায় ১৮ হাজার কেন্দ্রে মানুষ ভোট দিয়েছেন এবং জামায়াত-বিএনপির সহিংসতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। নির্বাচনের দিন ঢাকার মহাখালীর কুড়িল বস্তির মহিলারা ভোট দিতে গিয়েছেন বনানী বিদ্যালয়ে। এটিএন নিউজ-এর মুন্নী সাহাকে তাদের একজন সিতারা বেগম বলেছেন, তিনি ভোট দিতে এসেছেন জামায়াত-বিএনপির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তির জন্য। জামায়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী রাজনীতি নিষিদ্ধ করবার দাবি জানিয়েছেন বস্তিবাসিনী শ্রমজীবী এই নারী। হরতাল/অবরোধের কারণে তাদের জীবন-জীবিকা কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে তারও বিবরণ দিয়েছেন সিতারা বেগম।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে প্রদত্ত ভোটের হার শতকরা চল্লিশ ভাগের ওপরে। স্থগিত ভোটকেন্দ্রে আবার ভোটগ্রহণ হলে এর সংখ্যা একচল্লিশ অতিক্রম করবে। জামায়াত-বিএনপি নিজেরা যায়নি, অন্যদেরও যেতে দেয়নি। তারপরও ভোটের এই হার প্রমাণ করেছে বাংলাদেশের মানুষ সিতারা বেগমদের মতো শান্তি চান, জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা চান। নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হচ্ছে, না সর্বদলীয় সরকারের অধীনে হচ্ছে— এ নিয়ে সিতারা বেগমদের মাথাব্যথা নেই। প্রধানমন্ত্রী ৬ জানুয়ারি যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন আমরা চাই তা দ্রুত কার্যকর হোক। তিনি গত বছর ৫ মে ঢাকায় মহাসমাবেশের নামে হেফাজত-জামায়াতের মহাতাণ্ডবের পর বলেছিলেন, 'জামায়াত-হেফাজতকে আর ছাড় দেয়া হবে না।'

মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ এখনই গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দিতে হবে, উপদ্রুত এলাকায় সেনাবাহিনী নামাতে হবে। না, বাংলাদেশে আমরা আর ১৯৭১ বা ২০০১-এর পুনরাবৃত্তি দেখতে চাই না।

৭ জানুয়ারি ২০১৪

কেউটে সাপের বাচ্চা কেউটেই হয়, ঢোঁড়া হয় না

জামায়াত-বিএনপির ১৮ দলীয় জোট এবং জামায়াতি জোটবান্ধব আরও অনেক দলের নির্বাচন বর্জনের আহ্বান এবং নির্বাচন প্রতিহত করবার নামে নজিরবিহীন সন্ত্রাস অগ্রাহ্য করে ৪০%-এর বেশি ভোটার ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশন ও মহাজোট সরকার দেশী বিদেশী যাবতীয় চাপ সত্ত্বেও নির্বাচনের আয়োজন করে সংবিধানের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। জামায়াত-বিএনপি জোট যদি নির্বাচন বানচালের জন্য সহিংসতা ও তাণ্ডব প্রদর্শন না করত বয়কটের ডাক সত্ত্বেও এবার ৬০%-এর বেশি ভোট পড়ত। গত কয়েক মাসে নির্বাচন বর্জনের নামে বিরোধী দলের লাগাতার হরতাল ও অবরোধে সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকা যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তা সহ্যের সকল সীমা অতিক্রম করেছে। ২০০৮-এ ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষে শেখ হাসিনার মহাজোটকে তিন চতুর্থাংশেরও বেশি আসনে জয়ী করে এ দেশের মানুষ জামায়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এবার জামায়াতের দোসর বিএনপিকেও একইভাবে প্রত্যাখ্যান করে বাংলাদেশের মানুষ কার্যতঃ বিরোধী দলের সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, সন্ত্রাসী ও দেশদ্রোহী রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

এই প্রত্যাখ্যানের বদলা নেয়ার জন্য জামায়াত-বিএনপির সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়কে আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যে পরিণত করেছে। ৫ জানুয়ারির পর থেকে প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকায় কীভাবে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে। বহু জায়গায় হামলার আগে সন্ত্রাসীরা আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির দাগ দেখে নিশ্চিত হয়েছে— কারা তাদের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ভোট দিতে গিয়েছিল। গত ছয় দিনে বাংলাদেশের কয়েক হাজার হিন্দু পরিবারের ঘরবাড়ি বিষয়আশয় সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শুধু পার্থিব সম্পদ নয়, সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ছাই হয়ে গেছে মানুষের মর্যাদা, মানুষের প্রতি বিশ্বাস এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

গত এক বছর ধরে আমরা বলছি ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত সংঘাতপূর্ণ হবে। জামায়াত-বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটত, ২০০১ সালে তার চরম রূপ আমরা দেখেছি। গত ডিসেম্বরে আমি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় সেনাবাহিনী মোতায়েনের কথা বলেছিলাম, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের দেখামাত্র গুলির নির্দেশ দিতে বলেছিলাম। টেলিভিশনে আমার এই বক্তব্য শুনে অনেক বন্ধুও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, বলেছেন নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাসময়ে সেনাবাহিনী নামানো হবে।

নির্বাচন কমিশন যথাসময়ে সেনাবাহিনী নামিয়েছে বটে, কিন্তু লীলা মজুমদারের ভূতের গল্পের মতো তারা 'নেই হয়ে ছিল', কোনও হামলার ঘটনায় সেনাবাহিনী দৃশ্যমান ছিল না। এই অদৃশ্য সেনাবাহিনী দিয়ে নির্বাচন কমিশন কী অর্জন করেছে?

২০০৮-এ ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে যে সব এলাকায় হামলা হতে পারে হিন্দু অধ্যুষিত সেসব এলাকায় চিরুনি অভিযান চালিয়ে সব সন্ত্রাসীকে এলাকাছাড়া, এমনকি দেশছাড়া করা হয়েছিল। সেনাবাহিনী দৃশ্যমান থাকার কারণে সেই নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কারও গায়ে ফুলের আঁচড় কাটার সাহস কারও হয়নি। ড. ফখরুদ্দিনের সেনাসমর্থক তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তুলোধুনো করবার ক্ষেত্রে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ কোরাসে গলা মেলায়, কিন্তু এ কথাটি তারা ভুলে যায় সেনাবাহিনীর সার্বিক সহযোগিতা এবং দৃশ্যমান উপস্থিতির কারণেই ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হতে পেরেছিল যা অতীতে কখনও হয়নি। আমরা আশা করেছিলাম গতবারের মতো এবারও সেনাবাহিনী দৃশ্যমান থাকবে, কিন্তু তা হয়নি। ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামায়াত-বিএনপির সন্ত্রাস ও তাণ্ডব, বিশেষভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর বর্বরোচিত হামলা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী কেন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে— এ প্রশ্নের জবাব শুধু নির্বাচন কমিশনকে নয়, সেনাবাহিনীকেও দিতে হবে। বন্ধু মুনতাসীর মামুন আমাদের সেনাবাহিনী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণার কথা বলেছেন— 'তাদের ধারণা যা মিথ্যা নয়, শান্তি রক্ষার চেয়ে তারা নগদে বেশি উৎসাহী এবং গার্মেন্টসের মতো এখন সেনারা রফতানিযোগ্য বিশেষ পণ্য।' (জনকণ্ঠ, ১০ জানুয়ারি ২০১৪)

সেনাবাহিনী যদি গার্মেন্টসের মতো রফতানিযোগ্য পণ্য হয়ে যায় আমেরিকার 'হোমল্যান্ড সিকিউরিটি'র মতো আমাদের আধা সামরিক বাহিনী গঠনের কথা ভাবতে হবে, পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে তাদের জামায়াতের জঙ্গীদের চোরাগোপ্তা হামলা, গেরিলা কায়দায় আক্রমণ ইত্যাদি মোকাবেলা করবার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শুধু মাঠের হামলা নয়, জামায়াত ও জঙ্গীদের সাইবার হামলা মোকাবেলার জন্যেও পুলিশ বাহিনীকে উন্নততর প্রশিক্ষণ দিয়ে জননিরাপত্তার পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে যে সেনাবাহিনীর জন্ম, '৭১-এর রণাঙ্গনে যে সেনাবাহিনী শৌর্যবীর্যত্যাগের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে— আমাদের সেই সেনাবাহিনী যদি মার্সিনারির মতো আচরণ করে, মুনতাসীর মামুনের ভাষায় যদি গার্মেন্টসের মতো রফতানিযোগ্য পণ্যে পরিণত হয় তাহলে প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় বলতে হয়— 'সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না'।

২০০১ থেকে ২০০৬-এ জামায়াত-বিএনপির জোট যখন ক্ষমতায় ছিল তখন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস সহ শতাধিক জঙ্গী মৌলবাদী সংগঠনের উত্থান, জঙ্গীদের যাবতীয় গ্রেণেড-বোমা হামলা, হত্যা ও ধ্বংসের ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়েছে আওয়ামী লীগ ও ভারতকে। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করবার জন্য খালেদা-নিজামীদের সরকার ক্ষমতায় আসার দেড় মাসের ভেতর আমাকে গ্রেফতার করেছিল। উচ্চতর আদালতের নির্দেশে ছেড়ে দিতে হলেও এক বছর পর ময়মনসিংহের ৩টি সিনেমা হলে বোমা হামলা এবং বহু নিরীহ মানুষের হতাহতের জন্য আওয়ামী লীগের কয়েক ডজন কেন্দ্র ও জেলা পর্যায়ে নেতাদের সঙ্গে আমাকে ও মুনতাসীর মামুনসহ কয়েকজন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়। নাকি আমরা ঢাকায়

বসে ময়মনসিংহে বোমা হামলা করেছি, যদিও হরকতুল জেহাদ দাবি করেছিল এই হামলা তারা করেছে। একইভাবে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট শেখ হাসিনার জনসভায় বিএনপি জামায়াতের ঘাতক বাহিনী 'হুজি'র জঙ্গীরা গ্রেণেড হামলা করলেও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং তার জামাতি বন্ধুরা বলেছিলেন এই হামলার জন্য আওয়ামী লীগ ও ভারত দায়ী।

এবার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর সুপরিকল্পিত ও ধারাবাহিক আক্রমণ আরম্ভ করেছে জামায়াতে ইসলামী ২০১৩-এর ফেব্রুয়ারি থেকে। ২৮ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল যেদিন জামায়াত নেতা '৭১-এর গণহত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধী দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করে সঙ্গে সঙ্গে দেশের অধিকাংশ হিন্দু অধ্যুষিত জনপদে জামায়াতের সন্ত্রাসীরা এই বলে জাঁপিয়ে পড়েছিল— 'তোদের সাক্ষীর জন্য সাঈদী হুজুরের ফাঁসি হয়েছে। বাংলাদেশে আমরা কোনও হিন্দু রাখব না।' দেশের অমুসলিম নাগরিকদের পাশাপাশি আহমদীয়া মুসলিম বা মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবীদের উপর হামলার জন্য জামায়াতের তূনে বহু অজুহাতের তীর আছে। যখন যেটা প্রয়োজন তখন তা তুলে নেয়, বিশেষভাবে জামায়াত যখন কোণঠাসা হয়ে পড়ে। জামায়াতের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে মনোলিথিক মুসলিম রাষ্ট্রে রূপান্তরিতকরণ এবং '৭১-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ।

গতবারের মতো এবারও জামায়াত এবং খালেদাতনয় তারেক রহমানের ভাষায় তাদের সহোদর ভ্রাতা বিএনপি বলছে, হিন্দুদের ওপর আক্রমণ তারা করছে না, করছে আওয়ামী লীগ। কয়েকটি জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলার সময় জামায়াত স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ব্যবহার করেছে বটে, কিন্তু হামলার প্রধান নায়ক যে জামায়াত এই সত্য তারাই অস্বীকার করতে পারে যারা জামায়াতের পতিতা খাতায় নাম লিখিয়েছে। হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছে আওয়ামী লীগের নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে। বাংলাদেশের হিন্দুদের একমাত্র 'অপরাধ' তারা সাধারণভাবে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। গয়েশ্বর, নিতাইদের মতো বিভীষণ ও মীরজাফর সর্বকালে সর্বদেশে থাকেন বটে, তাতে ইতিহাসের সত্য পাল্টে যায় না। পৃথিবীর সর্বত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক শক্তির পক্ষেই থাকে।

জামায়াত-বিএনপির নেতারা যদি মনে করেন এবার সাম্প্রদায়িক সহিংসতার জন্য দায়ী আওয়ামী লীগ তাহলে তারা কেন আক্রান্ত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন না? কেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সামনে আওয়ামী লীগের এই 'দুষ্কর্ম' তুলে ধরছেন না? আমরা ২০০১ সালে জামায়াত-বিএনপি সরকারের গ্রেফতার নির্যাতনের পরও সাধ্যমতো নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। ২০০৫ সালের নবেম্বরে উত্তরবঙ্গের উপদ্রুত এলাকায় বিপন্ন মানুষদের ত্রাণসাহায্য প্রদানের জন্য যাওয়ার সময় জামায়াতিরা আমাদের উপর হামলা করছে। হামলায় আমাদের একজন সহযোদ্ধা পিয়াল নিহত হয়েছিলেন, বাকি পাঁচজনের ভেতর নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল ও আমি পঙ্গু হয়ে এখনও বেঁচে আছি। গত ৭ জানুয়ারি 'একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'র বন্ধুরা উপদ্রুত এলাকায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করেও যেতে পারেননি বিএনপি-জামায়াতের অনির্দিষ্টকালীন অবরোধের কারণে। আক্রান্ত এলাকায় যাওয়ার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত। আমরা চার বিভাগে চারটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছি। 'গণজাগরণ মঞ্চ' ও 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট' সহ বহু সংগঠন ১০ তারিখের আগে আক্রান্ত এলাকায় যেতে পারেনি জামায়াত-বিএনপির অবরোধের জন্য। এবার জামায়াতিরা হরতাল/অবরোধ দিয়ে যেমন নির্বাচন বানচাল করতে চেয়েছে, একইভাবে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াবার পথও অবরুদ্ধ করে রেখেছে। গণতন্ত্রের সুশীল বুলি কপচে প্রান্তিক মানুষদের বাঁচানো যাবে না। জামায়াত নিষিদ্ধ না হলে এই সন্ত্রাস বন্ধ হবে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনোত্তর সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সঙ্গে সংলাপ প্রসঙ্গে বলেছেন, জামায়াতের মতো সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করলেই তা হতে পারে। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে জামায়াত হেফাজতের ঘাতকদের হাতে নিহত শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চের নেতা ব্লগার রাজিবের পরিবারকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, জামায়াত কোন রাজনৈতিক দল নয়, সন্ত্রাসী সংগঠন। ৫ মে ঢাকায় জামায়াত-হেফাজতের মহাতাণ্ডবের পরও প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, জামায়াত হেফাজতকে আর ছাড় দেয়া হবে না। জামায়াতের প্রতি শেখ হাসিনার কঠোর অবস্থান সত্ত্বেও জামায়াতের সন্ত্রাস ও তাণ্ডব যখন অব্যাহত থাকে এবং আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতা যখন জামায়াতের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেন তখন তা নিঃসন্দেহে ক্ষোভের কারণ হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠে সাহসী কলাম লেখক স্বদেশ রায় লিখেছেন, 'আজ জামায়াত ও বিএনপি যে কিছু এলাকা বেছে নিয়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে এক ধরনের মিনি পাকিস্তান বানাতে পেরেছে, তার অন্যতম কারণ দুটি। ওই সব এলাকার নেতাদের সঙ্গে জামায়াত-বিএপির যোগসাজশ ও দুর্নীতি। যেমন সাতক্ষীরা কেন মিনি পাকিস্তান হলো? সাতক্ষীরা কি আসলে জামায়াতের ঘাঁটি? মোটেও তা নয়। কয়েকটি পকেটে জামায়াত আছে। এর অন্যতম কারণ এখন বেরিয়ে গেছে সাতক্ষীরার এক আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমানের সঙ্গে জামায়াতের আপোস এবং তাদের কাছে থেকে সুযোগ-সবিধা নেয়া। দুই, মন্ত্রী রুহুল হকের অনৈতিক কাজ এবং দলীয় নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে জামায়াতকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচ বছর কাজ করা। এমনকি চিহ্নিত হওয়ার পরেও এলাকার আওয়ামী লীগ নেতারা বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি সাতক্ষীরার কয়েকটি থানা জামায়াত সমর্থক ওসি বদলাতে দেননি।... বগুড়াকে জামায়াতের অভয়ারণ্য বানিয়েছেন মূলত বগুড়া আওয়ামী লীগ সভাপতি মমতাজ উদ্দিন। এই জনকণ্ঠেই ছাপা হয়েছে তিনি কী ভাবে অফিস খুলে হিন্দুদের জমি দখল করেছেন গত আমলে। তা ছাড়া বছরের পর বছর জামায়াত-বিএনপিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি জুয়ার আসর বসিয়েছেন সেখানে। যাতে চরিত্র নষ্ট হয়েছে আওয়ামী লীগের ছেলেদেরও। সর্বোপরি, ভোটের দিন অবধিও তিনি জামায়াতকে সহযোগিতা করে গেছেন। নির্বাচনের কয়েক দিন আগে বগুড়াতে ৬৫ জন জামায়াত-বিএনপির ক্রিমিনালকে আটক করেছিল যৌথবাহিনী। তাদের সেরা দশ ক্রিমিনালকে ছাড়িয়ে দেন

বগুড়ার ডিসিকে তদ্বির করে এই মমতাজ উদ্দিনই। সেখানে চাকুরি করেন এমন একজন স্বাধীনতার স্বপক্ষের পুলিশ কর্মকর্তা যে কারণে চোখের পানি ফেলেছেন আওয়ামী লীগ নেতার এ আচরণ দেখে। কারণ, তিনি মাত্র কয়েক দিন আগে ভাগ্যক্রমে শিবিরের বোমার হাত থেকে বেঁচে যান।... যেদিন শেখ হাসিনা প্রেস কনফারেন্স করে বলছেন বিএনপিকে জামায়াত ছেড়ে আসতে, ওইদিনই টেলিভিশনে হানিফ বলেছেন নতুন প্রজন্মের জামায়াত ভুল স্বীকার করে আওয়ামী লীগেও যোগ দিতে পারে। মি. হানিফ রাজনীতিতে নবাগত। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তিনি সিঁড়ি বেয়ে ওঠেননি। হাত ধরে উঠেছেন। সংগঠন হিসেবে জামায়াত সম্পর্কে তাঁর কতটুকু ধারণা আছে জানি না। এই সাপের বিষেই কিন্তু বিএনপির শরীর নীল হয়ে গেছে।' (জনকণ্ঠ, ৯ জানুয়ারি ২০১৪)

আওয়ামী লীগের তুখোড় নেতা হানিফ শুধু 'নতুন প্রজন্মের জামায়াত'-এর প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করেননি। গত মাসে তিনি কুষ্টিয়ার এক ধাড়ি জামায়াত নেতাকে ঘটা করে আওয়ামী লীগের ঘরে তুলেছেন। কুষ্টিয়ার আওয়ামী লীগ টের পাবে জামায়াতি কেউটের সঙ্গে সহবাসের বিপদ।

হানিফের মতো নেতা আওয়ামী লীগে আগেও দেখেছি। ১৯৯৬-এ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সিরাজগঞ্জের শতাধিক জামায়াতকর্মী ঘটা করে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিল। তখন এর সমালোচনা করে লিখেছিলাম, জামায়াতিরা আওয়ামী লীগে যোগ দিচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নয়, আওয়ামী লীগের শরীরে মওদুদিবাদের বিষ প্রবিষ্ট করবার জন্য। আওয়ামী লীগে যে কেউ যোগ দিতে পারে। বাচ্চা আওয়ামী লীগের অনেকেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অ-আ-ক-খ জানে না। কিন্তু জামায়াতিরা বাচ্চা থাকতেই সাচ্চা মওদুদিবাদী সন্ত্রাসী হয়ে বেড়ে ওঠে। সাচ্চা মওদুদিবাদী না হলে জামায়াতের সদস্য হওয়া যায় না। কেউটের বাচ্চারা কেউটেই হয়, ঢোঁড়া হয় না। উপমহাদেশের রাজনীতিতে জামায়াত কেউটে সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর। আক্রান্ত না হলে কেউটে আক্রমণ করে না। জামায়াত দংশনের জন্য আক্রান্ত হওয়ার অপেক্ষা না।

গত বছর অক্টোবরে 'বাঃংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী' কর্তৃক আয়োজিত সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিষয়ক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আবুল আলা মওদুদির পুত্র হায়দার ফারুক মওদুদি, যিনি তার পিতার রাজনৈতিক দর্শনের একজন কট্টর সমালোচক। তাকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, জামায়াত যদি '৭১-এর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চেয়ে বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে রাজনীতি করতে চায় তাহলে তাদের সেই সুযোগ দেয়া উচিত হবে কি না। হায়দার ফারুক বলেছেন, '৪০-এর দশকের শুরুতে তার পিতা মওদুদি পাকিস্তান আন্দোলন এবং দেশভাগের বিরোধিতা করেছেন। জামায়াতের অনেক নেতাই তখন পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার পর জামায়াতের কোন কোন শীর্ষ নেতা রাজনীতি থেকে অবসর নিলেও তার পিতা পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নিজেকে দাবি করেছিলেন।

হায়দার ফারুক মওদুদি বাংলাদেশের জামায়াত সম্পর্কে বলেছেন, তারা যেহেতু বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের রাজনীতি করবার অধিকার থাকতে পারে না। তাদের উচিত '৭১-এর অপরাধের জন্য এদেশের জনগণের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাজনীতি ছেড়ে মানুষের সেবা করা, যাতে তারা পরকালে আল্লাহর ক্ষমা পেতে পারে। জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতার পুত্র যদি এই দলটির নৃশংসতার রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত থাকেন আওয়ামী লীগের হানিফরা কেন তা বুঝতে পারেন না এটি আমাদের বোধগম্য নয়। আওয়ামী লীগে জামায়াতগ্রহণের প্রক্রিয়া আরম্ভ হলে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেও কোন লাভ হবে না, কারণ জামায়াতিরা তখন মহানন্দে আওয়ামী লীগ করবে।

১৯৯৮-এ জামায়াতের সঙ্গে জোট বাঁধার পর খালেদা জিয়াকে বলেছিলাম, তিনি কেউটে সাপের লেজ নিয়ে কান চুলকানোর বিপদ একদিন টের পাবেন। ২০০৮ এবং ২০১৪'র ৯ম ও ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরাজয়ের পর খালেদা জিয়া না করুন, বিএনপির 'বীরউত্তম', 'বীরবিক্রম' মুক্তিযোদ্ধারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন জামায়াত এবং জামায়াতের গডফাদার আইএসআই-এর বিষে কীভাবে জর্জরিত হয়েছে তাদের প্রিয় সংগঠনের শরীর।

বিএনপি আমাদের কথা শুনে জামায়াতের সংশ্রব ত্যাগ করবে এমনটি আশা করি না। আওয়ামী লীগের কেউ যদি সন্ত্রাসী জামায়াতিদের ফুলের মালা পরিয়ে দলে বরণ করেন তাহলে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলতে হবে— 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।'

১১ জানুয়ারি ২০১৪